গোপাল দেব

গোপাল দেব

অসীম রায়

বিহার সাহিত্য ভবন

প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন, ১৩৬২

প্রকাশক
শ্রীশক্তিকুমার ভাদুড়ী
বিহার সাহিত্য ভবন
২৫/২, মোহন বাগান রো
কলিকাতা-৪

প্রচ্ছদপট
সুধীর মৈত্র

মুদ্রাকর
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং লিঃ
২৮, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

বাঁধিয়েছেন
বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
৬১/১, মির্জাপুর ষ্ট্রীট

মূল্য চার টাকা

"ঢাকীরা ঢাক বাজায় খালে বিলে"
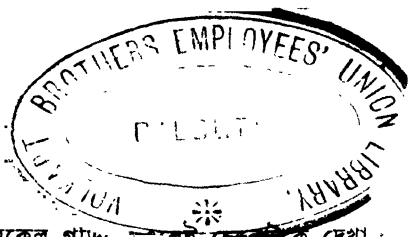
বিকেল গাড়ি ... টিকে দেখা
থেকে নেমে অত্যন্ত ধীর গতিতে সে
বাগানওয়ালা সম্ভ্রান্ত বাংলোর সারি। তাদে
মেজাজের দারোয়ানবৃন্দ দেখে সে যে মুগ্ধ হয়ে
কোন বিরক্তি, অথবা অহেতুক উত্তেজনাও
দারোয়ানের দল তাকে দেখে দেখে এমন অভ্যস্ত যে ... মনে করে সে এ অঞ্চলের বাসিন্দা। তবে এ অঞ্চলের বাসিন্দারা সাধারণত ট্রাম থেকে নেমে এতখানি পথ হাঁটে না। ট্রাম-বাসের লোক চলাচল থেকে পার্থক্য টানবার জন্যেই না এতখানি দূরে থাকার ব্যবস্থা। দোকানপাট নেই, স্কুল-কলেজ নেই আশেপাশে, কাজেই যারা এ পাড়ায় হেঁটে আসে তাদের দিকে একনজর তাকিয়েই বলে দেওয়া যায় তারা প্রার্থী। আর বিংশ শতাব্দীকে আধখানা করে যে বছরটা হাজির হয়েছে বাংলাদেশে এই বছরটায় এ রাস্তায় প্রার্থীদের হাঁটাচলা অনেক বেড়ে গিয়েছে। দেখলেই চেনা যায়। কারো মুখে কুণ্ঠার ছাপ অত্যন্ত প্রকট, কেউ তা ঢাকবার জন্যে অতি সপ্রতিভ। যে সমস্ত অভিজ্ঞ দারোয়ান দূর থেকে কোন লোক দেখেই আঁচ করতে পারে তাদের টুল থেকে উঠে দাঁড়াবে, না আরো উদাসীন মুখে খইনি ডলতে থাকবে—তারাও কিন্তু ছেলেটিকে প্রার্থীর পংক্তিতে ফেলতে পারে না। মুখে তার মৃদু হাসি লেগে আছে, বেশ সতেজ স্বাস্থ্যদীপ্ত চেহারা, বছর পঁচিশেক বয়েস হবে। কালো-নীলের ছোপ মেশানো যে পোশাক তার পরনে তার রঙের গাম্ভীর্য একেবারে চোখ এড়িয়ে যায় না।

শহরে বসন্ত আসছে। শাদা রঙের গেটে নেমপ্লেটের গা ঘেঁসে যে পলাশ গাছ তাতেও ফুল এসেছে। এক ফটকের পাশে এসে

সামনের গাছটি যেন ঘেমে উঠেছে ফুলে।
তার গায়ে বিন্দু বিন্দু বেগুনী রং ফুটেছে।
ত ছেলেটি পাশের গেটে ঢোকে। কেউ
।নো রাস্তা। বাগানের কোণে বাহারে
. এসে প্রায় প্রত্যেকটি গাছপালা ছেলেটির
শাদা রঙের বাংলো, ছাঁটা লন, হ্যাটষ্ট্যাণ্ডের
যানা চেয়ার, আগন্তুকদের জন্যে টেবিলের ওপর
কয়েক ।লতি ম্যাগাজিন। খুব নীচু পর্দায় কখনো বিলিতি
বাজনা কখনো জনপ্রিয় হিন্দি সিনেমার গান ভেসে আসছে। বেশ
অবাঙ্গালী পরিবেশ। হঠাৎ এক নতুন গন্ধে সে চোখ ফেরায়।
ডান দিকে বাগানের এককোণে এক বেঁটে আমগাছ এতদিন লক্ষ্য
করেনি সে, এখন মুকুলে ভরে গিয়েছে। গাছের নীচ দিয়ে যে আবছা
অন্ধকার সেদিক তাকিয়ে তার মুখে চাপা ব্যঙ্গের হাসি ছড়িয়ে পড়ে।
সতেজ মুলতানী এক গরু বাঁধা রয়েছে—বড় সাহেবের নাতির দুধের
ব্যবস্থা। লাল উর্দিপরা যে বেয়ারা এগিয়ে আসছিল তার হাত থেকে
কাগজ নিয়ে ছেলেটি নিজের নাম লেখে নিত্যগোপাল চৌধুরী।
তারপর কী মনে করে বেয়ারাকে ডাক দেয়। কলম দিয়ে তার নামের
আগা আর গোড়াটা কেটে ফেলে। তারপর "দেব" কথাটা জুড়ে
দেয় শেষে। নিত্যগোপালকে কেউ নিত্য কেউ গোপাল বলে ডাকে।
আর দেব উপাধি তাদের বংশগত। নাম ছোট করার জন্যে তা
উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এতদিন। নিত্যগোপাল তার নতুন নাম
প্রবর্তন করলে।

ভেতর থেকে সাড়া আসে না। এত তাড়াতাড়ি আসার কথাও
নয়। গোপাল বসে বসে তার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে আর আঙ্গুলের কর
গোণে। সে মনে মনে আওড়ায়; এক—মানে কেরাণী। সঙ্গে সঙ্গে

তার মুখ কঠিন গম্ভীর হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে গোপালের এক থিওরি আছে। সে থিওরি সংক্ষেপে এই: একদিকে একটা রবীন্দ্রনাথ, অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ কেরাণী—এই অবদান নিয়ে যে বিংশ শতাব্দী বাংলাদেশে হাজির হয়েছে তার চেয়ে তার পুর্বতন শতাব্দী অগ্রসর ছিল। সেখানে লোক জোতজমি নিয়ে পড়ে থাকত, এতবেশী ইংরেজী ঘেঁসা বিদ্যের ছড়াছড়ি ছিল না, কিন্তু মানুষ হিসেবে অনেকে ছিল আরো জীবন্ত। এ শতাব্দীতে এক পুঁটকে কেরাণীর জীবনকেন্দ্র থেকে সাহিত্য, দেশসেবার যে ধারা বইছে তাতে বড় কিছু করার সম্ভাবনা নেই। গোপালের নিজস্ব কথায় ব্যাপারটা বলতে গেলে দাঁড়ায়—এক বেঁড়ে পরিবেশের ভেতর বড় হয়ে উঠে শুধু কথার জাহাজ হওয়াই চলে, আর কিছু হয় না।

পাঠককে সাবধান করে দেওয়া প্রয়োজন গোপালের থিওরি সম্বন্ধে। বঙ্কিমচন্দ্রের মত পাঠককে সম্বোধন করে বলা দরকার: "হে সহৃদয় পাঠক, তুমি থিওরির মুখোস দেখিয়াই কি সমস্ত মানুষটিকে দেখিতে পরাঙ্মুখ হইবে? তোমাকে আশ্বাস দেওয়া হইতেছে, গোপাল তাহার সমস্ত থিওরি অনুযায়ী কার্য করিতে সক্ষম নহে। বড় সাহেব হইতে চাহিলেই কি সে বড় সাহেব হইতে পারিবে?"

জুতোর আওয়াজে গোপাল নড়ে চড়ে বসে। মিঃ জাষ্টিস বসু একহাতে এককুচি সিঙ্গাড়া নিয়ে বেরিয়ে আসেন। লম্বা ছিপছিপে চেহারা, বছর পঞ্চাশের ওপর বয়েস। কালো রং, চুলে শাদার ঘোর লেগেছে। গালের দুপাশে মেছেতা, তবে চোখের তারুণ্যে তা মালুম হয় না। এসেই গোপালকে চেয়ার ছেড়ে উঠতে নিষেধ করে বলতে থাকেন, "এই যে গোপাল, তা দেখ, কালতো কিছুই করতে পারিনি। খুকি কাল দিল্লী গেল। আর আমার জামাই জানতো, একেবারে ইডিয়ট। স্টেশনে তুলে দেওয়া থেকে জিনিষপত্তর

গোছানো সব আমাকেই করতে হল। শেষকালে তাড়াতাড়িতে দেখি টিকিটগুলো আমার হাতেই থেকে গেছে।”

সামনের বারান্দায় পায়চারী করতে করতে বলেন, “অবশ্য স্টেশন সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট বললে যে, কিছু করতে হবে না। ডাকলাম চ্যাটার্জিকে, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার। তিনি আবার যাচ্ছেন সেই ট্রেনে। বুঝেছো তো? অ্যাসানসোলে ফোন করলাম। লোকজন বল্লে, সাহেব ঘুমোচ্ছেন। বললাম, আমার নাম করে তোল। ব্যাচারা চ্যাটার্জি···বুঝতেই পারছ···সেই শীতের রাত্তিরে পাজামা পরে তার লোকজন নিয়ে নামতে হোল। এদিকে খুকী আবার বুদ্ধি করে ভেতর থেকে চাবি দিয়ে দিয়েছে। বাচ্চাটাচ্চা নিয়ে যাচ্ছে তো।”

গোপাল লক্ষ্য করলে মিঃ বসু একটু কাত হয়ে তাঁর দাঁতের ওপরের পাটি তুসেকেণ্ডের জন্যে খুলে জিভ দিয়ে মুখ পরিষ্কার করেই বসিয়ে দিলেন। “আমি টিকিটের নম্বর বলে দিয়েছিলাম। সে সবের কোন দরকার ছিল না। চ্যাটার্জি তো গাড়ি থামিয়ে তার সেল্যুনে নিয়ে যাবে খুকীকে।···এইমাত্র খুকীর ট্রাঙ্ককল পেলাম। এ তুদিন যা গিয়েছে।” মিঃ বসু দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন। বললেন, “এসো, ভেতরে এসো, আমাকে আবার বেরোতে হবে এখুনি।”

গত কয়েক মিনিট ধরে মিঃ বসুর মেয়ে খুকীর ট্রেন বিভ্রাট কাহিনী শোনবার সময় গোপাল প্রাণপণে একটা জিনিষের দিকেই নজর রাখছিল—ঘূণাক্ষরেও যেন তার মুখে অসন্তোষের কোন রেখা ফুটে না ওঠে। আর তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন খুকীর এই বিপর্যয় শোনবার জন্যেই গত তুমাস ধরে এমনি হাঁটাহাঁটি করছে।

মিঃ বসু ঘরে ঢুকে গোপালকে একবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। আর তাঁর জামাইয়ের সঙ্গে গোপালের অমিল আবিষ্কার করেন। তাঁর একটি মাত্র জামাইয়ের পোর্ট কমিশনারে চাকরী জুটিয়ে দিয়ে

তিনি তাকে ঘরজামাই করে রেখেছেন। জামাইটি সারা সকাল ভেলভেটের প্যাণ্ট পরে বাগানে ঘুরে বেড়ায়.

গোপালের ধৈর্যের কথা ভেবে বোধ হয় তাঁর নিজের অতীত মনে পড়ে। গলার স্বরে স্নেহ জড়িয়ে বললেন, "মাই ডিয়ার বয়, গভর্ণমেণ্টে ম্যুভ করেছিলাম তোমার জন্যে। তবে কি জানো, সব ইনকমপিটেণ্ট, ওদের দিয়ে কিছু হবে না।" মিঃ বসু রাজনীতির কথা বলতে স্থরু করলেন, "তাছাড়া বাংলাদেশ এখন চালাচ্ছে এমন একজন লোক যে ঠিক ইটালীয়ান মেডিচিদের মত, একেবারে একরোখা। সব ভোটের জন্যে নিজের লোক দিয়ে অফিস ভরাচ্ছে। কিচ্ছু হবে না।"

গোপাল এ ধরণের রাজনীতি আগেও কয়েকবার শুনেছে মিঃ বসুর কাছে। সে আঁচ করে বর্তমানে যে দুটো বড় বড় কমিশন হোল তাতে মিঃ বসু যেতে না পারায় তাঁর ক্ষোভ হয়েছে। একবার স্থরু হলেই এমন তোড়ে দেশের কথা আলোচনা করেন যে শেষ পর্যন্ত খুকীর ট্রেন বিভ্রাটের মতই তা বিরক্তিকর ঠেকে। তাহলেও লোকটির বলার ঢং মন্দ নয়। গোপাল চুপ করে দেশের কথা শুনতে থাকে।

মিঃ বসুর এখানে গত কয়েকমাস যাবৎ ঘোরাফেরায় গোপাল একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছে, তিনি অন্যান্য পদস্থ বাঙালী থেকে আলাদা। বাঙালী ইউরোপীয়ানের মত পদস্থ হলেই তার পোষ্যের সংখ্যা বেড়ে যায়; সারা দেশ জুড়ে ভাগনে ভাইপো এত গিস্‌গিস্ করে যে মনিঅর্ডারের সংখ্যা বছরে বছরে বাড়তে থাকে। নিজের বাড়িও শেষে প্রকাণ্ড হোটেলখানা হয়ে দাঁড়ায়। মিঃ বসু এদিক থেকে একেবারে মুক্ত, একেবারে সাহেব। তাঁর বাঙালীত্ব একদিক থেকে যেমন কম অন্যদিকে বাইরের নানা ধরণের কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখবার সময় তাঁর অনেক বেশী। প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহে কোন না কোন সমিতির সভাপতি হিসেবে তাঁর নাম কাগজে বেরোবেই।

তবে গোপালকে যে বিরক্ত হতে হয় না তা নয়। জাতীয় ঐতিহ্য একমাত্র তাঁরাই মানে হাইকোর্টের বিচারপতিরাই অক্ষুন্ন রেখেছেন একথা তাঁর আলাপে মাঝে মাঝে বড্ড বেশী প্রকট হয়ে পড়ে।

আরও দুতিনবার গলায় স্নেহ জড়িয়ে মিঃ বসু "মাই ডিয়ার বয়" বললেন। কিন্তু গোপাল সে স্নেহের ধারায় খুব ভেজে না। একবার ভাবলে, লোকটির হাতে সময় আছে তাই বন্ধুর ভাইয়ের সামনে সহৃদয় ব্যক্তির ভূমিকায় নেমে সময় কাটাচ্ছেন। কিন্তু সে নিজে প্রতিজ্ঞা করে এসেছে, কিছুতেই বিরক্ত হবে না। ভদ্রলোক উঠে ভেতরের ঘরে গেলেন। গোপাল আঙ্গুলের কর গুণতে থাকে—দুই অর্থাৎ সরকারী চাকরীর পরীক্ষায় বসে একটা মোটা ধরণের অফিসার হওয়া (গোপালের ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেটে বছর দুয়েক বয়স কমানো আছে)। কিন্তু গোপাল এবারেও মুসড়ে পড়ে। তার কেমন এক বদ্ধমূল ধারণা—হয়তো পাগলামী—যে সরকারী চাকরীতে অফিসার গ্রেডে ঢুকলেই বছর দুতিনেকের ভেতরে ফাইলের অতলগর্ভে তলিয়ে যাবে সে। তখন বিয়ে থা করে একটা ছাপোষা বাঙালী ভদ্রলোক হয়ে দাঁড়ান ছাড়া আর কোন পথ খোলা থাকবে না তার সামনে। অবশ্য কেউ কেউ তাকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করার জন্যে বলছেন, বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটিগিরি করে কী ভাবে সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন ইত্যাদি। কিন্তু সেরকম কোন উৎসাহ গোপাল পায় না। তার সাহিত্যিক হবার ইচ্ছে নেই, তবে মানুষ হিসেবে সে ভালভাবে বাঁচতে চায়। তাই হাত-পা-বাঁধা ব্যাপারের মধ্যে যেতে সে নারাজ। তার গোঁয়ার্তুমিতে তার দাদা বাদ দিয়ে আত্মীয়স্বজনের মহলে কিছুটা হাহাকার উঠলেও সে বিশেষ কাবু হয়নি।

তবে যতই দিন যাচ্ছে ততই সময়গুলো গায়ে এসে বিঁধতে সুরু করেছে। বছরখানেক হোল প্রায় অসহ্য লাগছে। একটা দুটো

কাগজে প্রবন্ধ লিখে কিংবা ট্যুইশানি করে বেঁচে থাকার যে রোমাঞ্চ তা ক্রমশ কেটে যাচ্ছে। এই স্মার্ট স্থিতধী ছেলেটির অনেক বাঙালী যুবকদের মত একটি বিশেষ রোগ আছে—কবিতার রোগ। প্রায় দুতিন বছর লেখার পর নীল রঙের মলাটে বাঁধা তার একখানা কবিতার বইও বেরিয়েছিল। গোপাল ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী লেখকদের ভক্ত। বেশীর ভাগ কবিতাই ভারি পয়ারে লেখা। এমনিই বাংলা দেশে আধুনিক কবিতার বই কবিরা ছাড়া কেউ পড়ে না (তাও চেয়ে) তার ওপর গোপাল দেবের গম্ভীর ভারিক্কি মেজাজ পাঠকবর্গ বিশেষ পাত্তা দেয়নি। এম, এ, পাশ করার কয়েক বছর পর গোপাল যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল।

আর ঘুম ভেঙ্গে উঠেই হুড়মুড় করে যোগাড়যন্তর করার যে মেজাজ গোপালের আবার তা নেই। সে তৎক্ষণাৎ কোথায় বিলেত-আমেরিকা যাবার স্কলারশিপ জোগাড় করবার জন্যে ঘোরাফেরা করবে তা না আকাশ-পাতাল ভেবে সময় কাটাতে লাগলো। তাছাড়া কোন কারণ নেই, নেহাৎ ফিরে এসে একটা বাজার দর হবে এই জন্যে বিলেতে গিয়ে পয়সা নষ্ট করতে তার আত্মসম্মানে লাগে। উমেদারীর জন্যে কারো কাছে যেতেও তার ঘোরতর আপত্তি ছিল। তার মনে হোত যাদের সে তার চিন্তায় ব্যঙ্গ করে এসেছে তাদেরই একজন হয়ে পড়বে।

মিঃ বসুর বড় বড় কাঁচের জানলা-দেওয়া নির্জন ঘরের মধ্যে বসে গোপাল হঠাৎ প্রায় আঁতকে উঠল। তাহলে শেষ পর্যন্ত কি তাকে কলেজে অধ্যাপনা করতে হবে? বেসরকারী কলেজে যা মাইনে তাতে একসঙ্গে দুটো কলেজ আর ট্যুইশানি না করলে তো শোনা যায় চলে না। তার একজন প্রফেসর বন্ধুর কথা মনে পড়ল। গোপাল জিজ্ঞেস করেছিল, "এত ছেলে বেড়েছে এক একটা ক্লাসে, কি করে

ম্যানেজ করিস ?" বন্ধু উত্তর দিয়েছিল, "সে যখন পড়ায় তখন সে ধরে নেয় তার সামনে মানুষ নেই, সব কলাগাছ। হুড়হুড় করে পড়িয়েই চলে যায়।"

গোপালের পক্ষে কেরাণী অথবা সরকারী উচ্চপদস্থ চাকুরে তবু বরং সহ্য করার ব্যাপার কিন্তু যেখানে জ্ঞানের নামে নেহাৎ অন্ন-সংস্থানের ভাঁড়ামো, সেখানে যাওয়া একেবারে অসহ্য। মানুষ হিসেবে বেঁড়ে হয়ে থেকে শুধু নামের সামনে অধ্যাপক জুড়ে দিয়ে যে ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছে দেশে, তা ভাবলে গোপাল ভেঙ্গে পড়ে। তাছাড়া ছেলেদের পড়াশোনা করার মত পরিবেশ তো দরকার। বেশীর ভাগ পরিবারই যখন তাকিয়ে আছে ছেলে একটা পাশ দিয়ে কোন রকমে অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করবে তখন সে ছেলের উদাসীন অবসাদগ্রস্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কী উৎসাহ পাবে এটুকু বলতে যে কীটস্ মহাকবি ছিলেন ?

জুতোর আওয়াজে গোপালের চমক ভাঙ্গে। মিঃ বসু বেয়ারাকে বললেন, গাড়ি বার করতে। তারপর গোপালের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি কি যাচ্ছো চৌরঙ্গীর দিকে, চল তোমায় নামিয়ে দি। আমায় আবার ফোর্ট উইলিয়ামে যেতে হবে, একটা বক্সিং ম্যাচ আছে।" কালো রঙের বিরাট গাড়িখানা নিঃশব্দে এসে দাঁড়ায়।

গাড়িতে উঠে সিগারেট ধরাতে ধরাতে মিঃ বসু বললেন, "আই ওয়ানডার, কেন গভর্ণমেণ্ট সার্ভিসে যাবার পরীক্ষা দিলে না তুমি।" তাঁর তীক্ষ্ণ চোখ দুটো কাত হয়ে গোপালের মুখের ওপর পড়ে। গোপাল কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার কোন উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই তিনি বললেন, "অবশ্য যে রকম এ্যাডভেঞ্চার ছিল এককালে গভর্ণমেণ্ট সার্ভিসে তা আর এখন নেই। এই গ্যাখো সেদিন আমাদের মেডিচির কাছে গিয়েছিলাম (মেডিচি মানে প্রধানমন্ত্রী) কি একটা

ব্যাপারে। দেখলাম প্রধানমন্ত্রী যদি ভুলও বলেন তাহলেও আই, সি, এস, অফিসিয়ালটি ঘাড় নাড়িয়ে যান। শেষকালে আমি বললাম, 'ওটা ইয়েস স্যর না, নো স্যর'। ফাইল খুলে দেখা গেল আমার কথাই ঠিক।

"আচ্ছা দাঁড়াও, আজকে আমার ওয়াটের সঙ্গে দেখা হবে। ওয়াট জান তো—ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার। দেখি কি করতে পারি। একটা ছেলেকে দিয়েছিলাম। সে আবার কী সব গণ্ডগোল করলে। তুমি আবার কোন দলে টলে নেই তো?" তারপর গোপালকে কোন উত্তর দেবার সময় না দিয়েই বললেন, "আরে ওসব পার্টিফার্টি সব বাজে কথা। আসল কথা মেরিট। গভর্ণমেণ্টে সে রকম লোক কোথায়?"

গোপালের সন্দেহ হোল, মিঃ বসু বোধ হয় ভবিষ্যতে রাজনীতি করতে চান। কিন্তু এসব আলোচনা সে আগেও অনেকবার শুনেছে।

সার্কুলার রোড চৌরঙ্গীর মোড়ে আসতে পেট্রোলের দরকার হোল। হীরের আংটি পরা আঙ্গুল দিয়ে তিনি তাঁর একাউণ্টে লিখলেন, ছ গ্যালন। তারপর হাতখানা সেলামের কায়দায় আকাশে তুলে বললেন, "আচ্ছা, তুমি এসো, আমি ওয়াটকে বলব।"

সন্ধের অন্ধকারে গোপাল চৌরঙ্গীতে নামলে।

রাস্তায় নামতেই গোপালের মাথায় এক রাশ চিন্তা এসে জমে।

চার বছর আগে তার বন্ধু হাশেমের সঙ্গে সে যখন ময়দানে ভিড় করেছিল তখন কি সে জানতো তার নিজের জন্যে কোনদিন এমনধারা উমেদারী করতে হবে? কথাটা মনে হতেই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। নিজের চোখে সে যেন নিজেকে দেখতে পায়। ধুতির ওপর হাত-গোটানো শার্ট, চুল উড়ছে হাওয়ায়, শ্লোগান দিচ্ছে ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

আর আজ ট্যুইশানি করে যে স্যুট বানিয়েছে তাই পরনে নিজেকে সে ঠিক যেন আয়নায় দেখতে পাচ্ছে। দুটো চেহারা পাশাপাশি সে খতিয়ে দেখে। একজনের চোখ ভাসাভাসা আর একজনের দৃষ্টি তীব্র তীক্ষ্ণ, যেন ঝকমক করছে, ব্যঙ্গ করছে। তবু অনেকক্ষণ খতিয়েও একটা আনন্দের আর একটা অবসন্নতার চেহারা, এমন কোন একান্ত বৈপরীত্য সে আবিষ্কার করতে পারে না। অবশ্য প্রথম চেহারাটিতে কৌতূহল যেন বেশী, সবাইকে শ্রদ্ধা করবার জন্যে আরও উদগ্রীব চোখ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি ভাব যাকে বলা যেতে পারে লাজুক, আত্মসচেতন,—অন্যে কি বলবে এ জন্যে এক কান সব সময় খোলা রেখে দিয়েছে সে। পরবর্তী চেহারায় কৌতূহলের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রূপ যে নেই তা নয়, সেই সঙ্গে আছে একটা দেমাকের ভাব। ভেঙ্গেপড়া অবসন্ন মোটেই না, কিসের দেমাকে টগবগ করছে পরবর্তী লোকটি।

বছরখানেক আগেও গোপাল সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে চড়তো, শস্তা সিগারেট ছাড়া খেতো না। তার বন্ধু-বান্ধবেরা যখন স্মার্ট কথা বলে তার সামনে বাজিমাৎ করেছে, তখন সে হেসে উড়িয়ে দিত তাদের কথা। তার ভাবখানা দেখে মনে হোত কোন জিনিষ সম্বন্ধেই সে রায় দিতে নারাজ। বিশেষ করে সাহিত্য সভায় যেখানে "ইমোশ্যনাল ইণ্টিগ্রেশন", "আর্ট এ্যাণ্ড রিয়ালিটি" ইত্যাদি ছাড়া এক পা চলা দায় সেখানেও গোপাল গিয়ে মুখ খোলে নি। মেয়েদের বাজারে সে তো প্রায় অচল। তার বন্ধুবান্ধবেরা যখন দমাদম প্রেম করছে আবার প্রেম নাকচ করছে তখনও গোপাল নড়েচড়ে নি।

জীবন সম্বন্ধে গোপালের এই ছুঁচিবাই অনেককে পীড়া দিলেও এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ যে লোকটা অনেক রং অনেক বৈচিত্র্যে এক জীবনের স্বপ্ন দেখেছে আর তাকে পাবার জন্যে একমনে

প্রায় ভূতের মত ঘুরে বেড়িয়েছে, তার সামনে সহসা একটা স্যুটকেশে ভর্তি করে এক চিলতে জীবনের স্যাম্পল এনে কেউ যদি তারস্বরে বলে, "মশাই এইতো রাজনীতি, এইতো প্রেম, এইতো সাহিত্য" তাহলে নিশ্চয় তার চিত্ত হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে ঝলমল করে উঠবে না।

কাজেই কোন কোন বাঙালী ঔপন্যাসিকদের লেখায় নায়ক যেহেতু যুবক অতএব সমস্ত বিশ্ব তার করায়ত্তে এই ধারণা যেরকম পাতায় পাতায় ছড়ানো থাকে গোপাল দেবের ক্ষেত্রে সেরকম কোন ধারণা থেকে সাত হাত তফাত থাকতে হতো। হ্যাঁ, গোপাল দেবও যুবক। তার পাঞ্জায় জোর আছে, সে পাঞ্জা লড়ে অনেক সমবয়সীদের হারাতে পারবে। ইস্কুলে দৌড়ে সে কাপ পেয়েছিল, এখনও দরকার পড়লে ছুটতে পারে। আর এতেও যে সব পণ্ডিতরা তার তারুণ্য সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হবেন তাঁদের বলা দরকার যে গোপাল দেব ইংরেজী সাহিত্য যত্ন করে পড়েছে। এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যকারের লেখা তার প্রিয় পাঠ্য। তা ছাড়া তাকে নিয়ে প্রেমের গল্প লিখতে বেগ পেতে হবে না। তার চওড়া কপালের ওপর চুলের ঢেউ তুলে সে যখন স্নান করে বিকেলে বারান্দায় দাঁড়ায় তখন পার্শ্ববর্তী বাড়ীর জানলার পাশে কোন মন নিশ্চয় আন্দোলিত হতে পারে। গোপাল এগুলো সব জানে। সে জানে তার দর কি, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে মনে করে নিতে পারে না সমস্ত বিশ্ব তার করায়ত্তে।

আসলে গোপাল কতকগুলো জিনিষ না করেছে। কিন্তু মুস্কিল সে টপ করে হ্যাঁ করতে পারছে না। হ্যাঁ করতে গেলে সময়ের দরকার, সাধনার দরকার, গোপাল অন্তত এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছে।

আর তা ছাড়া কলেজ থেকে বেরোনর পর আজ পর্যন্ত সমাজের সঙ্গে যেটুকুন যোগসূত্র রাখতে চেষ্টা করেছে তার ফলে আরও একটা

কথা উপলব্ধি করেছে সে। বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবন বিশেষ করে আজ দুটো ধারায় বিভক্ত। এতে কোন পার্টি নেই, দল নেই, প্রায় জাতীয় ধারা হিসেবে দাঁড়িয়েছে। এ দুই ধারায় একটা হোল উচ্ছ্বাসের ধারা অথবা ভাবপ্রবণতার ধারা। সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজ, সবকিছুই একটা আবেগ নিয়ে দেখা হচ্ছে। খুব দীর্ঘস্থায়ী চেষ্টা যাতে বছরের পর বছর ধরে সাধনা করতে হবে সে ধরণের কোন ব্যাপার এ চিন্তায় নেই। বিশেষ করে দেশ ভাগের পর থেকে বিরাট আর্থিক দুর্গতি এ চিন্তার গোড়ায় আরো জল দিয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি কোন পরিণতির পথ পরিষ্কার না হলে সেদিকে পা বাড়িয়ে লাভ নেই—এ ধারণায় এ দেশের তরুণ সমাজ লালিত হচ্ছে। আর একটা ধারা যেটা আরও মারাত্মক, সেটা হোল এক ধরণের সর্বগ্রাসী রক্তশূন্যতা। এ চিন্তার জগতে জ্ঞান নির্বাসিত নয়, কিন্তু জ্ঞানের কোন গতি নেই, হাত পা ভাঙ্গা, শেষ পর্যন্ত এ বক্তব্যকে এক কথায় নাম দেওয়া যেতে পারে কিছুতেই কিছু হবার নয়। গোপাল ইংরেজীতে এই দুই ধারার নাম রেখেছে garrulity আর impotence, একদিকে এক প্রচণ্ড মানসিক ধ্বজভঙ্গতা আর একদিকে প্রচণ্ড অতিকথন। এই দুই চড়ার ভেতর দিয়ে বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবন বয়ে চলেছে।

তাহলে ট্যুইশানি করে গরম স্যুট বানানো কেন? এত যত্ন করে গোঁফ ছাঁটা কেন, জুতোয় কালি দেওয়া কেন? পাঠক এ প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই করতে পারেন। এখানে একটা ব্যাপার ঘটে গেছে গোপালের ভেতর—প্রায় এক বছর ধরে প্রকাণ্ড দোটানার ভেতর থেকে এখন সে অনেকখানি সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছে। গোপাল সিদ্ধান্তে এসেছে যেহেতু টপ করে কিছু করবার নেই, অতএব চীৎকার করে মরে গিয়ে লাভ কী? এটা শুধু নেহাৎ স্বার্থরক্ষা করার ব্যাপার নয়। গোপাল যে খুব নিঃস্বার্থ মহাপুরুষ তা তো নয়।

তবে সে ভেবে দেখেছে যে দুভাবে সে বাঁচতে পারে। একটা হোল, যা সে এতদিন ছিল, অনেকটা বাউলদের মত। অর্থাৎ কিনা পৃথিবী খারাপ হোক, তার ভেতর অনেক কুৎসিত কদর্য জিনিষ থাক নিজে কিছু বই, বন্ধু এবং কতকগুলো বিশেষ চিন্তার মধ্যে আবদ্ধ থেকে একটা মনের মানুষের জগতে বাস করা। আর একটা হোল এই ধূলোয় কাদায় গা লাগিয়েই বাস করা। তার দাদা তাকে ব্যঙ্গ করেছে, অথচ সে নিজে খুব একটা সদুত্তর মনে মনে খুঁজে পায় নি। মানুষ সম্বন্ধে কতকগুলো স্বাভাবিক ভালত্ব বোধ ছাড়া আর কী কোন বড় জিনিষ সে মানুষের ভেতর থেকে খুঁজে বার করতে পেরেছে যার ফলে সে দাদার তীক্ষ্ণ যুক্তির সামনে নিজেকে দাঁড় করাতে পারে? নিজেকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তা তার জীবনের ক্ষেত্রে, প্রত্যেক দিনের আচরণে আবিষ্কার করতে পারে নি। কাজেই শুধু এই বিচিত্র জগতের ধূলোকাদার মধ্যে না গিয়ে বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে দূর থেকে দেখতে তার আর ভাল লাগে না। আর এই প্রত্যেক দিনের জীবনযাত্রার ইচ্ছে, নেহাৎ শুধু বাঁচার আনন্দও তাকে আবার নতুন করে ডাক দিয়েছে।

তাছাড়া গোপালের মধ্যে এক সুপ্ত গুমর ছিল তাও চোট খেয়েছে। সে কিছুতেই ভুলতে পারবে না কলকাতার সেই শীতকাল যখন মাত্র তারা কয়েকজন ভারতবর্ষে নতুন সরকার স্থাপন করবার জন্যে রাস্তায় নেমে পুলিশের ঠ্যাঙ্গানি খেয়েছিল আর দিনের পর দিন সিনেমায় ভিড় হয়েছিল, ব্যাগে কমলালেবু পাঁউরুটি নিয়ে দলে দলে লোক খেলার মাঠে ভিড় করেছিল।

তারপর যখন তাকে বলা হোল সে এ দেশের কেউ না, তখন তার গলা দিয়ে কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যারা একথা বললে তাদের সে প্রায় চেঁচিয়ে বলতে চেয়েছিল, "আমি মূল মহাভারত পড়েছি,

তোমরা কজন পড়েছো হে? এ দেশের সম্বন্ধে সবজান্তা তোমরা কবে থেকে হোলে?"

এককথায় গোপালের এইখানেই আসলে মাথায় বাড়ি পড়ল। সে অনুসন্ধিৎসু হয়ে এগিয়ে এসেছে জীবনের দিকে আর তার অন্বেষণের মাথার ওপর বাড়ি দেওয়া হোল, সে একেবারে অস্থির হয়ে পড়লো। তাদের পাড়ায় যে সব ছেলেরা সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মেয়েদের বাপ মায়ের কাছে জুয়েল হয়ে পড়েছে তাদের সমকক্ষ হয়ে তাদেরকে যে সে বাঁ হাতের আঙ্গুলে কলা দেখাতে পারে এ ধরণের ছোট চিন্তাও যে তার মনে জাগে নি তা নয়। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, সে আর দূর থেকে জীবনকে সম্ভ্রম দেখাতে চায় না। এ জীবন ও সমাজ ব্যবস্থার সব কিছু গ্লানিই সে পেতে চায়, নইলে তার মতে তার সমস্ত ধারণাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

অবশ্য, সাহেবী অফিসে ঢুকে তার অতীতের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে সে হঠাৎ উদগ্রীব হয়ে পড়েছে এমন কোন ধারণা গোপাল দেবের সম্বন্ধে করা ভুল হবে। তবে এটা সে বিশ্বাস করে যেভাবে সে চলে এসেছে তার ছেদ টানা প্রয়োজন। মাঝামাঝি কোন কিছু তার পক্ষে হওয়া সম্ভব নয়। হয় আপার ক্লাস, নয় থার্ড ক্লাস—এর মাঝামাঝি ক্লাসটিতে সে কখনও ট্রেনে চড়েনি। জীবনের ক্ষেত্রেও সে এই মাঝামাঝির স্থান দেবে না। সে পুরোপুরি এই ব্যবস্থায় যারা দায়িত্বশীল লোক বলে পরিগণিত তাদেরই একজন হবে, না ভাল লাগে ছেড়ে দেবে। তার ওপরে কেউ নির্ভর করে বসে নেই এবং তারও হঠাৎ সংসারী হয়ে পড়বার ইচ্ছে নেই। কাজেই·· রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে গোপাল হাত মুঠো করলে। গোপাল ডায়েরী রাখে না। তবে একটা ছোট মত সাদা খাতায় সে হিসেব লিখে রেখেছে। হিসেবটা ভাষায় প্রকাশ করলে দাঁড়ায় এই: তাকে মাসে চারশো টাকা রোজগার

করতে হবে। দুশো করে প্রতি মাসে জমালে চার বছরে দশ হাজার টাকার কাছাকাছি দাঁড়াবে। তখন সে রিটায়ার করবে।

গোপাল তার কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকেও বলে নি তার এই ফোর ইয়ার প্ল্যানের কথা।

দুই

প্রায় দুমাসের ওপর হয়ে গেল বোস সাহেবের বাড়ি ঘোরাফেরা। যখন সে প্রথম যাতায়াত সুরু করে তখন কড়া ঠাণ্ডা। তারপর বসন্তের হাওয়া কিছুদিন সহরের রাস্তায় বইল, দেবদারু গাছগুলো তাদের শুকনো ধুলোপড়া আস্তরণ আর অসংখ্য বিজ্ঞাপন মারা গুঁড়ি নিয়ে হঠাৎ ঝলমল করে উঠল: কিছুদিন থেকে রোদ তেতেছে, সকাল দশটার পরই রোদ চোখে লাগে, বিকেলের দিকে কোন কোনদিন ধূলোর ঝড় ওঠে, এক একদিন এক ফোঁটা দুফোঁটা জল পড়ে। কিন্তু বৃষ্টি হয় না, গরম বাড়ে। এমনি এক সারা দুপুর দুঃসহ গরমে কাটিয়ে বিকেল না হতেই গোপাল হাজির হয় বোস সাহেবের বাড়ি।

মিঃ বসু গোপালকে দেখেই বলে উঠলেন, "কাল থেকে খুকীর বমি হচ্ছে, একেবারে সময় করে উঠতে পারি নি।"

বাইরে বারান্দায় বেতের চেয়ারে দুজনে বসে। মিঃ বসু বললেন, "এখানে বুঝলে না,...কলকাতা একটু পিছিয়ে পড়েছে। দিল্লীতে থাকলে একটা হিল্লে হয়ে যেতো। ওখানকার সব সেক্রেটারীগুলোর সঙ্গেই আমার আলাপ আছে।"

গোপাল অসোয়াস্তি বোধ করে। কতদিন আর এই সব কথা শুনতে ভাল লাগে। সে ভাবছিল যা তার সবচেয়ে শেষ ঘুঁটি, অর্থাৎ কিনা মফঃস্বল কলেজের কোন মাষ্টারী তাই নিয়ে কলকাতা ছাড়বে কিনা। সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে কল্পনা করে নেয় কোন মফঃস্বল

কলেজের হষ্টেলে ঃ খাতায় এক মাইনে লিখে 'দেশ সেবার দরুণ' তার অর্ধেক মাইনে নিতে হচ্ছে, হস্টেলের পাশের ঘর থেকে একজন সহকর্মী পেট বাজিয়ে কীর্তন করছেন, আর তিরিশ বছরেই বুড়িয়ে যাওয়া আর এক টিউশন-ক্লান্ত অধ্যাপক তার দিকে তাঁর প্যাঁকাটির মত আঙ্গুল তুলে বলছেন, "আপনারা ইয়ংম্যান, আমাদের তো—"

সে একটা নিঃশ্বাস ফেলে সামনে ছাঁটা লনের পাশে রদ্দুরে জ্বলে যাওয়া ডালিয়ার সারির দিকে তাকিয়ে থাকে।

মিঃ বসু হঠাৎ বললেন, "সত্য কোথায় ?"

গোপাল একটু নড়েচড়ে বসে। হঠাৎ তার নিঃসঙ্গ বাড়িটার কথা মনে পড়ে। অনেক দিনের পুরনো ভৃত্য গুজারাম তার একমাত্র সঙ্গী। অবশ্য একদিক থেকে হয়তো ভালই হয়েছে। কোথাও খেতে গেলে তার খাবার সামনে যদি বাড়ির মেয়েরা পাখা নিয়ে বসে তাহলে তার অসোয়াস্তি বোধ হয়। আর বাড়িতে একলা লাগার ভাবটা বেশীক্ষণ পেয়ে বসে না তাকে। কারণ বাড়িতে সে খুব কমই থাকে দিনের মধ্যে।

মিঃ বোস আবার জিজ্ঞেস করলেন, "সত্য কি কলকাতায় এখন নেই ?'

"ও দাদা, না, দাদা এখন কার্সিয়াঙে। ওখানে একটা বাংলো কিনেছেন গতবছরে। ওখানে থাকেন। মাঝে মাঝে আমার বোন হাসি গিয়ে দেখা করে আসে।"

"ও, হি ওয়াজ এ ফাইন চ্যাপ, কেন মিছিমিছি নিজের কেরীয়ারটা নষ্ট করলে ব্যারিস্টারী ছেড়ে দিয়ে, বুঝি না, নইলে ক্যালকাটা বারে সত্য একটা নাম করতই। আর শুধু টাকা, গাড়ি, বাড়ির তো কথা নয়। দেশের মধ্যে লোকে জানবে, নামডাক হবে।" হঠাৎ গোপালের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "বাই জোভ, তা সত্যই তো

তোমাকে ফিক্স আপ করে দিতে পারে তার অফিসে, তার তো যথেষ্ট ইনফ্লুয়েন্স ছিল শুনতাম।"

"না, ওখানে একটা খ্যাঁচ আছে।"

"হোয়াট্‌?"

গোপাল হেসে বললে, "দাদার ডিপার্টমেণ্টে যিনি এখন চীফ তাঁর সঙ্গে দাদার বনতো না। কাজেই ওপর থেকে যদি এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট না হয় তাহলে ওখানে আমার চাকরী হবে না।" গোপাল বেশ অর্থপুর্ণভাবে ধীরে ধীরে বললে।

"তা একথাটা তুমি বলনি কেন এ্যাদ্দিন। ওদের এডিটর না ম্যানেজার কে ছাই তার সঙ্গে সামনে শনিবারেই দেখা হবে। তা ওখানে ভেকেন্সি আছে তো?"

"নেই, থাকেওনা, তবে তৈরী হয়।"

মিঃ বসু হাসলেন, গোপালকে তাঁর ভালই লেগেছে। বললেন, "ডোণ্ট ওয়ারী মাই ডিয়ার বয়। আই স্যাল ফিক্স ইউ আপ।"

সোমবার সকালে যখন তার দাদার অফিসের অতি পরিচিত শীল-মোহর করা সাদা খাম গোপালের নামে হাজির হোল তখন গোপাল একটু অভিভূত হয়ে পড়লে। এম, এ, পাশ করার পর এখানে সেখানে কয়েকটা ট্যুইশানি করা ছাড়া (আর তাও কয়েক মাসের জন্যে) সে বেকার। মোটামুটি বাড়ির খরচ, গুজারামের মাইনে থেকে সুরু করে সবই দাদা দিয়ে আসছেন, কিন্তু এভাবে আর বেশীদিন চলা সম্ভব নয়। প্রত্যেক মাসের প্রথমে দাদার মনিঅর্ডারের দিকে তাকিয়ে থাকার আত্মগ্লানি কয়েকমাস হোল গোপালকে অত্যন্ত তীব্র ভাবে পীড়া দিচ্ছে। তা ছাড়া গত কয়েক মাসে তো আর একটা ভয়ও তার ধরে গিয়েছিল, আর্থিক জীবন থেকে সরে থাকার দরুণ সে যেন বেশ কিছু পরিমাণে চার পাশের জীবন থেকেও সরে গিয়েছে। সকাল দশটা

বাজতে না বাজতে যখন তার সমবয়সী পাড়ার ছেলেরা তৈরী হয়েছে অফিসে যাবার জন্যে তখন তার খারাপ লেগেছে। এটা আগে খুব বেশী খোঁচা দিত না, কারণ সকাল বিকেল সন্ধে হয় রাজনীতি নয় সাহিত্য, একটা না একটা কিছু নিয়ে সে ঘুরে বেড়াত। তার পাড়া নেই, বাড়ি নেই, যখন যাকে ভাল লেগেছে তার বাসস্থানই তার পাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে, এমনকি তার ঘরও কিছু পরিমাণে তার নিজের হয়ে উঠেছে। তাই তার পাড়ার দুধারের বাড়িগুলোর স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনধারা তাকে বিচলিত করে তুলতে পারে নি এতদিন। সম্প্রতি সে বিচলিত হয়েছে। আর যখন থেকে তার ধারণা জন্মেছে এভাবে চলতে পারে না, তখন থেকেই আরও এই সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। অবশ্য তাতে যে খুব ফল হয়েছে তা নয়। বৌদি কলকাতা এলে তার সঙ্গে দু একদিন ভাব জমাবার পরই তিনি হঠাৎ গোপালের বিয়ের জন্যে ভাবিত হয়ে পড়েছেন, তাছাড়া এক মাসতুতো ভাইয়ের বাড়ি গিয়ে তাদের পারিবারিক পলিটিক্স নিয়েও মাথা ঘামিয়েছে সে। দূর সম্পর্কের কয়েকজন ভাগ্নীকে নিয়ে একবার করে খুব গরম ইংরেজী ছবিও দেখে এসেছে কয়েক সপ্তাহান্তে। কিন্তু তারপর একলা নিজের ঘরে ফিরে এলে বড্ড বোকা-বোকা লেগেছে ব্যাপারগুলো। বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবন থেকে সে দূরে সরে গিয়েছে একথাটা তাকে কয়েকবার নাড়া দিলেও সে নিজেকে সামাজিক অচ্ছুতের পর্যায়ে ফেলতে পারে নি। সে পারে না কতকগুলো জিনিষ করতে। কী করবে? যেমন সেদিন যখন তার ভাগ্নীদের একখানা বাংলা বই নিয়ে প্রায় হিস্টিরিয়া স্থরু হোল তখন গোপাল একেবারে তাজ্জব বনে গিয়েছিল। বইখানা খোস গল্পের, বাংলা সাহিত্যে নাকি অভিনব সম্পদ। গোপাল একবার উল্টে পাল্টে দেখলে। ইংরেজীতে এধরণের সাংবাদিকতা প্রচুর হয়েছে আর

এটা সাংবাদিকতাও নয়, সাহিত্যও নয়। অথচ গুণীজনদের কেউ কেউ বলছেন বাংলা সাহিত্যে···ইত্যাদি আর তার ভাগ্নীরা মূর্চ্ছা যাচ্ছে।

গোপাল তাই একদিকে যেমন নিজেকে তার চারপাশের জগতের সঙ্গে আরো যুক্ত করবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে আবার সঙ্গে সঙ্গে আহত হয়েছে, বিস্মিত হয়েছে। পুরনো বন্ধুবান্ধবদের কেউ কেউ তার কথাবার্তায় প্রায় ক্ষেপে উঠেছে, কেউ নাম দিয়েছে "হাই ব্রাউ" 'স্নব', অন্যরা বলেছে "সন্ন্যাসী" কিন্তু গোপাল ভেবে দেখেছে সত্যি ওরকম কিছু নয়। সে এ্যাডভেঞ্চার-বিলাসী নয়, লোকের মনের ওপর কোন কিছু চাপিয়ে দিতে সে নারাজ। মানুষের সঙ্গে মিশতে আরো ধৈর্য, চেষ্টার দরকার সেটা সে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে, কিন্তু যখনই সে অগ্রসর হয়েছে তার আশেপাশের মানুষের জগতে তখনই মনে হয়েছে এর চেয়ে সন্ন্যাসী হওয়া ভাল—এমনকি 'স্নব' হওয়া ভাল। আত্মবিসর্জন অসহ্য। সম্প্রতি তার সন্ধে কাটানো এক সমস্যায় দাঁড়িয়েছে। কিছু দিন থেকে তার চিংড়ী মাছের ব্যাপারে "এ্যালার্জি" জন্মেছে, খেলেই ঠোঁট জ্বালা করে। আর জন্মেছে সাহিত্যিক আড্ডার ব্যাপারে। বেশীক্ষণ সেরকম আড্ডায় থাকলে তার কান ভোঁ ভোঁ করে। এক একবার মনে হয়েছিল নয়নের কথা যার কাছে গেলে তার সময় কাটত, কিন্তু এ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই তার মন দমে গিয়েছে। নয়নের হঠাৎ পণ্ডিচেরী অন্তর্ধান তাকে বেশ হতাশ করেছে, এযেন তারই পরাজয়, সে যা যা ভালবাসে তাদেরও পরাজয়। নয়ন যদি ধর্মবোধের তাগিদে পণ্ডিচেরী যেত তাহলেও মানে ছিল, কিন্তু নেহাৎ সংসার থেকে পালাবার জন্যে এপথ নেওয়া ছাড়া কি অন্য কোন পথ ছিল না তার?

সন্ধের হাওয়া দিলেই গোপাল অস্বস্তি বোধ করে। অস্বস্তি বোধ করে কারণ একদিক থেকে যেমন জীবন তাকে আকর্ষণ করে তেমনি

আর একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। একেবারে সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ করে হেঁ হেঁ না করলে, একেবারে ছাপোষা মেজাজ না বানিয়ে ফেললে মানুষের সঙ্গে কি মেশা যাবে না? তার দাদার কথা মনে পড়ে। কতকগুলো জিনিষ মানতে না পেরে তিনি দূরে সরে দাঁড়ালেন। কিন্তু এও তো আত্মবিলোপ, শুধু তাই নয় এইভাবে মানুষের কাছ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে আঙ্গুল দেখিয়ে দেখিয়ে খুঁত কাড়ার যে আত্মম্ভরিতা, গোপালের চরিত্রে সে বিশেষত্ব তো একদম নেই। তার বাঁচার অহঙ্কার আছে, সেখানে চোট লাগলে সে পাগল হয়ে যায়, কিন্তু তা আত্মম্ভরিতা নয়। তা হোল মানুষের জীবনের অহঙ্কার, গোপাল মন প্রাণ দিয়ে চায় তার চারপাশের মানুষের মধ্যে এক অতিপরিচিত প্যানপেনে দুঃখবোধের বদলে সত্যিকারের বাঁচার অহঙ্কার প্রতিষ্ঠিত হোক।

সন্ধের হাওয়া দিলে সে বই পড়তে পারে না, তার মনে হয় কার কাছে যাবে? কোথায় যাবে? কোন্ মানুষের কাছে গেলে সে শুধু কতকগুলো বই-এ পড়া আশাবাদের কথাই শুনবে না, নিজেরই উপলব্ধির আনন্দে উজ্জ্বল জীবনের সামনে এসে দাঁড়াবে?

সাদা খামখানা হাতে নিয়ে গোপাল ভাবলে হয় তো এবার সে বেঁচে গেল। এই অস্থিরতা থেকে ছাড়া পেল। তার প্রশ্নগুলো আপাতত মুলতুবী থাকুক না কেন। তার তো দেখার অনেক বাকী, আর তা ছাড়া এক ধরণের বেয়াড়া আনন্দও হোল। খবরের কাগজের অফিসে সন্ধেগুলো বন্ধ। সন্ধেগুলো কেমন করে কাটাতে হবে, এ ভাবনার সময়ই পাবে না সে। তাছাড়া আরও প্রত্যক্ষ বাস্তবের সঙ্গে সে যুক্ত হবে। সে নিজেকে কল্পনা করে সম্পূর্ণ একজন খেটে-খাওয়া মানুষ হিসেবে, তার আশা হয় এই প্রত্যক্ষ ব্যস্তবের মধ্যেই সে তার প্রশ্নের জবাব পাবে; অন্তত লোকে কেমনভাবে বাঁচছে তার তো হদিস পাওয়া যাবে। সেটাও তো মস্ত লাভ।

চিঠিতে লেখা ছিল সাড়ে দশটার সময় নিউজ এডিটর মিঃ চ্যাটার-টনের সঙ্গে দেখা করতে।

গোপালের দুটো খাকি প্যাণ্টের মধ্যে একটা ছেঁড়া, আবার হঠাৎ যে দুর্জয় গরম পড়ে গেছে তাতে তার স্যুটের প্যাণ্ট পরে বাহার করারও কোন কায়দা নেই। দাড়ি কামাবার পর খেয়ে দেয়ে প্যাণ্ট পরতে গিয়ে দেখলে একদিকের বকলস নেই। এসপ্ল্যানেডে নেমে আবিষ্কার করলে দশটা বেজে দশ হয়েছে, তার বাড়ি থেকে চৌরঙ্গী আসতে কাঁটায় কাঁটায় কত সময় লাগে অন্য দিন খেয়াল করে নি। আজ দেখলে প্রায় মিনিট চল্লিশ। মেট্রো সিনেমার পাশের দালানের ঘড়িটা যেন চলছেই না, গোপাল এত আগে গিয়ে বোকা বনে যেতে চায় না। একবার কাগজের স্টলে গিয়ে হাজির হয়। এতদিন খবরের কাগজের হেডলাইন আর খুব "ইণ্টারেস্টিং" মনে হলে আন্ত-র্জাতিক কোন ঘটনার ওপর কোন লেখা পড়েছে। তার মনে পড়ল দাদার কথা, কী গভীর মনোযোগ দিয়ে সারা সকাল চার পাঁচখানা কাগজ পড়তেন, তাদের কাগজে কোন খবর বাদ্ পড়েছে কিনা, দাগ দিতেন। গোপাল একবার বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত সারি সারি কাগজের ওপর চোখ বুলায়। একবার মনে হয় অনেক সময় নষ্ট করতে হবে, কিন্তু তার পরেই সে চিন্তা চাপা পড়ে যায়। চারদিকে অফিসে যাবার জন্যে লোকে দৌড়াদৌড়ি লাগিয়ে দিয়েছে, একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক হাঁপাতে হাঁপাতে এক ডাল-হৌসীস্কোয়ারগামী ট্রামের সেকেণ্ডক্লাসে উঠে পড়লেন। গোপাল তার চারপাশের কাজের মানুষের মধ্যে নিজেকে দেখতে পেয়ে খুশী হয়ে উঠল।

আগেও এসেছে সে একবার দুবার অফিসে। যে দিকে বকলস নেই সেদিকটা ডানহাতের কনুই দিয়ে চেপে একটু ঝুঁকে পড়ে "গুড মর্ণিং" করে ঢুকলে চ্যাটারটনের ঘরে।

চ্যাটারটনকে সে আগে দেখেছে, গোলগাল ফুটবল খেলোয়াড়ের মত চেহারা, চোখ দুটো বেশ শান্ত, খুব ধূর্ত ঘোড়েল মনে হোল না, কিন্তু টেবিলের একপাশে যে বাঙালী ভদ্রলোকটি বসেছিলেন কেমন যেন এক নিমেষেই সে আঁচ করলে লোকটা মিঃ সেন, দাদার প্রতিদ্বন্দী। বেঁটে খাটো, টাকওয়ালা লোকটা তার ছোট চকচকে চোখ দিয়ে গোপালকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে।

সাহেবের হাবভাব দেখে গোপালের ধারণা হোল তার চাকরী হয়ে যাবে, বেয়াড়া ধরণের কোন প্রশ্ন করলেন না। একবার শুধু ষ্টেটমেণ্ট অফ কোয়ালিফিকেশনস্ থেকে মাথা তুলে গোপালের দিকে তাকিয়ে বললেন "এম, এ, পাশ, কিন্তু তুমি যে বাচ্চা হে।" তারপর সেনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, "তোমার ডিপার্টমেণ্টে যে এম, এ, পাশের ছড়াছড়ি।"

"হ্যাঁ এখন তো শুনছি বাস ট্রামের কণ্ডাক্টরদের মধ্যেও কেউ কেউ বি-এ, এম-এ পাশ।"

চ্যাটারটন মুখ তুলে বললেন, "রিয়ালী?" তারপর গোপালের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কিছু লিখেছো টিখেছো?"

গোপাল ভাবলে, বলবে কিনা কবিতা লেখা ছাড়া সে আর কিছু সিরিয়াসলি লেখে নি। একটু সাবধান হয়ে বললে, "না, খবরের কাগজের দিক থেকে তেমন কিছু লিখি নি।"

সাহেব বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাতে কিছু আসে যায় না, কিছু ফিচার টিচার লেখো, এরা সব আছে, দেখিয়ে দেবে।"

"হ্যাঁ আমাদের এখানে সব নতুন করে শিখতে হবে, সব ঠিক হয়ে যাবে, আসলে দরকার খাটতে পারা," সেন বললেন।

করিডোরে পা দিয়ে ফের বললেন, "তোমাকে আমি তুমিই বলব; সত্যর ছোটভাই তুমি। এখানে যারা কাজ স্থরু করে তাদের দুশো

টাকা বেসিক দেয়, প্লাস ফিপটি পারসেণ্ট ডিয়ারনেস এলাউয়েন্স, এছাড়া তোমার একটা টিফিন আর কনভেয়ান্স এলাউয়েন্স সব মিলে সাড়ে তিনশো আন্দাজ। কেমন? আর ইউ হ্যাপি?"

গোপাল ভাবলে সে লোকটার কাছে বেশী আনন্দ দেখিয়ে ফেলবে। সাড়ে তিনশো পেলে আর দাদার কাছ থেকে এক পয়সাও নিতে হবে না, অন্তত দেড়শো টাকা করে জমাবে, এছাড়া যদি বোনাস পাওয়া যায় তাহলে সেটাও জমাবে, তারপর সে মুক্ত হবে। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতের মুক্ত হওয়ার স্বপ্নের চেয়েও এই পাঁচ মিনিটের ভেতর তার বাস্তবের পরিবর্তন তার কাছে আরো সত্য বলে মনে হয়।

সেন গোপালের পিঠে হাত দিয়ে বললেন, "আচ্ছা, তাহলে তুমি কালকের থেকেই জয়েন কোরো, কী বলো?"

"থ্যাঙ্ক ইউ," গোপাল বেশ আন্তরিকতার সঙ্গেই বললে।

ক্রমে ক্রমে সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ হয়। প্রথমে একটা ঠাণ্ডা ভাব ছিল। কেউ কেউ ভেবেছিল মিঃ সেনই তাকে আনিয়েছেন, যখন জানা গেল সে সত্যগোপালের ভাই তখন সকলেই আকৃষ্ট হোল তার প্রতি। মিঃ সেন অবশ্য পছন্দ করেন নি, তাঁর মনে হয়েছে তাঁর এক্তিয়ারে হাত দেওয়া হয়েছে চৌধুরীর ভাইকে ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়ায়, তবে মানুষ সরে গেলে বিবাদ বিসংবাদের জের অনেকটা জুড়িয়ে যায়। আর চৌধুরী সাহেব ও গোপালের মধ্যে এত পার্থক্য চেহারায় এবং মেজাজে যে গোপালকে একটা ভবিষ্যৎ প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে কল্পনা করতে তিনি কিছুতেই পারলেন না। চৌধুরী বিরাট দীর্ঘকায় পুরুষ, লম্বা চোয়ালের হাড়, খাড়া নাক, একেবারে অবাঙ্গালী চেহারা। গোপাল প্রায় তার উল্টো, মাঝামাঝি পেশীবহুল চেহারা, কোঁকড়া চুল, মুখ প্রায় গোল। সত্যগোপালের মুখেচোখে এক গাম্ভীর্যের ছাপ, প্রায় বিষাদে

ভরা, আর গোপাল একেবারে হাসিখুসী, খালি মাঝে মাঝে চশমার ভেতর থেকে চোখ দুটো হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যে।

সেদিন প্রায় সবাই বেরিয়ে গেছে খবর সংগ্রহের জন্যে। সেন এসে গোপালকে বললেন ইংরেজীতে "একটা হাল্কা ধরণের লেখো কিছু···যেমন ধরো দোকানদার কিংবা বাজনাওয়ালা, এরকম একটা কিছু।"

টাইপরাইটারটার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন, "টাইপ করতে জানো ?"

গোপাল মাথা নাড়ালে। সেন একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন, "ষ্টেনো-গ্রাফি ?" গোপাল হেসে বললে, 'না কিছুই জানি না।"

মনে হোল, সেন অবাক হলেন। গোপাল একেবারে চৌধুরীর উল্টো, এরকম খোলাখুলি নিজের অজ্ঞতা চৌধুরী সাহেব কোনদিন কোন কাজে স্বীকার করেছেন বলে জানা নেই, না জানলে বুঝিয়ে দিতেন কিছু এসে যায় না তাঁর পক্ষে। একটু উৎসাহ দিয়ে বললেন, "তাতে কি, ও কয়েক মাসের মধ্যে শিখে যাবে।"

গরম পড়েছে। ঝোলানো খসখসের টাটি থেকে স্নিগ্ধ চন্দনের গন্ধ আসছে। গোপালের একবার সন্দেহ হয়, হাল্কা চালের লেখা কি তার হাত দিয়ে বেরুবে ? হাল্কা চালের লেখা পড়তেই তার ক্লান্তি আসে। আর—গোপালের চিন্তায় বাধা পড়ে। মিঃ সেন এসে বলেন, "চ্যাটারটন তোমার কপি দেখতে চেয়েছে, তাড়া নেই, আস্তে আস্তে করলেই হবে।"

গোপাল দেব মিনিট পনেরো ধরে কাগজের বল তৈরী করলে। খবরের কাগজে সাধারণত যা 'ফিচার' বলে প্রচলিত তার এক আধটা ছাড়া বেশীর ভাগই তাকে বিরক্ত করে। আর তার নিজের লেখা এত ভারি ও গম্ভীর যে তার হাত দিয়ে ইটালীয়ান ট্র্যাজিডি ছাড়া আর কিছু

বেরুনো বোধ হয় সম্ভব নয়। শ্যামবাজার অঞ্চলে একজন চায়ের দোকানওয়ালার কথা মনে পড়ল, মাঝে মাঝে সে কলেজ জীবনে আড্ডা মারত সেখানে। ম্যানেজারবাবু মাঝবয়সী কিন্তু ছোটবেলা থেকে আর্থিক সংগ্রামে এত বেশী ব্যাপৃত যে বিয়ে করবার সময় পায় নি। গোপাল প্রথম লাইনটা তার অপটু আঙ্গুল দিয়ে টাইপ করলে "চা ঢালতে ঢালতে যে বিয়ে করবার সময় পেলে না···"একটা প্যারাগ্রাফ লেখার পর খেয়াল হোল, বড্ড ব্যক্তিগত কাহিনী হয়ে পড়ছে। অপর একটা কাগজের বল তৈরী হোল।

তার মনে একবার সন্দেহ খেলে যায়। তার পক্ষে কি সম্ভব? যে চটুল ভঙ্গী আয়ত্ত করলে এ এলাকায় দিগ্বিজয়ী হওয়া যায় সে স্টাইল তো তার মাথা খুঁড়লেও বের হবে না, লিখতেই হাসি পাবে, মনে হবে তার নিজের লেখাগুলো তার দিকে দাঁত বার করে তাকিয়ে আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে পড়ল তার দশহাজার টাকার রাজত্বের কথা, যেখানে সে স্বাধীন, মুক্ত, কারুর পরোয়া করে না, কারুর তোয়াক্কা রাখে না।

আবার সে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলে প্রাণপণে। মিষ্টি-ওয়ালা, জুতোওয়ালা, এই সব 'ওয়ালা'দের চেয়ে তার পক্ষে বোধ হয় কোন জায়গা বর্ণনা সুবিধেজনক। গোপাল অনেকক্ষণ ভেবে 'বাজারে সকাল' বলে একটা বর্ণনা লিখে ফেললে। এবারে খুব অসুবিধে হয় না, সে নিজে ভোরবেলা ব্যালকনি থেকে কতবার দেখেছে এই দৃশ্য; তারার আলোর নীচে ঠেলাগাড়িতে মাংসের সার চলেছে, কম্ফটার চাঁদিতে জড়িয়ে বুড়োরা চলেছে পার্কে, বাসি বুঁদে ছড়িয়ে দিচ্ছে ময়রা, আর তার মাথার ওপরে সরবে চক্কোর দিচ্ছে কাকের দল।

চ্যাটারটন তার কপির ওপর চোখ বুলিয়ে তার মুখের দিকে

তাকিয়ে বললেন, "গুড্"। একটু বিস্মিতও হলেন, গোপাল যে ইংরেজী লিখতে পারবে তাঁর ধারণা হয় নি। এদেশের লোকেরা বি,এ, এম, এ পাশ করলেও ইংরেজী লিখতে পারে না, এই বদ্ধমূল ধারণা তিনি দুচার জনের ক্ষেত্রে বাদ দিলেও, কোনদিন ত্যাগ করেন নি। হঠাৎ গোপালের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তবে কি জানো, এটা বড্ড 'রিজিওন্যাল' হয়ে পড়েছে, মানে সবাই ঠিক বুঝে উঠতে পারবে না।"

গোপাল চট করে বুঝতে পারলে তার লেখা উচিত ছিল হগ মার্কেটে সকাল, যাতে সাহেব পাঠক বুঝতে পারে। তার মুখ চোখ অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে।

চ্যাটারটন আবার বললে, "তার জন্যে কিছু এসে যায় না। তুমি লিখে যাও; যা চোখে পড়বে তারই ওপর লিখবে, আর তুমি দেখছি ইংরেজী লেখো হে।"

"রিয়ালী?" গোপালের চোখ বিদ্রূপে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, মনে মনে বললে, সে এবার ভারতবর্ষে জ্ঞানী হবার পাসপোর্ট পেয়ে গেছে। কারণ এখানে জ্ঞানী হওয়া মানে ইংরেজী লিখতে পারা।

চ্যাটারটন আশ্চর্য হয়। একপলকে চৌধুরীর কথা মনে পড়ে। চৌধুরীর সঙ্গে অবশ্য তার ভাইয়ের আকাশ পাতাল তফাৎ, কিন্তু কোথায় যেন মিলও আছে। একটু রুক্ষ স্বরে বললেন, "আচ্ছা তুমি এখন যাও, সেনকে ডেকে দিয়ে যেও।"

বিকেলের পর সহকর্মীদের সঙ্গে একে একে আলাপ হোল,—রায়, অনিল, চক্রবর্তী, ম্যাকমোহন, ডেভিড ইত্যাদি।

কথা উঠল বিয়ে হওয়ার প্রসঙ্গে। ম্যাকমোহন তার স্ত্রী নিয়ে বিপদে পড়েছে, সে একটু হাতে টাকা পেলেই বাড়ি রং করাবে, নতুন ফার্ণিচার কিনবে, অফিস থেকে ধার করেও স্বামীটী পেরে উঠছে না।

রায় ফস করে বললে, "বিয়ে করলেই ফ্রিডম নষ্ট। বছর দশেক আগে আমিই কি ছাই এরকম ছিলাম। আজকের অবস্থা তখন দেখলে ক্যারিকেচার মনে হোত।" একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে বললে, "বোধ হয় সত্যিই তাই, ছেলেবেলায় অন্যরকম মনে হয়।"

গোপাল অস্বস্তি বোধ করে। প্রায় অপরিচিত একটি লোকের সামনে মিঃ রায়ের এরকম হিস্টিরিয়ায় সে বিরক্তই হয়।

ম্যাকমোহন এবার গোপালের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললে, "মিঃ চৌধুরী, তুমি কি বিয়ে করেছো ?"

মিঃ রায় তড়বড় করে বললে, "আরে এও আবার বলে দিতে হয়। বিয়ে করলে এরকম চেহারা থাকে। যত দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা এসে একেবারে শেষ করে দেয়।"

গোপাল বেশ লজ্জা পেয়ে যায়, তাড়াতাড়ি মিঃ রায়ের দিকে তাকিয়ে বলে, "কেন বিয়ে না করেও তো শুনি অনেকে দুশ্চিন্তায় কাহিল হয়ে পড়ছে।"

"না মশাই আপনি জানেন না, জানেন না, চারদিকে চ্যাঁ ভ্যাঁ করছে, নাইট ডিউটি করে শুয়েছি অমনি বাচ্চাটা ভিজিয়ে দিলে বিছানা, আবার ওঠো, এরমধ্যে কোথায় আপনার চেহারা, কোথায় আইডিয়ালিজম্—"

গোপালের তীক্ষ্ণ চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ রায় কথা বন্ধ করে দেয়। তারপর চেঁচিয়ে বলে, "আপনি নিশ্চয় আমার কথা বিশ্বেস করছেন না, করবেন, করবেন, একদিন ঠিক করবেন।"

গোপাল একবার রায়ের দিকে তাকায়। খুব যত্ন করে ধোপদুরস্ত স্যুটটি পরেছেন, একটু বেশী জমকালো টাই, গলার নীচে পাউডার। এই স্যুটপরা কাদার ডেলাটির সঙ্গে তার দিনের মধ্যে দশ ঘণ্টা কাটাতে হবে, ভেবে সে একটু দমে যায়।

গোপাল প্রথমে ভেবেছিল সে আলগা হয়ে থাকবে, অফিসের লোকজনের সঙ্গে অফিস সংক্রান্ত ব্যাপার ছাড়া বিশেষ কিছু আলাপ করবে না। কিন্তু খবরের কাগজের অফিসে দিনের মধ্যে দশ বারো ঘণ্টা একসঙ্গে কাটাতে হয় ও প্রতিমুহূর্তে পৃথিবীর সমস্ত বিষয়বস্তুর ওপর কোন না কোন মন্তব্য প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এহেন জায়গায় ঐ ধরণের মেজাজ নিয়ে চলা মুস্কিল, তাতে প্রথমে সকলেই 'স্নব' বলবে, এমনকি সাধারণ সহযোগিতারও অভাব ঘটবে। গোপালের প্ল্যান তাই টিকল না।

কিন্তু বক্‌বক্‌ সে করতে পারবে না, তার চেয়ে সে 'স্নব' হতে রাজী আছে। হঠাৎ স্বইচ টিপে দিলে আলো জ্বলার মত সে বাক্যবর্ষণ করে যাবে, এ ভূমিকায় তার নিজেকে কল্পনা করা অসহ্য।

দিন তিনেকও যায় নি। মোটামুটি দাদার কথাবার্তা থেকে এখানকার কাজকর্মের কী ধারা সে সম্বন্ধে ধারণা ছিল গোপালের। শহরের কতকগুলো জায়গা বিশেষ করে সরকারী অফিস, পুলিশের সদর দপ্তর, কর্পোরেশন, বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্স, এছাড়া কোথাও আগুন লাগল কিনা, হাওয়া অফিসে গিয়ে খোঁজ নেওয়া হঠাৎ এত গরম পড়ে গেল কেন, তাছাড়া গ্রেট ইষ্টার্ণ কিংবা গ্র্যাণ্ড হোটেলে কোন ইউরোপীয় ভদ্রলোক—ভারতবর্ষ যে মহান দেশ, একথা বলবার জন্যে এসে থাকেন তবে তাঁকে গিয়ে ইণ্টারভিউ করা ইত্যাদি হাজার রকম ঘটনার সঙ্গে নিজেকে পরিচিত করার আর্টে নিজেকে তৈরী করার ব্যাপার—এই হবে গোপালের কাজ। চক্রবর্তী বলে একজন রোগা-পানা ভদ্রলোক বললেন, "রাস্তায় বেরুনো মানেই খবর। সব সময় ঘুরবেন।"

গোপাল সেদিন সন্ধের কিছু পরেই অফিস থেকে ফিরছিল, বেশ ভালই লাগছিল তার। নেহাৎ সাহিত্য অথবা রাজনীতির

জগতে বাস করে তার বাইরেও যে নানাধরণের মানুষ আছে—এ কথা তার মন থেকে প্রায় সরে গিয়েছিল। প্রথম প্রথম যতখানি যান্ত্রিক ভাবে সে এলাইনে এসেছিল ততখানি যান্ত্রিকভাব তার বজায় রইল না, বরং বেশ খানিকটা উৎসাহ সে পেল। যদিও খুব বেশীক্ষণ ধরে কারুর সঙ্গে মিশবার বিশেষ সুযোগ নেই এবং এমনই বাঁধাধরা কঠিন নিয়মের মাঝখানে নিজেকে ফেলতে হয় যে প্রায় নিঃশ্বাস ফেলবারও সময় পাওয়া যায় না, তবুও গোপাল অন্তত বিভিন্ন স্তরের মানুষকে এই প্রথম চোখ খুলে দেখলে।

অফিস থেকে নেমেই রাস্তায় বেরুতে হঠাৎ পেছন থেকে ডাক শুনলে, "মিঃ চৌধুরী"। নামটা নিজের কাছেই এত অপরিচিত ঠেকে যে সে প্রথমে ভাবলে আর কাউকে ডাকছে কেউ। মিঃ চৌধুরী যেন তার দাদা সত্যগোপাল ছাড়া আর কারুর নাম হতে পারে না, কিন্তু একটু পাশ ফিরতেই সে দেখলে মিঃ রায় প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে তার কাছে এগিয়ে আসছে। গোপাল একটু বিরক্ত হয়ে তার দিকে তাকালে। আটটা বেজে গেছে, ঘামে জবজব করছে শরীর। এখন আবার রায় যদি তার জীবনদর্শন শুরু করে তাহলেই সে গেছে।

রায় বললে, "উঃ, আপনি কি মশাই কানে খাটো নাকি? এতক্ষণ ধরে ডাকছি, একেবারে পাত্তাই দিচ্ছেন না, তা এত সকাল সকাল কোথায় ফিরছেন?"

গোপাল আশ্চর্য হয়ে বললে, "সকাল সকাল? বাড়ি থেকে পোনে দশটার সময় বেরিয়েছি, গুণে দেখলে প্রায় দশ ঘণ্টার কাছাকাছি।"

রায় তার চকরাবকরা রুমাল দিয়ে মুখ মুছে বললে, "এতেই হাঁপিয়ে গেলেন। সেই দাঙ্গার সময় তিনদিন পরপর কনস্ট্যাণ্ট ডিউটি দিতে হয়েছে।"

গোপাল একটু বিরক্ত হয়ে বললে, "এখন তো দাঙ্গা বাধে নি। দরকার পড়লে না হয় সেরকম ডিউটি দেওয়া যাবে।"

রায় এবার অবাক হয়। সাধারণত বড়বয়সের লোকদের সম্মান করে কথা বলার মামুলী নিয়মটা গোপাল বিশেষ শ্রদ্ধা করে বলে মনে হোল না। রায় আবার বড্ড তাড়াতাড়ি আহত হয়ে পড়ে। বলে, "আপনি খুব চটে যাচ্ছেন দেখছি। আমি বলছিলাম কি এখন আর বাড়ি গিয়ে কি করবেন? সন্ধেটা তো আর কোথাও কাটানো যাবে না, তার চেয়ে বরং এখানেই চৌরঙ্গীতে কোথাও—"

গোপাল একবার ভাবলে। সত্যিই গত কয়েকদিন ধরে সে তাড়াতাড়ি ফেরবার চেষ্টা করেছে, আর তার বাড়িতে তো বিশেষ কোন আকর্ষণ নেই, দাদা থাকলে কিংবা হাসি থাকলে তাও একটা কথা ছিল। গোপাল কল্পনা করে পরপর তিনখানা ঘর খালি পড়ে, গুজারাম রান্নাঘরের এক কোণে আফিংয়ের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। কোথায় যাবে? কেন যাবে? বাড়ি গিয়ে যদি আর কোথাও যাবার সময় থাকতো তাহলেও কথা ছিল। আর এই পরিশ্রমের পর কোন সাহিত্যিক আড্ডায় গেলে বেশ শ্রান্তভাবে রাজা উজীর মারা যায় কিন্তু ভাবতেই তার গা ঘুলিয়ে ওঠে। তাছাড়া রাত নটা নিশ্চয় প্রশস্ত সময় নয় কারুর বাড়ি যাবার পক্ষে।

রায় বললে, "কী অতো ভাবছেন, এলাইনে যখন এসেছেন তখন কত এনগেজমেণ্টই ভাঙ্গতে হবে, কত থিয়েটার সিনেমার টিকিট মাঠে মারা যাবে।"

ফুটপাথের দুপাশ দিয়ে জুতো পালিশের দল প্রায় পা চেপে ধরছে। দুতিনজনকে ধমক দিয়ে রায় বললে, "আপনি কি খুব ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির? এলাইনে থাকতে গেলে আবার শরীরটাকে চাঙ্গা না করে নিলে— বুঝতেই পারেন এত লং আওয়ার্স।"

তারপর গোপালের তরুণ মুখের দিকে তাকিয়ে কী ভেবে বললেন, "তা আমি আপনাকে এ রাস্তায় এনেছি, এই তো আবার গিয়ে বলবেন সকলের কাছে, তার চেয়ে…"

গোপাল শান্তভাবে বললে "মদ খাওয়ার কথা বলছেন? আমি যখন থার্ড ইয়ারে পড়তাম তখন একবার বাজি রেখে তিনপেগ পোর্ট খেয়ে একপায়ে দাঁড়িয়েছিলাম। তবে ও ব্যাপারটা নিয়ে দেবদাস হতে আমার আপত্তি আছে।"

রায় থমকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, "দেবদাস? হোয়াট ডু ইউ মিন?"

গোপাল একবার তাকালে রায়ের দিকে, মনে হোল কী দরকার এ নিয়ে কথা বলে। একটা হাত তুলে টপ করে সমস্ত কথাটা তুলে নিয়ে বললে, "চলুন, যা গরম পড়েছে, এক গেলাস ঠাণ্ডা বিয়ার খেতে বেড়ে লাগবে।"

রায়ও উৎসাহিত হয়ে উঠলে। রাস্তায় যেতে যেতে একালের ছেলেদের যে উন্নতি হচ্ছে, 'ট্যাবু' যে মানা উচিত নয় এ সম্বন্ধে আবার কথা আরম্ভ করে দিলে। গোপাল শুনেছিল দাদার কাছে এ লোকটির ব্যাপার। কিন্তু এরকম অকারণে বক্‌বক্‌ করতে পারে, ধারণা করতে পারে নি। কিন্তু গোপাল চাইলেই বা কার কাছে যাবে? তার পুরনো দিনগুলোর কথা মনে হয়। একটা অস্পষ্ট বেদনাদায়ক স্মৃতি বুকের মধ্যে নড়ে উঠে আবার কোথায় মিলিয়ে যায়। একবার নয়নকে মনে পড়ে। এখনও যেন সে চোখের সামনে তাকে দেখতে পাচ্ছে। ধারাল ঝকঝকে চেহারা, কোন গিন্নীমো নেই, কিসের তপস্যায় যেন নিজেকে তৈরী করছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই তপস্যার গন্তব্যস্থল হোল পণ্ডিচেরী? ভাবতে গিয়ে কেমন শরীর অবশ হয়ে যায় গোপালের।

আর দাদা ছিল, যদিও তার সঙ্গে মতে মেলে নি, কিন্তু দাদাকে সে শ্রদ্ধা করত, তার সঙ্গে ঝগড়া করত, তর্ক করত, সত্যগোপালের কার্সিয়াঙে সম্পূর্ণ আত্মবিলোপের পর সে বুঝতে পারে তার বুকের বেশ কিছুটা জুড়ে তার দাদা ছিল।

গোপালের যতবারই তার শূন্য ঘর, তার সাজানো বইয়ের তাকের কথা মনে হয় ততই তার বুকের ভেতরে কেমন অস্বস্তি বোধ করে। একবার মার কথা মনে পড়ে। মার সম্বন্ধে যতটুকু সে দাদার কাছ থেকে শুনেছে তাতেই সে একটা তীব্র আকর্ষণ বোধ করেছে তার মার সম্বন্ধে। সঙ্গে সঙ্গে একথাটাও ভাবে সে তো ইচ্ছে করলে তার জীবনসঙ্গিনী খুঁজে নিতে পারে। এ ব্যাপারে তার বন্ধুবান্ধবেরা যে তাকে সন্ন্যাসী বলে সেটা কি একেবারে মিথ্যে! কিন্তু জীবনসঙ্গিনীর কথা ভাবলেই তার ঠোঁট কুঁচকে যায়। জীবনসঙ্গিনী মানেই গিন্নী, একেবারে বুকে চেপে বসা, একেবারে আঁকড়ে-ধরা কোন মেয়ে, তার পাড়ার দুধার দিয়ে যে সব বাড়ি তাদের মেয়েদের সে নিজের জীবনসঙ্গিনী কল্পনা করেই আঁতকে ওঠে। তার মনে হয় সে যেটুকু কাজ চিন্তা অভিজ্ঞতার মাঝখান থেকে পেয়েছে তাদের মাথায় বাড়ি দিয়ে জীবনসঙ্গিনী আসবে।

রায় গোপালের অন্যমনস্ক ভাব লক্ষ্য করলে। গোপালের চোখ দুটো আরো তীব্র হয়ে উঠেছে, নাকের পাতা কাঁপছে, বিয়ারের গেলাসে কয়েক চুমুক দেবার পরই তার মুখখানা আবেগে যেন থমথম করে।

রায় ভেবেছিল মুখ খুলবেনা, কিন্তু পারে না, সে অনুভব করে গোপাল তার সঙ্গে এক টেবিলে বসে পান করলেও সে কোনদিনই এক বোতলের ইয়ার হতে পারবে না। কিন্তু পেটে রাম পড়বার পরই রায়ের জিভ আলগা হয়ে যায়। দুনিয়ায় ভ্রাতৃত্ব বোধ সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ হয়ে

পড়ে। এবং তার মত অনুযায়ী চললেই যে দুনিয়াটার একটা হিল্লে হয়ে যেত সে কথাটা বলবার জন্যে ছটফট করতে থাকে।

হঠাৎ আর এক পেগ রাম নিঃশেষ করে বলে ওঠে, "আপনার ভেতর দিয়ে আমি আজ নিজেকে দেখছি।"

গোপাল চমকে ওঠে। তার যেন ধ্যানভঙ্গ হয়। ভারি গাঢ় গম্ভীর স্বরে বলে, "কি বললেন মিঃ রায়?" মিঃ রায় বললে, "আমি শুনেছি ইউ আর এ পোয়েট। আমি ঠিক কখনও পদ্য লিখিনি। তবে বাংলাদেশে কমবয়সে ওরকম কে না ভাবে বলুন? এখন সবই এত ডাল, কালারলেস লাগে।"

গোপাল কিছু বলেনা, আর এক গেলাস বিয়ার ঢেলে গেলাসের মাথায় ফেনার দিকে তাকিয়ে থাকে।

মিঃ রায় বললে, "আগে ঠিক আপনার মতই, যাকে বলে বাংলাতে ...মানে একটা নিষ্ঠা ছিল। বন্ধুত্বে বিশ্বেস করতাম, ভালবাসায় বিশ্বেস করতাম...

গোপাল তার বাঁ হাতখানা ওপরে তুললে। এমন রাজকীয় মেজাজে ও গাম্ভীর্যে একবার উঠেই তা টেবিলের ওপর জমা সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে দিল যে রায় কথা বন্ধ করে দিয়ে তার দিকে উৎসুকভাবে তাকিয়ে থাকে।

গোপাল শান্তভাবে বললে, "দিস ইজ এ্যান ওল্ড স্টোরী মিঃ রায়, আর কিছু আছে?"

মিঃ রায় একটু অসন্তুষ্ট হলেন। কষ্ট করে নিজের উপার্জিত অর্থে মদের যে নেশা এসেছিল সে চটকা কেটে যায়। কেমন একটা তন্দ্রাচ্ছন্নভাব এসেছে এ সময়, বেশ নিজেকে মেলে ধরতে ইচ্ছে করে তার কিন্তু গোপাল যে মদের টেবিলেই এমন বেয়াড়া হতে পারে স্বপ্নেও ভাবে নি। বেশ একটু রেগেমেগেই বললে, "ওল্ড স্টোরী ওল্ড স্টোরী

বলে চেঁচিয়ে লাভ কি ? নিউ স্টোরী মানেই তো বক্তৃতা, শ্লোগান। জানেন মশাই আমার বউকে আমি 'পিটি' করি, তাকে ভালবাসতে পারি না, এর চেয়ে তো বড় স্টোরী আমার কাছে নেই। আপনার বয়েস আছে। আপনি এখন কয়েক বছর বক্তৃতা করে নিন।"

গোপাল চুপ করে থাকে। এক সপ্তাহও আলাপ হয়নি এরই মধ্যে লোকটা তার পারিবারিক কথা বলতে সুরু করেছে এইভাবে, একেবারে পোকার মত এতটুকু ছোট্ট মনে হয় রায়কে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রায় যেন কোথায় তাকে আঘাত করেছে। একটা জায়গায় তার ফাঁক আছে, বোধহয় সেইজন্যেই সে এত অস্থির, এত অসহিষ্ণু, আর রায় বেছে বেছে ঠিক সেই জায়গাটাতেই নখ ঢুকিয়েছে।

গোপাল ধীরে ধীরে কথা বলে। তার মুখ থেকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের উজ্জ্বলতা সরে গিয়ে এক প্রশান্ত গাম্ভীর্য থমথম করতে থাকে। মিঃ রায়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে, "নিউ স্টোরী মানেই বক্তৃতা আর শ্লোগান না, মিঃ রায়।"

মিঃ রায় চেঁচিয়ে উঠে বললেন, "আপনি বুকে হাত দিয়ে তা বলতে পারেন ?"

গোপাল শান্ত ভাবে বলে "চেঁচাবেন না মিঃ রায়, বক্তৃতা দেওয়া দূরের কথা, চেঁচিয়ে মনের কথা বলতে কিংবা শুনতেও আমার অসহ্য লাগে।" রায় এ তিরস্কারে একটু থমকে যায়। একবার খুব অস্পষ্ট ভাবে মনে হয় দুই ভাইয়ের কোথায় যেন এক সাদৃশ্য আছে, আবার কোথায় যেন তারা একেবারে আলাদা।

গোপাল বললে, "পাওয়া তো আর রসগোল্লা খাওয়ার ব্যাপার না। আমরা হয়তো অনেকেই বঞ্চিত। যেমন মনে করুন, আমার বন্ধুরা মেয়েদের ব্যাপারে আমায় বলে সন্ন্যাসী। আমি সবটা না মানলেও কিছুটা মানি। কিন্তু তার জন্যে আমি অপেক্ষা করতে

রাজী আছি, খুঁজতে রাজী আছি। এমন কি নিজেরা যদি ব্যর্থ হই তার জন্যে সমস্ত মানুষের ইতিহাসকে কাদায় ঠাসা কেন? এ কাদা ছোঁড়ার সান্ত্বনা কি?"

রায় চেঁচিয়ে উঠলে, "ব্রাভো, আই সি ইউ আর এ পোয়েট। আপনি যাই বলুন অপটিমিজম পেসিমিজম্ একটু চাঙ্গা না হলে ঠিক··· বয় এখানে এক পেগ ব্র্যাণ্ডি। ব্র্যাণ্ডি আর বীয়ারে পাঞ্চ হলে দেখবেন এখন।"

গোপাল আবার বিদ্রূপের ভঙ্গীতে ফিরে আসে। তার সবচেয়ে প্রিয় কথা যেখানে কোন পাত্তাই পাবে না সেখানে কথা বলে লাভ কি? কিন্তু কাকে সে কথা বলবে? তার নিজস্ব কথা তার নিজস্ব ঢংএ যে তাকে বলতেই হবে। নইলে সে কী করে দিন কাটাবে একটা আলাদা মানুষের মুখোস পরে?

রায় বললে, "দেখুন, আগে সব জিনিষ অন্যভাবে দেখতাম। বই-এ, উপন্যাসে কবিতায় বোধ হয় এ ভাবে দেখোনো হয়। যাকে বলে চিত্ত জয় করার জন্যে। এই যে আমাদের অফিসের মিঃ সেন, আর কিছুদিন পরেই দেখবেন, আমাদের সমস্ত নষ্টের মূল···একেবারে ইতর মশাই। কিন্তু জানেন সেক্সপীয়রের ইয়াগো যখন পড়েছিলাম তখন মনে হোত শয়তানেরও একটা রং আছে। এখন সব ডাল, মনোটোনাস। বোধ হয় যারা অনেক কিছু চায় তাদেরই এরকম হয়।"

গোপালের চোখ জ্বলে ওঠে মুহূর্তের জন্যে। বলে, "কি হতে চেয়েছিলেন মিঃ রায়?" তারপর শান্তভাবে বললে, "আমার মনে হয় আপনি যা হতে চেয়েছিলেন ঠিক তাই হয়েছেন।"

রায় এবার আহত হয়। একটু ভারি গলায় বলে, "আমি ভেবেছিলাম আপনি আপনার দাদার মত নন, এখন দেখছি···"

"হ্যাঁ আমার প্যানপেন করা ভাল লাগে না, শুনলে গা জ্বালা করে। উঠুন, গরম লাগছে।"

রায় তাকে 'আপনি মশাই বড্ড বেরসিক' ইত্যাদি বলে বসাবার চেষ্টা করলেও সে শুনলে না। রায়কে প্রায় ঠেলতে ঠেলতে বাইরে নিয়ে গেল।

রাস্তায় নামতেই মেঘ ডেকে উঠল। বৃষ্টি হবে না, তবে ধুলোর ঝড় হতে পারে। এ বছরে এখনও ধুলোর ঝড় সুরু হয় নি।

গোপাল যদিও রায়কে টানতে টানতে বার করলে কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে আবার ভাবলে একেবারে রাত্তির এগারোটার সময় বাড়ি ফিরলেই হোত। একেবারে গা ধুয়ে শুয়ে পড়লেই হোত। হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে সে কার্জন পার্কের দিকে পা বাড়ালে।

রায় বললে, "কী মশাই, বাড়ি ফিরবেন না?"

"না, একটু বেড়িয়ে আসছি।" গোপালের গলা ট্রামের আওয়াজে চাপা পড়ে গেল।

সমস্ত আকাশ কালো হয়ে আছে, গঙ্গার জলও কালো, মাঝে মাঝে দমকা গরম হাওয়া দিচ্ছে। মাঠের মাঝখানটা এত রাত্তিরেও ঠাণ্ডা হয় নি। আকাশে মেঘ ডাকছে, কিন্তু শুকনো আওয়াজ। একটা বুক চাপা গর্জন একটু উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে।

গোপাল একেবারে জলের কিনারে গিয়ে বসে। না, সে আর ঠিক থাকতে পারবে না আগের মত। আগে সম্ভব ছিল, এমন কি দাদা চলে গেলেও একটা বিরাট ফাঁক বলে মনে হয় নি। কারণ আগে ঠিক এ ভাবে নিজেকে যুক্ত করে সমাজকে দেখতো না, সমাজের গ্লানির অংশীদার হয় নি সে। আগে সে নিজে ছিল শুচি, কাজেই তার শুচিবাইয়েরও হয়তো একটা মানে ছিল, কিন্তু এখন আর কোন

মানে থাকে না। এখন একলা লাগে, ফাঁকা লাগে, তিনখানা পর পর সাদাঘর দেখতেই অসোয়াস্তি লাগে।

গোপালের বাঁচার এক অহঙ্কার আছে, দেমাক আছে। যার জন্যে সে যা চায় মুহূর্তের জন্যেও তাকে খাটো করতে দিতে রাজী নয়, বরং না খেয়ে থাকব কিন্তু এঁটো খাব না, এরকম একটা জোর, সাহস আছে। কিন্তু এই অহঙ্কারই তো সবটুকু কথা নয়। এই অহঙ্কারের কি এতই তেজ যে তা প্রতিদিনের বিরক্তি ক্লান্তির কালিকে ম্লান করে দিতে পারে? তার জন্যে যেন আরো কিছুর দরকার, তাকে বোধ হয় একমাত্র আনন্দ ছাড়া আর কিছু বলে বর্ণনা করা যায় না। গোপাল কি সত্যিই সে আনন্দ পেয়েছে জীবন থেকে?

অথচ এই আনন্দলাভ না হলে সত্যিই 'আমি'কে সমাজের সঙ্গে মেলানো যায় না। হয় মিঃ রায়ের মত সমস্ত পৃথিবী আর তার মানুষকে ক্রমশঃ ছোট করে একটা 'ফুটকী' এই 'আমিতে' এনে ফেলতে হয় নতুবা 'আমি'কে প্রায় ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হয়, গোপাল যা করে এসেছে এতদিন। কলেজের জীবনে সে এই সমস্যা নিয়ে একটা দর্শন-ঘেঁসা প্রবন্ধ লিখেছিল "সমন্বয়ের পথে—আমি ও আমরা," ইতিহাসের নজীর দেখিয়ে প্রমাণ করেছিল কেমন ভাবে 'আমি' 'আমরা' হয়ে দাঁড়ায়। এখন সে ম্লানভাবে হাসে। রূপান্তরটা যদি ঠিক অতো সোজা হোত, কিংবা তার ধার কাছ দিয়েও যেতো তাহলে তো তাকে আর সন্ন্যাসী হয়ে থাকতে হত না।

সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী, কিন্তু সন্ন্যাসীই বা কেন? তার কলেজের বন্ধু অমিয় তার সম্বন্ধে কথাটা প্রথম ব্যবহার করেছিল। কিন্তু অমিয় যে রাস্তা নিয়েছে সে রাস্তায় সে তো বাঁচতে পারে না, প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। সমস্ত জীবনের শূন্যতা কতকগুলো অসংলগ্ন মুহূর্তের আনন্দে রাঙ্গাবার চেষ্টা, সে তো প্রায় অসম্ভব তার পক্ষে। অনেকের চোখে

অমিয় হয়ত আরও রঙ্গীন, কিন্তু এ রঙে কি করে গোপাল মজবে? যৌবনের হিরো অমিয় দত্তকে সে আবার দেখতে চায়। সমস্ত জীবনটা যদি কয়েকটা উজ্জ্বল মুহূর্ত হোত তাহলে গোপাল নিজেকে আল্‌গা করে দিত। এই ফেনার মত জীবনপ্রবাহে নিজেকে একটা বুদবুদের মত ভেবে নিজেকে কিছুক্ষণের জন্য জ্বালাবার চেষ্টা করত। কয়েকটা নাটকীয় ক্লাইমেক্স—তা প্রেমেরই হোক কিংবা দেশসেবারই হোক—তাই দিয়ে নিজেকে বাঁধতে চেষ্টা করত। কিন্তু সে তা পারবে না।

কিন্তু শুধু না করেই তো সে বাঁচতে পারে না। সারা জীবন হ্যাঁ করবার জন্যে তাকিয়ে আছে, অপেক্ষা করছে তার দিকে। শ্লোগান কিংবা বক্তৃতা বাদ দিয়েও সে কি সেই 'নিউ স্টোরী' তার জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে?

গোপাল জলের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটা সাদা কালো জাহাজ, জলের খুব কিনারে ভূতের মত দাঁড়িয়ে। বৃষ্টি নেই, ঝড় নেই, শুধু মাঝে মাঝে শুকনো মেঘের আওয়াজ, একটা চাপা গোঙানির মত। গোপালের মনে পড়ে তার ঘরখানার কথা, সে গুজারামকে তার পাশের ঘরে শুইয়ে রেখেছে। গুজারাম তার ছেলেবেলার গল্প করে। সে এখন গোপালের মতিগতিতে বেশ সন্তুষ্ট। গোপাল যে তার দাদার চাকরীতেই শেষ পর্যন্ত ঢুকলে এতে গুজারামের আর কোন আফশোষ নেই, সে ঠিক করেছে তার গাঁ সম্পর্কের কোন তরুণকে এনে গোপালের কাজে বাহাল করবে। তারপর জীবনের কয়েকটা দিন অড়হর ক্ষেতের ধারে গাঁয়ের ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে খেলা করে কাটিয়ে দেবে। গোপালকে সে আজকাল প্রায়ই বলে, "একটা বহুটহু আনো ছোটবাবু, তোমার ঘরগুলো বেমালুম কাঁদছে।" গোপাল যখন তাকে বুঝিয়েছে তার চাকরীর অনিশ্চয়তা সম্পর্কে তখন গুজারাম কোন পাত্তাই দেয় নি, জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করে সে বলেছে,

"একটা জিন্দিগী নিয়ে ভিয়ে দুঃখ্, সাদি করলে দুটো জিন্দিগী, কি চারটো জিন্দিগী। উসমে কেয়া বাত হ্যায়?"

না, ঠিক বিয়ে-পাগলাভাব গোপালের আসে নি। ওটা যে কোন সমাধান নয় তা তার কাছের লোকদের দেখেই বুঝতে পারে।

গঙ্গার ওপারে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, দমকা হাওয়া আসে। নদীর বুক থেকে একটা ষ্টীমার চলে যাওয়ায় জলগুলো ছল ছল করে ওঠে। গোপালের বুকের মধ্যেও এমনি এক অস্বস্তির ঝড় ওঠে। আবার বিদ্যুৎ চমকায়, গোপালের মনে পড়ে তার শোবার ঘরের জানলা দিয়ে বিদ্যুতের ঝলকে তার ঘর আলো হয়ে উঠেছে। একলা নিঃসঙ্গ ভাবে হলেও সে এই ঘরেই প্রাণপণে বাঁচতে চেষ্টা করেছে, নিজেকে বিকিয়ে না দিয়ে, কোন আক্ষেপ না করে। কিন্তু এ নিঃসঙ্গতা একেবারে পাথরের মত চেপে বসেছে। সেখান থেকে মুক্তির জন্যেই তো তার দাদার চাকরীতে আসা, নইলে হঠাৎ সংসারী মনোভাব নিয়ে পশ্চাতের উন্মাদনার জন্যে অনুতপ্ত হয়ে, রোজ সকালে কাটাপোনার দাগা না হলে পৃথিবীকে খারাপ লাগবার মত মনোবৃত্তি নিয়ে সে তো চাকরী করতে আসে নি।

কিন্তু মানুষ মানেই যদি দাঁড়ায় মিঃ রায়, যে কোন ছুতো খুঁজছে খুঁত খুঁত করার জন্যে তার সাহিত্য পড়া, রাজনৈতিক ঘটনা, অফিস সবগুলোই ব্যবহার করছে তার এই প্যানপেনে দর্শনকে জোরাল করার জন্যে—তাহলে? তাহলে সমাজে বর্তমান অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত থাকতে গেলে কি শেষ পর্যন্ত লেজে বাড়ি খাওয়া কুকুরের মত কেঁউ কেঁউ করে মরতে হবে? অথবা মরিয়ার মত দাঁত মুখ খিঁচিয়ে আধখানা পা বর্তমানে আর দেড়খানা পা সমাজবিপ্লব-পরবর্তী ভবিষ্যতে দিয়ে বাঁচতে হবে? শেষ পর্যন্ত কি এই দুটোই পথ? অন্ধকারে গোপাল চীৎকার করে উঠল, "নো, নো"।

তিন

বাড়িতে পা দিয়েই গোপাল চমকে যায়। একটা চেনা তামাকের গন্ধ। বছর দু'এক আগে দাদা থাকতে এই তামাকের গন্ধ সে পেয়েছিল। এক মুহূর্তে মনে পড়ে—যোগেনবাবু, দাদার প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকায় যে হাত দিয়েছে, তাঁর কলকাতায় শেষ কয়েকটা দিন যে বিষাক্ত করে তুলেছে।

দরজা খুলবার আগেই তার মুখ শক্ত হয়ে যায়। কী করে দাদা শেষ পর্যন্ত এই লোকটাকে বিশ্বেস করে নিজে কেসে ঝুলেছিলেন ভেবে সে আগে অনেকবার অবাক হয়েছে। কিন্তু দরজা খুলে সে আরও অবাক হয়ে পড়ল।

মোটা মাঝবয়সী ভদ্রলোকটি তাঁর চকচকে টাকটি তার দাদার ইজিচেয়ারে একদিকে হেলিয়ে খুব প্রশান্ত মনে গড়গড়া টানছেন, ঘরের এক কোণে একটি আঠারো উনিশ বছরের মেয়ে।

গোপালকে দেখেই একটু উঠবার চেষ্টা করে যোগেনবাবু বললেন, "এই যে গোপাল এসেছো, তোমার জন্যেই আমরা বসে আছি। তোমারও দেখছি কাগজের ঝামেলা।"

গোপাল চোখ কুঁচকে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললে, "ইনি কে?"

"ওমা তুমি একে দেখনি, তার আর দেখবেই বা কবে! দেশ গাঁয়ের সঙ্গে তো কোন যোগ নেই। তার ওপর আবার পার্টিশন। লতু মা, তোমার দাদাকে একবার প্রণাম করো।"

গোপাল বললে, "থাক, প্রণাম করতে হবে না, আপনাদের খাওয়া হয়েছে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ সে তোমায় বলতে হবে না বাবা, গুজারাম তোমাদের বেড়ে চাকর। খুব খাইয়েছে, বললাম, শুনলে না, সন্ধেবেলা গিয়ে

ফের বাজার করে আনলে। ইলিশ মাছ ভাজা, হিং দিয়ে অড়হরের ডাল।” গোপালের পরিশ্রান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন “তা তোমার তো বাবা এখনও খাওয়া হয় নি। যাও মা লতু তুমি পাশের ঘরে দাদার খাওয়া দেখো গে।”

জড়োসড়ো মেয়েটি উঠবার চেষ্টা করতেই গোপাল বলে উঠল, “না না আপনারা এখন বিশ্রাম করুন। আমার পাতের পাশে কেউ তদারক করলে অস্বস্তি হয়।”

ভদ্রলোকের গোল গোল চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। বলেন, “সে কি, বাঙালীর ছেলে!”

গোপাল বিরক্ত হয়ে বলে, “বাঙালীর ছেলে তাতে কি?”

ভদ্রলোক বোধহয় আরও কিছু বলতেন, কিন্তু গোপাল তাকে সুযোগ না দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

অন্যদিন গোপাল পাশের ঘরেই খায়। কিন্তু আজ রান্না ঘরে একটা আসন পেতে বসলে। গুজারামের কাছ থেকে ব্যাপারটা জানতে হবে। তার দূর সম্পর্কের এই মেশোর ইতিহাসটা মোটেই আনন্দদায়ক নয়। প্রথম জীবনে এক বড় ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে ঢুকে বেশ করে খাচ্ছিলেন, মক্কেল পাকড়াতেন রাজা-মহারাজা জমিদার গোষ্ঠীর ভেতর থেকে। গাড়ি কিনে বৌকে মোটর ড্রাইভ করাও শিখিয়েছিলেন। কলকাতায় প্রায় জমি কেনেন কেনেন ঠিক এমনি সময় এক জোচ্চুরীর কেসে জড়িয়ে পড়লেন। চাকরী গেল। তারপর নিজেই একটা কোম্পানী খুললেন, উড়িষ্যার কয়েকজন রাজা আর কলকাতার অবসরপ্রাপ্ত সরকারী চাকুরেদের নিয়ে। গোপালের দাদাও এর অন্যতম ডাইরেক্টর হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত দাদাকেও কেসে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল, টাকা দিয়ে নিস্তার পেয়েছেন। এই ড্যাবডেবে চোখ, ফন্দীবাজ মেশোটির এ বাড়িতে হঠাৎ এসে চড়াও

হওয়ার পেছনে যে নিশ্চয় কোন নতুন ষড়যন্ত্র আছে, গোপাল স্পষ্ট অনুভব করে।

গুজারামের সেদিন নেশা ছুটে গিয়েছিল। রুটি সেঁকে গোপালের পাতে দিতে দিতে 'স'-কে ইংরেজী এস্-এর মত উচ্চারণ করে বললে, "সাবধান, সাবধান ছোটবাবু, এ লোক বড্ড বদমাস্।"

"কেন, কিছু শুনলি নাকি?"

গুজারাম চোখ কুঁচকিয়ে বললে, "এ কী বোলছিল জানো, এতগুলো ঘর নিয়ে আপনি একলা আছেন আর রেফিউজি কলোনীতে কষ্ট করছে।"

"কষ্ট করছে?" গোপালের খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। চিরকাল কলকাতায় কাটিয়ে যোগেনবাবু রেফিউজি হয়ে সরকারী লোনে জমি কিনেছেন, বাড়ি তুলেছেন।

"আর ঐ যে মেয়েটা দেখছেন, ওর সঙ্গে আপনার সাদি হবে", পরম প্রশান্তভাবে গুজারাম মন্তব্য করলে।

"দূর!" গোপাল এবার সশব্দে হেসে উঠল।

গুজারাম চটে গিয়ে বললে, "হাসবেন না, আমি ঠিক বলছি।"

গোপাল মুখ গম্ভীর করলে। এই লোকটাই দাদার অর্থ কষ্টের সময় তাঁকে আরো পাগল করে তুলেছে, কেসে জড়ানর পর তো যন্ত্রণার আঁশবঁটিতে কুচিয়েছে। কিন্তু কোন লজ্জাসরম নেই। আবার এসেছে তারই ভাইয়ের কাছে নির্বিকার ভাবে, যেন তার দৌরাত্ম্য খুবই ন্যায্য। আর যখন দাদা তার ফাঁদে পড়েছে তখন তার ছোট ভাইও পড়বে, এটা লোকটার কাছে প্রায় স্বতঃসিদ্ধ।

দুতিন দিন চলে গেল কিন্তু যোগেনবাবু কোন কথা পাড়লেন না। একবার বললেন, "যখন এসেই পড়েছি তখন কদিন থেকেই যাই, তোমার তো আর কোন কষ্ট নেই, একলা মানুষ…"

গোপাল প্রকাশ্যে 'না' করতে চেয়েছিল কিন্তু পারলে না। সত্যিই যে তিনখানা ঘরে দাদা, বৌদি, হাসি, সে নিজে সবাই মিলে কাটিয়েছে সে তিনখানা ঘরে সে যে খুব কষ্টেসৃষ্টে আছে তা নিশ্চয় বলতে পারে না, তবে একটু অস্বস্তি বোধ করে। যখন স্নানের ঘরে গিয়ে গ্যাখে দড়িতে মেয়েদের ছোট জামা টাঙ্গানো, কিংবা নাইট ডিউটি পড়লে একটা অপরিচিত ঘুমন্ত মেয়ের ঘর দিয়ে তার ঘরে ঢুকতে হয়, তখন একটু অস্বস্তি লাগে বৈ কি?

তৃতীয় দিন সকাল বেলা চায়ের টেবিলে যোগেনবাবু কথাটা পেড়েই ফেললেন, "বাবা, তোমায় একটা কথা বলব ভাবছিলাম।"

গোপাল খবরের কাগজ থেকে মাথা তুলে শান্ত ভাবে বললে, "বলুন।"

"ব্যাপারটা কিছুই না। একটা সামান্য সই করার ব্যাপার। লোতু দে তো মা কাগজখানা।"

পাশের ঘর থেকে কন্যাটি একখানা ছাপানো ফর্ম নিয়ে এল, গোপাল এক নজর দেখেই বুঝতে পারে, দাদা যে ফর্মে সই করেছিল সেই ব্যাপার। যোগেনবাবু নিশ্চয় ভেবেছেন গোপাল এ সব খবর রাখত না, নইলে একই কায়দায় ছোট ভাইকে ঘায়েল করবার ফন্দী আঁটলেন কেন?

গোপাল বললে, "কী ব্যাপারটা? আগে বলুন, তবে তো সই করব।"

"ব্যাপার আবার কি, ব্যাপার কিছুই না, খুব রেসপন্স পাচ্ছি··· কোম্পানীটা খুলে বুঝলে না আগে ভাবতেই পারি নি। এখন দেখছি একটু চেষ্টা করলেই—"কথাটা না শেষ করে নিজের ফাউণ্টেন পেন সামনে ঠেলে দিয়ে কাগজের একটা ফাঁকা জায়গা দেখিয়ে বললেন, "এই যে এইখানটায়।"

"আমি তো জানিনা ব্যাপারটা কী? আগে তা বলুন, তারপর তো সই করব।" গোপাল শান্তভাবে কথা বলতে চেষ্টা করে, কিন্তু তার গলার স্বরে মনে হয় সে প্রাণপণে একটা উত্তেজনা থামাবার চেষ্টা করছে, তার নাকের পাতা কাঁপতে থাকে।

যোগেনবাবু তার দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে বলেন, "এর মধ্যে ব্যাপারের কী থাকতে পারে? আমি কি জাল জোচ্চুরী করছি। আমাদের বোর্ডে একজন ইয়ং মেম্বারের থাকা দরকার। বেশ চটপটে চালাক চতুর। তুমি হচ্ছো যাকে বলে ঠিক টাইপ, খবরের কাগজে কাজ করো…"

"আমার দ্বারা হবে না, আপনি আর কাউকে দিয়ে সই করিয়ে নিন।"

যোগেনবাবু গোপালের গলার স্বরে একটু অবাক হয়ে তাকান। তিনি গোপালকে নেহাৎ ভালমানুষ হিসেবেই ভেবেছেন। এরকম মূর্তি ধারণ করবে সত্যগোপালের ভাই তিনি ভাবতে পারেন নি। তাঁর অনেক প্ল্যান ছিল গোপালকে নিয়ে কিন্তু আরম্ভতেই এরকম বাধা পেয়ে ভড়কে যান। একবার মেয়েকে চোখ দিয়ে ইশারা করে পাশের ঘরে যেতে বলেন। "তা যখন করবে না বলছো কোর না, তাহলে আর একটা ব্যাপারে আমায় উদ্ধার করে দাও। এটা তোমায় করতেই হবে বাবা।"

গোপাল লক্ষ্য করলে ভদ্রলোক টপ করে গলার স্বর পাল্টে ফেললেন। সাধধান হয়ে বললে, "এটা কি ব্যাপার?"

"আবার ব্যাপার বলছিস? আমার নামে বাজারে বদনাম হয়েছে বলে কি তোরাও আমায় বিশ্বেস করবি না?"

ভদ্রলোক প্রায় ভেঙ্গে পড়েন, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "জানো তো বাবা, ইন্‌সিওরেন্‌সে আজকাল কিছুই হয় না,

কোথায় হবে? লোকেদের বেঁচে থেকেই খাবার পয়সা নেই, মরে গেলে কি হবে অতো ভাববার সময় কই।" একটু থেমে বললেন, "সেই ভেবেই তো একটা প্রেস করেছি।"

"প্রেস! কোথায়?" গোপালের গলা তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

"হ্যারিসন রোডে," ভদ্রলোক টপ করে জবাব দেন। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন।

"কী নাম?"

"নাম—নাম? নাম···সদানন্দ প্রেস"

হ্যারিসন রোড এসেছিল খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু সদানন্দ প্রেস এল বড্ড দেরীতে। গোপাল লক্ষ্য করলে ভদ্রলোক একটা অস্থিরতা ঢাকবার জন্যে বলে উঠলেন, "আর নাম দিয়ে কি হবে? চমৎকার প্রেস, তবে কি জানো, টাইপগুলো কিছু বদলাতে হবে। তার ওপর বিশেষ অর্ডার পাচ্ছিনা, পুজোর আগে কিনা! এদিকে লোকের মাইনে জমে যাচ্ছে। এই শ পাঁচেক টাকা যদি ধার দিতে পারো, তোমার পক্ষে তো···"

গোপাল চেষ্টা করছিল নিজেকে শান্ত করতে। লোকটা কী বলছে সে শুনতে পায় না শুধু নিজেরই হৃৎপিণ্ডের শব্দ তার কানের ওপর আছড়ে পড়ে। হঠাৎ সে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, "হবে না।"

তার গলার তীক্ষ্ণতায় পাশের ঘর থেকে যোগেনবাবুর মেয়েটি এসে দরজার কাছে দাঁড়ায়।

যোগেনবাবু মুহূর্তের জন্যে একটু বিচলিত হয়ে গোপালের দিকে তাকান, পর মুহূর্তেই তিনি একেবারে স্নেহে গলে পড়েন, "হবে না, হবে না কিরে বোকা? এর মধ্যে আর না হবার কি আছে। আমি তো আর এমনি চাইছি না, ধার চাইছি, দরকার হলে সুদ সমেত।"

গোপাল এবারে টগবগ করে ফুটে ওঠে। চেঁচিয়ে বলে, "হবে না,

হবে না মেশোমশাই, বলছি হবে না। আমায় কি ছেলেমানুষ পেয়েছেন ?”

যোগেনবাবুর মুখে এক বৈদ্যুতিক পরিবর্তন আসে। কিছুক্ষণ চোখ নামিয়ে বসে থাকেন। হঠাৎ তাঁর চকেচকে চাঁদিটা দুলে ওঠে। মুখ তুলতেই দেখা গেল তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। চেয়ার থেকে শরীরটাকে কোনমতে তুলে এক বিকট কাতর গলায় আছড়ে পড়লেন, “তুই গোপাল শেষ পর্যন্ত আমায় অপমান করলি, তোকে নেংটো অবস্থা থেকে দেখে আসছি, আর শেষকালে তুই কিনা—”

কান্নায় বুঁজে আসে যোগেনবাবুর গলা। গোপাল জানে যোগেনবাবু এর আগেও কেঁদেছেন। দাদার সঙ্গে কথায় যখনই কোন বেকায়দায় পড়েছেন তখনই হয় অট্টহাস্যে কথাটা উড়িয়ে দিয়েছেন অথবা কেঁদে ভাসিয়েছেন। আজকে আবার এই লোকটার চোখে জল আনার থিয়েটার দেখে তার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। একবার কাছে দাঁড়ানো মেয়েটির দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে চেয়ে বললে, “তুমি ভেতরে যাও,” তারপর প্রায় চীৎকার করে উঠলে, “থামান তো আপনার চোখের জল। একটা সোজা কথায় কেঁদে ভাসাচ্ছেন, ছিঃ মেশোমশাই ছিঃ! ঘা দেখিয়ে দয়া ভিক্ষে করে তো সারাজীবন কাটালেন, আর কেন ?”

যোগেনবাবু কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে ভাঙ্গাগলায় বললেন, “কোথায় আমার আত্মীয়স্বজন সাহায্য করবে এই দুর্দিনে ···নিজে রেফিউজি, তার ওপর স্ত্রীপুত্র অনূঢ়া কন্যা নিয়ে···

গোপাল দাঁতে দাঁত চেপে বললে, “আপনি রেফিউজি! আপনি আবার রেফিউজি হতে গেলেন কবে থেকে। সারাজীবন তো কলকাতার রাস্তায় ধাউড়ামি করে কাটালেন।”

যোগেনবাবু দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, “আর অপমান কেন বাপু, কই লতু, চল মা, এ বাড়িতে জায়গা হবে না আমাদের।”

মেয়েকে নিয়ে বেরুবার মুখে ঘুরে দাঁড়ালেন যোগেনবাবু। প্রায় অভিশাপ দিলেন, "অতো দেমাক ভাল না হে বুঝলে? এরকম দিন যাবে না, আমরাও দেখব।"

গোপাল চুপ করে খবরের কাগজ উল্‌টোতে থাকে। সেদিন ছুটির দিন। দুপুরে ঘুমোবার অভ্যেস নেই গোপালের। কিন্তু একটা ভোঁতা অস্বস্তিকর মনের অবস্থা তাড়াবার জন্যে জোর করে গোপাল ঘুমোবার চেষ্টা করলে। একটু তন্দ্রা আসতেই কিসের আওয়াজে জেগে ওঠে। জানলার বাইরে গলিটা নীল হয়ে গেছে আলোয়। পরমুহূর্তেই কড়কড় করে বাজ ডেকে ওঠে। ধুলোর ঝড়ের সঙ্গে দুতিন ফোঁটা করে বৃষ্টি নামে।

গোপাল ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে থাকে। কী করবে বুঝতে না পেরে দাদার ইতিহাসের বই ঘাঁটতে থাকে। দাদা কোনদিন পড়বার সময়ও পাবেন না, অথচ বই কিনে যাবেন। দাদা বোধ হয় নিজেকে কখনও সাংবাদিকদের পর্যায়ে ফেলতে পারেন নি।

ফোঁটা ফোঁটা মোটা দানায় বৃষ্টি নামে। বৃষ্টির ছাঁট আসছে। উঠে গিয়ে শার্সি বন্ধ করে দিতে গিয়ে হঠাৎ তার চোখে পড়ল একটা কাগজ হাওয়ায় কোন বাংলা ম্যাগাজিনের গা থেকে খুলে শার্সির কোনায় লেগে আছে। বছর তিনেক আগের এক শারদীয়া সংখ্যা। মোটা নীল পেন্‌সিলে দাগ দেওয়া অংশে সে চোখ বুলায়। সাম্প্রতিক কবিতার প্রসঙ্গে একেবারে হতাশ একজন সমালোচকের লেখা—"যে দেশে রবীন্দ্রনাথ জন্মেছেন সে দেশে 'উত্তোলিত গাছে গাছে তোমার দুবাহু' কিংবা 'পাহাড়ের কাঁধ' এই ধরণের আজগুবি প্রতীক ও উপমা গেঁথে যে কবিতা লেখা যায় না তা কি লেখককে নতুন করে বলে দিতে হবে? এই ধরণের সাঙ্কেতিক ভাষার চটকে কতদিন আধুনিক কবিরা বাঙালী পাঠককে আচ্ছন্ন করে রাখবেন? অবশ্য নিত্যগোপালের সম্বন্ধে আরও

একটা কথা ভাবা দরকার ; দাঁড়কাক ময়ূরপুচ্ছ পরলেই ময়ূর হয় না"
ইত্যাদি।

কাগজখানা হাতে নিয়ে ঘরের মধ্যেখানে গোপাল এসে দাঁড়ালে। তার মনে পড়ে কী প্রচণ্ড মনোযোগ দিয়ে সে এককালে কবিতা লিখেছে। সনেটের চোদ্দ লাইনের জন্য দিনের পর দিন ভেবেছে। আর নাটকীয় ভাবে কোন কথা বলতে পারলে কী ফূর্তি ! সন্ধের অন্ধকারে খোলা হাওয়ায় রাস্তার পর রাস্তা বেড়ানো আর মাথা ভর্তি অস্থিরতা নিয়ে বাড়ি ফেরা। অথচ এখন কবিতার কোন লাইনই মনে পড়ে না। নিজেরই কবিতা তার বিস্মরণ হতে চলেছে। কিন্তু তিন বছর আগে এমনভাবে যোগেনবাবুকে সে বিদায় দিতে পারত না। সে আজ দৃঢ় ভাবে ক্ষুদ্রতার মাথায় পা দিয়েছে।

বাইরে বৃষ্টি থেমে গেছে। ফুটপাথ ভিজেছে মাত্র। হাওয়ায় জলের গন্ধ। গোপাল ঠিক করলে কোথাও বেড়াতে যাবে।

চার

পরদিন অন্তু এল।

অনন্ত ছিল গোপালের বন্ধু কলেজের প্রথম যুগে। তারপর কলেজ পার হবার মুখোমুখি এসেই তারা দুজনে দুদিকে হারিয়ে গিয়েছিল। যে অন্তু ডিষ্ট্রীক্ট স্কলারশিপ আর এক মুখ হাসি নিয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের সিঁড়ি ভাঙ্গত, সে যখন কয়েক বছর পর ফিরে এল তখন তাকে চেনা যায় না। ইতিমধ্যে গোপালের মেজাজও অনেক বদলে গেছে। তার বাইরের জগত থেকে অন্তু সরে গেছে অনেক দূরে। তবু এক সঙ্গে বড় হয়ে ওঠার এমনি দাম যে ছেলেবেলার বন্ধুকে মনের অমিল সত্ত্বেও মানা যায়। অন্তুকে ঠিক মানা যায় না। তার পরিবর্তনটা এত বেশী রকম প্রকট যে গোপাল চেষ্টা করেও তার সামনে নিজের অসোয়াস্তি কাটিয়ে উঠতে পারে না।

অবশ্য অন্তুর এ পরিবর্তনের কারণ যে ছিল না তা নয়। বরং যে আর্থিক কারণে এদেশের বেশীর ভাগ যুবকেরই কলেজ আর তার পরবর্তী জীবনের যোগসূত্র হারিয়ে যায় তার চেয়েও বেশী কারণ ছিল অন্তুর ক্ষেত্রে। অন্তুর বাপ মায়ের ভেতর অমিল এত প্রচণ্ড হয়ে দাঁড়ায় যে কলেজের শেষ পরীক্ষা দেবার আগেই সে কলকাতা ছাড়লে। কেরানীর চাকরী নিয়ে সে পাটনায় চলে গেল। তার ছোট ভাই মান্তা লেখাপড়া বিশেষ করে নি। সে হঠাৎ পাড়ি দিল ফিল্মে নায়ক হবার জন্যে বোম্বাইয়ের পথে। তাদের মা নয়ন সংসার থেকে বেরিয়ে এসে উঠল ভাইয়ের বাড়িতে। তারপর অবশ্য অন্তু ফিরে এসেছে। কলকাতায় একটা সওদাগরী অফিসে স্টেনোগ্রাফারের চাকরী নিয়েছে। নতুন করে মা ভাইদের নিয়ে সংসার পাতবার চেষ্টা করেছে। মান্তার যাতে পড়াশোনায় মন লাগে সেদিকেও চেষ্টার ত্রুটি করে নি। কিন্তু কিছু হয় নি। শেষ পর্যন্ত তার মা নয়ন চলে গেল পণ্ডিচেরী, মান্তা তার নিজের রাস্তা বেছে নিল।

অন্তুর পরিবর্তন গোপালকে আরো বেশী পীড়া দেওয়ার কারণ অন্তুর মা নয়ন। নয়নের সঙ্গে গোপালের বছর খানেক দেখা নেই। কিন্তু তাদের চেতলার বাড়িতে থাকার সময় বেশ কয়েকবার তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। আর প্রত্যেকবার আশ্চর্য হয়েছে সে নয়নকে দেখে। সৃষ্টির বৈচিত্র্য প্রমাণ করবার জন্যেই যেন মান্তা আর অন্তুর মা হয়েছে নয়ন। গোপালের মনে হয়েছিল মায়ের যখন এমন তেজ তখন ছেলে এমন নিভে যাবে কেন কয়েক বছরের মধ্যেই। তা ছাড়া অন্তুর কথা বলার ঢং-এও অনেক পরিবর্তন এসেছে। সেদিন যেমন সকাল বেলায় অন্তু এসেই একটা তুড়ি দিয়ে বললে, "একটা সিগারেট ছাড়।" তারপর সিগারেট দেবার সঙ্গে সঙ্গেই হাত থেকে সেটা টেনে নিয়ে ধরাতে ধরাতে বললে, "এবারে স্যর আরও কিছু ছাড়ো।"

কিছু মানে অন্তত পনেরো টাকা, তার মেসের চার্জ অনেক বাকী পড়েছে। গোপাল বললে, "অতো টাকা এখন কোথায় পাব ?"

চোখ কুঁচকে ধাঁ করে অনন্ত বললে, "কত আছে ?"

গোপাল একবার তাকাল তার দিকে। অনন্ত তার থেকে বছর খানেক, বছর দুয়েকের ছোটই হবে। যে ছেলেটি জেলা-স্কলারশিপ পেয়ে তেল চকচকে চিকণ শরীর আর সারা মুখে হাসি নিয়ে প্রেসিডেনসী কলেজের তিনতলা সিঁড়ি ডিঙ্গোত লাফিয়ে লাফিয়ে তার সঙ্গে এই ভাঙ্গা চোয়াল, হলুদ চোখ, অসমান ময়লা দাঁত আর সেপটিপিনে আঁটা শার্টের ফাঁক দিয়ে ঠেলে উঠা গলা—এর যে কোন মিল আছে তা আবিস্কার করবার জন্যে সে প্রাণপণ চেষ্টা করে।

অনন্ত গলা বিকৃত করে বললে, "কিরে, কিছু ছাড়, একেবারে কিছুই নেই বলছিস।"

এবার গোপালকে কেউ যেন চড় মারে। যুদ্ধের পর থেকেই এই এক বিশেষ গলা বাঙালী সমাজে চালু হয়েছে। ভিক্ষুকের আর্তি নেই, দাবীদারের শক্তি নেই অথচ দুর্বিনীত এই ফোড়েদের গলা তার কলেজের বন্ধু অনন্তর কাছ থেকে শুনবে বলে সে আশা করে নি। বললে, "একটু বস, আমি তো দেব না বলি নি।" তারপর পাশের ঘরে গিয়ে পাঁচটা টাকার একটা নোট এনে অন্তুর হাতে গুঁজে দিয়ে বললে, "বাকীটা কাল তোর অফিসে টিফিনের সময় দিয়ে আসব। ওদিকেই যেতে হবে আমায় দুপুরে।" অন্তু প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, "বাঃ বাঃ, কোথায় রোজ ছাতু জোটে, আজ একেবারে চিকেনকারী। সত্যি তোর মত মহাপ্রাণ লোক যদি আর দুচারজন থাকতো⋯"

অত্যন্ত বেয়াড়া গলায় গোপাল চেঁচিয়ে উঠল, "চুপ কর, চুপ কর।"

রাস্তায় বেরিয়ে অন্তু বলতে থাকে। সে যেমন ভাবে মাঝে মাঝে

তার অবস্থাটা রং দিয়ে বলতে ভালবাসে তেমনি সুরে বলে "ওঃ আজকাল বস্-এর বউ আমায় যা ভালবাসছে। চাকর দিয়ে ডাকিয়ে ওপরের ঘরে পেস্তার সরবত, আপেলের কুচি..."

গোপাল বললে, "তোর বন্দনা না কে, তার খবর কি ?"

বন্দনা অন্তুর অফিসে টাইপিস্ট। অন্তু বললে, "বন্দনা কাল আমায় দুবার আলপিন ফুটিয়েছে। আমি ফুটাই নি বলে এমন মুখ ভার করে বসেছিল সারা বিকেল। বড়দা তো আমায় একলা পেলেই বলে, ছেড়ো না ভাই, কড়া—। অফিসশুদ্ধ লোক আমায় হিংসে করছে। একটু টেরা মত। তা হলেও একেবারে খারাপ না। বর্ধমানে নাকি জোতজমি আছে ওর বাবার, বিয়ে করলে বন্দনাকে নিয়ে—"

গোপাল একট অসহিষ্ণুভাবে বললে, "আর তোর অনু ?"

অনন্তর মুখখানা খুশীতে ভরে উঠল। দাঁত না বার করলে তার হাসিটা এখনও কিছু পরিমাণে পাঁচবছর আগেকার অন্তুর মত আছে। বললে, "তোর মনে আছে গোপাল, অনুর কথা ?"

কলেজে পড়ার প্রথম যুগে এক ছুটির দিনে দুবন্ধু অনন্তের এক গ্রামসম্পর্কীয় বাড়ি শ্যামনগরে গিয়েছিল। গঙ্গায় স্নান করার দাপাদাপি, ঘাট ভুল করে মেয়েদের ঘাটে গিয়ে পড়া, গলিতে হাঁটতে খাটা পায়খানার চাপা গন্ধ, একপাল ছেলেমেয়েদের মধ্যে সাদা ফ্রক-পরা বড়-বড় চোখ একটী কিশোরী মেয়ে আর ফেরার পথে অন্ধকার ট্রেনের কামরায় এক অন্ধ বাউলের গান শুনতে শুনতে ফেরা—এই কয়েকটা কাটা কাটা টুকরো স্মৃতি ছাড়া অনন্তর এই অনু সম্পর্কে গোপালের আর কোন অনুভূতি নেই। কিন্তু দেখা হলেই সামান্য স্মৃতির রংটুকু নিংড়িয়ে আলাপ জমাতে অন্তু ছাড়ত না। দেখা হলে বলত, "কিরে শ্যামনগর যাবি ?" এ ছাড়া তার যেন আর কোন কথা নেই। আজ

গোপাল রেগে বললে, "সাহেব তোদের অফিসের মাইনে দু-মাস হোল্ড-ওভার করে রাখতে পারে। সে জন্যে তুই ভাবছিস নে। তুই ভাবছিস সাহেবের গিন্নীকে যে তার ছেলের প্রাইভেট টিউটারকে বাদাম বাটার সরবত খাওয়ায়। আবার অম্বু, বন্দনা…"

শ্লেষের দরকার ছিল না, অনন্ত তার নবলব্ধ খিঁচিয়ে খিঁচিয়ে হাসা শুরু করে দিয়েছে। হাসি না থামিয়েই বললে, "অথচ তুই আবার প্রেমের কবিতা লিখিস। সেদিন বই-এর স্টলে দাঁড়িয়ে পড়ছিলাম। চুম্বনের জ্বালা ফালা কি সব লিখেছিস। এতে আবার জ্বালার কী আছে ? খেতে ইচ্ছে করে দমাদম চুমু খাবি।"

গোপাল ভেবেছিল ফুটপাথের শেষটুকু আর পার না হয়েই ফিরে আসবে। কিন্তু কখন রাস্তা পার হয়ে তারা পার্কটাতে ঢুকে পড়ল।

পার্কের এককোণে কালবৈশাখীর কয়েক ফোটা জলে সদ্য ফোটা কৃষ্ণচূড়ার রং খুলেছে। সেদিকে চোখ পড়তেই অনন্ত বলতে সুরু করে, "মীনাও আমায় ফুল দিয়েছিল……সেদিন কী বৃষ্টি ! কলার পাতার গা দিয়ে জল গড়াচ্ছে…"

এ নিয়ে প্রায় বার চারেক এই মেঠো প্রেম কাহিনী গোপাল শুনেছে। খানিকক্ষণ শোনার পর গোপালের মনে হয়, অন্তর কোন বক্তব্য নেই, তার বলতে ভাল লাগছে তাই বলছে। অন্যমনস্ক হয়ে সে ঘাসের ডগা দাঁত দিয়ে কাটে। কনুয়ের খোঁচা দিয়ে বললে, "তুই এ্যাদ্দিন মিছিমিছি কী করলি বলতো ? না করলি প্রেম, না করলি…"

রুক্ষ গলায় গোপাল বললে, "থাম, আমার কাছে থিয়েটার না করলেও চলবে। তোর অফিসের বন্ধুরা ভাবতে পারে তুই ডন জুয়ান, আমি তা ভাবি না। কল্পনা, আল্পনা, তুই যাই বল, আসলে তোর এক তিল আগ্রহ নেই কারু সম্বন্ধেই। ঠিক কি না ?"

অন্ত তার ওস্তাদি হাসিটা সুরু করেই গোপালের কঠিন মুখের দিকে

তাকিয়ে থমকে যায়। গোপাল তীক্ষ্ণ গলায় বললে, "আর তাতে কিছু এসে যায় না, প্রেম না করলেও অনেক কিছু করবার আছে। তুই আবার সুরু কর। পাঁচ বছর আগে একটা স্টার্ট নিয়েছিলি, তা বানচাল হয়ে গিয়েছে। আবার একটা নে। এ অফিস ছাড়। তুই ইংরেজী ভাল জানিস। স্টেনোগ্রাফিতে স্পিড্ আছে। একটু চেষ্টা করলেই তোর পক্ষে একটা সুবিধে মত চাকরী পাওয়া কঠিন না। আর এমনি করে গড়িয়ে যাস নে অন্তু।"

অনন্ত হ্যাঁ না কিছুই করলে না। গোপাল বললে, "চুপ করে আছিস কেন?"

বহুদিনের রুগীর মুমূর্ষু হাসি হাসলে অনন্ত। বললে, "কী সব প্যাঁচ দিয়ে কথা বলছিস গোপাল?" তারপর হঠাৎ সেই বিষণ্নতাটুকু উড়িয়ে দিলে। আবার গলায় সেই বেয়াড়া হাসি আর হলুদ চোখে এক অস্বাস্থ্যকর চপলতা এনে বললে, "গ্যাখ, জেলে শুনছি বেড়ে খাওয়াচ্ছে আজকাল। এমন একটা ফাইন্ ঘ্যাঁট দেয়, পাঞ্জাবী হোটেলে চার আনাতেও পাওয়া যায় না। আমি ভাবছি সাহেবকে বলুব, যে হাজার টাকা দেনা করেছি তা তো কোনদিনই শোধ করব না। সাহেব বরং কোর্টে নালিশ করুক। বেশ একটা ফাইন ঘ্যাঁট খাওয়া যাবে।" চুপ করে সিগারেট টানতে টানতে বললে, "আর বন্দনা যদি আলপিন ফোটান ছেড়ে আমায় বিয়েই করে ফেলে…"

"তুই আর একটা স্টার্ট নে অন্তু।"

অনন্ত হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠল, "যদি টাকা দেবার ইচ্ছে না থাকে সিধে বলে দে না, কেন একটা মরা মানুষকে ধরে খোঁচাচ্ছিস মিছিমিছি?"

গোপাল গম্ভীর হয়ে বললে, "বলেছি তো কাল টিফিনের সময় আসব তোর অফিসে।"

উঠে পড়েছিল তারা। হঠাৎ গোপাল বললে, "তোর মা কেমন আছে ?"

"মা বেড়ে আছে। আশ্রমের ঘি দুধ, বুঝলি না ?"

আবার সেই গলা। নিজের একান্ত প্রিয়জন সম্বন্ধেও সেই ফোড়ের গলা গোপালকে অস্থির করে তোলে। তাকে যেন গিলতে আসে সে গলা। পেছন দিকে না তাকিয়েই সে চেঁচিয়ে উঠল, "ঠিক আছে, আমি কাল আসছি।"

পরদিন যখন দশটা টাকা নিয়ে ক্লাইভ বিল্ডিং-এর তেতলায় এক অফিসে গোপাল হাজির হয় তখন তার মাথায় অন্তু ছিল না, ছিল তার মা নয়ন। কারণ অন্তুর সঙ্গে যতবারই তার দেখা হয়েছে ততবারই মনে হয়েছে শুধু বন্ধুত্ব দিয়ে, সাহচর্য দিয়ে অন্তুকে বদলানো যাবে না। আর তা ছাড়া বন্ধুত্ব তো শুধু একতরফা নয়। কতক্ষণ আর অন্তুর ছেলেমানুষী সহ্য করা যায়, তার আর্থিক ও মানসিক দৈন্যকে ঢাকবার জন্যে উচ্চকিত হাসি সহানুভূতির সঙ্গে দেখা যেতে পারে মাত্র, কিন্তু সহানুভূতি দিয়ে তো বন্ধু হওয়া যায় না।

অন্তুর ছোট ভাই মান্তার কর্কশ মেজাজ আবার আরো সুদূর, আরো অপ্রীতিকর। মান্তা কখনও একমুহূর্ত চুপ করে থাকতে পারে না। ফিল্মে ঢুকবার নেশায় বোম্বাই গিয়েছিল। বোম্বাই থেকে তাকে ফিরিয়ে এনে অন্তু তার সামান্য পুঁজি তার পেছনে ঢেলে রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং-এ তাকে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিল কিন্তু মান্তা তিন চার মাসের পরেই ছেড়ে দিয়েছে।

এদেরই মা নয়ন, তার মাসী, জীবনের যে কোন ফরমুলা নেই নয়ন যেন এই দু ছেলের মা হয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে।

গোপাল নিজেকে হঠাৎ থামিয়ে দেয় চিন্তা থেকে, তার হঠাৎ মনে হয়, হয়তো বা নয়ন সম্বন্ধে সে যা ধারণা করে নিয়েছে তা তার মন

গড়া। হয়তো নয়নের কথা বলার ঢংটা তার ভাল লাগত। কিংবা হয়তো তার চেহারায় যে শক্ত ধারাল ভাব ছিল তা তাকে টানত। গোপাল আবার অন্যমনস্ক হয়ে যায়। হঠাৎ নয়ন ভেসে ওঠে তার চোখের ওপর। সেই চৌকাঠ ধরে তার দাঁড়ানো, নাক, ঠোঁট, চিবুকের ধারাল রেখা আর চোখের অস্বাভাবিক দীপ্তি। নয়নের কাছ থেকে চলে আসবার আগে সে একটা বাচ্চা মেয়ের মত ঠোঁট উল্টাত, ভুরু কুঁচকাত, আগে যেন খেয়াল হয় নি। আর তা ছাড়া এতদিন যেন কোথায় সে লুকিয়ে ছিল। তাকে মনে পড়ত এক আশ্রমের সন্ন্যাসিনী হিসেবে। আজ অন্তুর অফিসের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে এক নতুন উষ্ণতা গোপালকে আচ্ছন্ন করে।

ছোট্ট অফিস, একখানা বড় ঘর, তারই এক কোণে কাঠের পার্টিশান দেওয়া বড় সাহেবের কামরা। অন্তু কাজে বেরিয়েছে, এখনই আসবে।

এক্সপোর্ট ইমপোর্টের অফিস, সম্প্রতি আমেরিকায় ম্যাঙ্গানিজ পাঠাবার এক অর্ডার পাওয়ার পর বড় সাহেব মাদ্রাজে এক ম্যাঙ্গানিজের খনি কিনে বসেছেন। তারপর থেকেই সর্বনাশ সুরু হয়েছে বিজনেসের। খনিতে ঠিক যে ধরণের ম্যাঙ্গানিজের চাহিদা তা পাওয়া যায় নি। অফিসের লোকজনদের দু-তিন মাসের মাইনে পড়ে রয়েছে, বড় সাহেবের মেজাজ এমন তিরিক্ষে যে তিনি দয়া করে কাউকে ছাঁটাই করছেন না এই রক্ষে।

গোপাল বসে বসে দেখতে থাকে। না বললেও সে চিনতে পারত অন্তুর বর্ণিত বড়দাকে। পরিস্কার ধোপদুরস্ত পোষাক পরা সুপুরুষ এক ভদ্রলোক টিফিন করছেন। চায়ের ডিশে ছানার ওপর চিনি ছড়ানো, ডিম, আর দুটো কলা। ছানা খাবার পর তিনি পরিপাটি করে আঙ্গুল চোষেন তারপর আরো পরিপাটি করে আঙ্গুলগুলো মুছতে থাকেন। তাঁর টিফিন খাওয়ায় এমন তন্ময়তা যে পাশের ছেলেটি

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মিচ্‌কি মিচ্‌কি হাসছে সেদিকে তাঁর কোন খেয়াল নেই। তারপরেই অন্তুর বন্দনা না আল্পনা। কি রকম যেন ম্যাওপুসী মার্কা চেহারা, যেন গায়ে হাত দিলেই বেড়ালের মত আনন্দে গা ফুলিয়ে আওয়াজ করবে। মাঝে মাঝে নীচু গলায় বড়দার সঙ্গে আলাপ করছে আর হেসে গড়িয়ে পড়ছে। হঠাৎ বড় সাহেব ঢুকলেন বলে মনে হোল, বোধ হয় গ্রেট ইষ্টার্ণ থেকে লাঞ্চ করে ফিরলেন। পেছনে এক মাঝবয়সী ভদ্র মহিলা পি, এ। তাকে দেখামাত্র কয়েকটা টেবিলে কানাকানি পড়ে গেল। গোপাল টের পায় ভদ্রমহিলার সঙ্গে বড় সাহেবের কোন সম্বন্ধ নিয়ে চাপা কথাবার্তা চলছে।

কাঁধে হাত পড়তেই গোপাল ফিরে দেখলে অন্তু। চুল উড়ছে, মুখ অবসাদে ভরা। কাঁধ থেকে হাত না নামিয়ে বললে, “চল, একটু বাইরে ঘুরে আসি, সাহেব এখনও আমায় দেখে নি।”

গতকালের চেয়ে একটু শান্ত মনে হয় অন্তুকে। ক্লাইভ বিল্ডিংয়ের পেছন দিকে এক চায়ের ক্যাবিনে তারা ঢোকে। ক্লান্তিতে আধবোঁজা চোখ বন্ধ করে আরামে সশব্দে চায়ে চুমুক মারলে অন্তু।

টাকাটা দেবার পর গোপাল কী কথা বলবে বুঝে উঠতে পারে না। আর যে প্রশ্নটার কোন মানে হয় না অথচ সময় বিশেষে যার আবার প্রকাণ্ড মানে, সেই প্রশ্নটাই করে বসলে, “তারপর কেমন আছিস?”

“আমাদের আবার থাকা!” গভীর ক্লান্তিতে অন্তু বললে।

“কেন, কী হোল?”

“কী না হোল!” অন্তু সমস্ত প্রশ্নেরই মীমাংসা করে দেয়। এরপর আর কোন কথা চলে না। গোপাল নিঃশব্দে চা খায়।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে চেয়ারে পিঠটান করে দিয়ে অন্তু বললে, “কী না হোল? বাবার সঙ্গে মার বনল না, বেশ ভাল কথা। বনল না, বনল না, আমি কারও দোষ দিচ্ছি না অবশ্য।”

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "তারপর ছেলেদের সঙ্গে দিনরাত খিটিমিটি। তারপর…"

গোপাল অসহিষ্ণু হয়ে বল্‌লে, "কিন্তু কেন? কেন তোর সঙ্গে তোর মার বনল না, বুঝতে পারি না।"

অন্তু হঠাৎ নিজেকে গুটিয়ে ফেললে, একবার আড়চোখে গোপালকে দেখেই মুখ দিয়ে একটা বিরক্তির শব্দ বার করলে "দূর!"

"দূর কিরে!"

"দূর! আমাদের কি আর সংসার করা পোষায়", অন্তু তার খেয়ালের রাজত্বে চলে গেল যেখানে আর কারুর প্রবেশ নিষেধ।

আবার তার মুখে একটা অস্বাস্থ্যকর দীপ্তি ফিরে আসে। এই দীপ্তি নিয়েই অন্তু আছে। অন্তু যেখানে যায় সেখানেই আবহাওয়া হাল্কা হয়ে যায়। অন্তু গল্প করে তার বন্দনার কথা, তার আল্পনার কথা, কবে কোন গাঁয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে একটি মেয়েকে তার ভাল লেগেছিল তার কথা। এই অন্তুকেই তার অফিসের লোকজন চেনে, আর 'হিউমার' করবার দরকার হলেই, অফিসের কোন আবহাওয়ার জটিলতাকে হাল্কামিতে উড়িয়ে দিতে গেলে অন্তুর ডাক পড়ে। কিন্তু তার এই অভিনয় গোপালের সামনে টেঁকে না। গোপালের দৃষ্টির সামনে সে অসোয়াস্তি বোধ করে। তবু চোখ নাচিয়ে বললে, "দেখলি বন্দনাকে, কি রকম চমৎকার না?"

"তোর মা তোকে চিঠি লেখে না?"

অন্তু এবার ভাঙ্গা গলায় বলে, "কেন আমায় খোঁচাচ্ছিস? চিঠি লেখে না চিঠি লেখে না—এই তো সেদিনই একটা রামপট লিখেছে, আশ্রম তার অসহ্য লাগছে, ফিরে আসতে চায়, একগুচ্ছের ধানাই-পানাই, এতো আছেই। কিন্তু এখানে এনে তাকে কোথায় রাখব? আমার মাথার ওপর?"

তারপর সিগারেট টানতে টানতে নিজের মনে বলে, "আমাকে রেহাই দাও বাবা, তোমাদের কারুর ভাল লাগে না। চলে যাও, দরজা খোলাই আছে। আমার আর ভাল লাগে না অতো ঝামেলা।"

"মাস্তার খবর কী?" গোপাল ধীরভাবে জিজ্ঞেস করলে।

"মাস্তা ভালই আছে, পড়াশোনা করল না, কিছুই করল না, মোটা হচ্ছে, আর যোগ করছে।"

গোপাল আকাশ থেকে পড়ল, "মাস্তা যোগ করছে?"

অন্তু ক্লান্তভাবে বললে, "আর, আমায় ঘাঁটাস নে গোপাল। নে অনেক হয়েছে, আর এক কাপ চা খাওয়া।"

দ্বিতীয় কাপে চুমুক দিয়ে অন্তু দার্শনিক হয়ে পড়ে। বলে, "সব বোগ্গাস বুঝলি, সব বোগাস।"

গোপাল সিগারেট ধরায়। তারপর ধীরে ধীরে বলে, "তোর মাকে আমি যদ্দূর জানতাম তাতে তো মনে হয় না সে খুব বদমেজাজী।"

"হলে তো বেঁচে যেতাম। কিন্তু মার যে মাঝে মাঝে ভুল হয়। মা ভাবে মা এখনও একটা ইস্কুলের মেয়ে।"

গোপাল অবাক হয়ে শোনে। অন্তু কোনদিন এভাবে তার মার সম্বন্ধে কথা বলে নি। কিছুক্ষণ চুপ করে সে কী ভাবে, তারপর তার চোখ আবার অকারণে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে, "আমার মতি-ই ভাল।"

"মতি কে?"

"ও মতিকে তুই চিনিস না। আমার ফ্রেণ্ড, চমৎকার ছেলে। তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। মতি বাবা মা কাউকে কেয়ার করে না। আর যার যেরকম সে তো সেই রকম থাকবে। মতির মা গামছা পরে চান করে। কই, আমার মা করুক দেখি!"

গোপাল আরো অবাক হয় অন্তুর এই ছেলেমানুষীতে, শেষ পর্যন্ত হয়তো সে বলবে, তার মা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে চায়, তাই তার সঙ্গে তার বনে না।

অন্তু চেঁচিয়ে বললে, "আর বক্তৃতা, দিনরাত মার বক্তৃতা!"

"বক্তৃতা, বক্তৃতা কিসের?"

"বক্তৃতা না? আমরা কাদার মানুষ, কাদায় গড়াচ্ছি, আমাদের কানের কাছে কেন বক্তৃতা করা এটা সেটা, আমি তো মাকে বলতামই আমাদের কাছে থাকতে গেলে কাদায় গড়াতে হবে।"

অন্তুর দ্বিতীয় কাপ ফুরিয়ে আসে। গোপাল আর তাকে চপল হবার সুযোগ দেয় না। সে বিরক্ত হবে, অসন্তুষ্ট হবে এসব ভেবেও জিজ্ঞেস করে, "কিন্তু শেষ পর্যন্ত পণ্ডিচেরী গেলেন কেন?"

অন্তু চটে গিয়ে বললে, "সে তুই নিজেই জিজ্ঞেস করিস দেখা হলে। আমি কী বলব? কে তার এক ছোট মামা না কে তাল তুললে। এখনও শুনি টাকা পাঠাচ্ছে।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললে, "যাক বাবা, ভালই হয়েছে। প্রথম প্রথম কষ্ট হোত, কিন্তু কষ্ট হয়ে কী হবে? একটা তো হিল্লে হয়ে গেল।"

গোপাল সে রাত্তির ভাল ঘুমোতে পারে না। হিল্লে হয়ে গেল! কী অদ্ভুত কথা! কোনরকম ভাবে কিছু চাপিয়ে দিলেই মানুষের ওপর কর্তব্য করা হয়ে গেল? তার নিজের কাছে নিজেকে হঠাৎ খুব ছোট মনে হয়। তার কিছু করার ছিল না নিশ্চয় কিন্তু একটা মানুষ যখন কোন উপায় না দেখে একটা পথ বেছে নিলে তখন সেই পথই যে শেষ পথ এই বারোয়ারী কথা ছাপিয়ে গোপাল নিজে আর কোন কথা ভাবতে পারলে না কেন?

কিন্তু আর একটা কথাই বা কী? নয়ন তো ছেলেদের সঙ্গে ঘর করতে চেয়েছিল, তাও তো পেরে ওঠে নি। অন্তুর অসম্পূর্ণ কথার ভেতর দিয়ে খুব অস্পষ্টভাবে হলেও টের পাওয়া যায় মা-ছেলের মেজাজের পার্থক্য। অন্তু এবং তার ভাইকে শুধু কাদায় গড়াতে দিতে চায় নি নয়ন, অন্তত এটা চোখের সামনে দেখার চেয়ে পালিয়ে গিয়ে বাঁচা ভাল বোধ হয়—এই ধরণের কোন ব্যাপার ছিল নয়নের হঠাৎ পণ্ডিচেরী অন্তর্ধান হবার পেছনে।

কিন্তু নয়ন তো একবার তার সঙ্গেও দেখা করতে পারত! সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, কেন? তার সঙ্গে কেন দেখা করবে নয়ন? সে কে, আর কি বা সে করতে পারে এই পারিবারিক গণ্ডগোলের সুরাহা হিসেবে? সে তো পাদ্রী নয়। কিন্তু পরক্ষণেই মনের আর এক দিক কথা বলে উঠল। তাহলে মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধের মানে কী? আর তা ছাড়া···এই প্রথম কথাটা চিন্তা করলে গোপাল—তার সঙ্গে কি নয়নের একটা সোজাসুজি বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি, তার ছেলেদের বাদ দিয়েও, অন্তত কিছুদিনের জন্যে?

কয়েকদিন ধরে তার মন এক নতুন অসোয়াস্তি আর উষ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। একটা লোক যাকে কাছের লোক বলে মনে হয়েছিল সে হঠাৎ দূরে চলে গেল, অনেক দূরে। আবার সঙ্গে সঙ্গে অন্তুর কথাও মনে পড়ে গেল। নয়ন পণ্ডিচেরী ছেড়ে আসতে চায়, টাকার দুঃখে নয়, অন্য কারণে। তাহলে হয়তো কোনদিন দেখা হতে পারে।

কিন্তু তার এই মনের উষ্ণতা স্থায়ী হয় না। আবার গরম, ঘাম, আর অফিসের অন্তহীন তা-না-না-না ঢেকে ফেলে এ উষ্ণতা। তবে সবটা ঢাকতে পারে না। কোথায় যেন নয়নের মুখখানা জেগে থাকে গোপালের মনে।

পাঁচ

কী রোদ্দুর, সারা শহরটা রোদ্দুর গিলে খাচ্ছে। এপ্রিল মাস মাঝামাঝি এগুতে না এগুতেই গ্রীষ্মকাল একেবারে বেড়াজাল দিয়ে এল। সকাল নটা বাজতে না বাজতে রাস্তায় বেরুলে ঘেমে একসা হতে হয়। ছটা সাড়ে ছটার পর হাওয়া ওঠে। তার আগে মানুষ-গুলো গরমে ঘামে সিদ্ধ হতে থাকে।

গোপাল একটা জিনিষ আবিষ্কার করলে। এই গরমে দুতিন ঘণ্টা রোদ্দুরে ঘুরলে ব্যস আর কোন ভাবনা নেই। কোন কিছু ভাববার ক্ষমতা শরীর হারিয়ে ফেলে। তখন অফিসে এসে খটাখট করে টাইপ রাইটারে বসে একটা কিছু লিখে দিয়ে বাসে-ট্রামে ভিড়ের চাপে ঘামে সর্বাঙ্গ চটচটে হয়ে বাড়ি ফিরে স্নান করে একটাই কাজ থাকে : সামান্য কিছু মুখে দিয়ে ঘুম দেওয়া।

গোপালের কাজ মানেই ঘোরাফেরা। চক্রবর্তী বলে যে চিমড়ে ভদ্রলোক তাদের অফিসে বেশ নাম করেছে সে একদিন গোপালকে ডেকে বললে, "খালি ঘুরবেন, খালি ঘুরবেন, বুঝলেন, ঘুরলেই স্টোরী।"

খবর, খবর, অর্থাৎ মানুষ খেয়ে দেয়ে সুস্থভাবে আনন্দের সঙ্গে বাঁচছে এতে তোমার কোন উৎসাহ থাকলে চলবে না, উৎসাহ থাকলে চলবে না সাধারণ অখ্যাত মানুষদের সম্বন্ধে, তাদের মনের গতির দিকে কোন ঔৎসুক্য থাকুক না থাকুক কিছু এসে যায় না। হেড লাইন ধরতে হবে, আর হেড লাইন ধরতে গেলেই যাতে চটক আছে তাই লিখতে হবে। যা বিসদৃশ তাই লক্ষ্য, এমন কি যাতে চটক নেই তাও চটকদার করে লিখতে হবে।

গোপাল ঘামে ভিজে নেয়ে ডালহৌসী স্কোয়ারে দরজায় দরজায় এই খবর নামধারী জন্তুটির পেছনে ধাওয়া করে বেড়ায়। কখনও তাকে ধরা যায়, কখনও নাগালের বাইরে পালিয়ে যায়, কখনও ধরার

পর দেখা যায়, অন্য জন্তু ফাঁদে পড়েছে। কিন্তু ফাঁদ পেতে রাখতেই হয়, সব সময় সজাগ সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে রাস্তাঘাটে, অফিসে-দপ্তরে, মাঠে-ময়দানে গোপাল ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে এই গরমে, রোদ্দুরে, ঘামে কখনও কখনও রঙ যে লাগে না তা নয়, সরকারী দপ্তরের কোন কর্মচারীর কথায় অথবা ময়দানে কোন বক্তৃতায় ক্ষণিকের জন্যে এ রঙ্ লাগে। মনে হয় এই সারাদিন খবরের জন্তুর পেছনে তাড়া করে বেড়ানোর একটা মানে আছে, একটা কোন আনন্দময় অস্তিত্ব যা অজস্র বিরক্তির মাঝখানে অহরহ চাপা পড়ে যাচ্ছে তা এই অফিস দপ্তর এ্যাসেমব্লীর ওপরেও আছে। কিন্তু তারপরেই ভয়ানক যান্ত্রিক লাগে। সুইং ডোরের ভিতর দিয়ে গলা বাড়িয়ে একটু হাল্কা মেজাজে বলা, "কি খবর স্যর? কেমন আছেন, কিছু আছে টাছে না সব ঠাণ্ডা"—এ কথাগুলোর যেন কোন মানে থাকে না। চালের দরের কেন সের প্রতি দু আনা বাড়ানোর দরকার হোল তা নিয়ে খাদ্যমন্ত্রী গবেষণামূলক এক দীর্ঘ সংখ্যাতত্ত্ব পেশ করলেন, খুব সাবধান করে সংখ্যাগুলো লিখতে হোল। তারপরেই কোন জনসভা থেকে আরও একটা সংখ্যাতত্ত্বের ফিরিস্তি এল, দু আনা বাড়ানো যে দরকার নেই তার পাঁচ দফা যুক্তি টাইপ করতে করতে গোপালের অবসাদ আসে। এর যেন শেষ নেই, সুরু নেই, সংখ্যাতত্ত্বের পর সংখ্যাতত্ত্ব, প্ল্যানের পর প্ল্যান। গোপাল আর ভাবে না, খটাখট করে টাইপ করতে থাকে।

চক্রবর্তীর চরিত্র যতখানি গোপালের চোখে পড়েছে, মনে হয় রায়ের একেবারে উল্টো। একদিন সন্ধের পর গাড়িতে ফিরতে ফিরতে চক্রবর্তী বললে, "আপনি যদি এ লাইনে এসে থাকেন অন্য কিছু ভেবে তাহলে কিন্তু ডিস্ইলিউসাণ্ড হবেন। এ লাইনে একটা জিনিষই আছে, নকল করা, আপনার নিজের কথা কিছু আছে কিনা আছে তা মোটেই আসে যায় না। আর দেখুন, নতুন কিছু তো ঘটবার নেই।"

গোপাল আশ্চর্য হয়ে বলে, "মানে?"

চক্রবর্তী বললে, "হ্যাঁ. এত অসংখ্য জিনিষ ঘটে গেছে আর তা নিয়ে এত অসংখ্য লেখা বেরিয়েছে যে তাই ঘাঁটলেই আপনি অনেক কিছু লিখতে পারবেন। মনে করুন দুর্ভিক্ষ, এ্যাক্সিডেণ্ট, পুলিশের সঙ্গে মারামারি, এ সবইতো হয়ে গেছে। বাকী কী আছে?"

কর্পোরেশনের যে ভদ্রলোকটি সহরের সাপ্তাহিক মৃত্যুর হারের তালিকা দেন, তিনিও তাই বললেন, "আরে এতে আর নতুন কি আছে? এই তো কলেরার সিজন এল, লোকে মরবে আর ইঞ্জেকশান নেবে। তারপর আবার বর্ষার জল পড়তে না পড়তে ব্যামোগুলো কমবে, তখন আবার হবে আমাশা।"

কয়েকদিন যেতে না যেতেই, রোদ্দুর যেন মাথায় এসে বিঁধতে থাকে। রাস্তায় পিচ গলছে, চপ্পল ছাড়া 'সু' পায়ে রাখা দায়। গোপাল ভাবলে মাথায় একটা কিছু দিলে কি হয়, বাঙালীরা আজ-কাল কিছুই মাথায় দেয় না, না শোলার টুপী না পাগড়ী, এমন কি ছাতা নেওয়াটাও তরুণ সমাজে অচল হয়ে উঠেছে। গোপাল ছাতা নিয়ে বেরুতে সুরু করলে। কিন্তু এত জায়গায় যেতে হয় যে ছাতা সামলানো দায় হয়ে ওঠে। একটা অফিসে কোনরকমে ছাতা না ফেলে ওঠা যায়, কিন্তু এরকম তিনটে জায়গায় গেলেই অতো খেয়াল রাখা মুস্কিল। গোপাল ছাতা কেনার সাতদিন পরেই ছাতা হারালে। বোশেখের রোদ্দুর দিনে দিনে চড়তে লাগল। আর ঘাম, ঘামের সমুদ্রে যেন খাবি খাচ্ছে লোকে। ঘেমে নেয়ে মুখ লাল করে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় গোপাল, কারণ বেরুলেই খবর।

মানুষের সন্ধানে বেরিয়ে গোপাল এক জন্তুর পেছনে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। পরদিন সকালে কাগজে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে জন্তুটি তার পরাক্রম প্রকাশ করবে।

চক্রবর্তী বোম্বাইয়ের দুটো কাগজের করেসপনডেণ্ট। একটি মুহূর্তও বসে নেই। সব সময় খুট খুট করে এটা সেটা টাইপ করছে আর পোষ্ট অফিসে টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছে। গোপাল রোদ্দুরে মুখ লাল করে অফিসে ফিরলে তার দিকে তাকিয়ে বললে, "বুঝলেন, জারনালিজম্ করলে আর কিছু করা যায় না। সি ইজ এ জেলাস্ মিসট্রেস।"

গোপালের একটা অশ্রাব্য কথা মুখে এসেছিল কিন্তু সে রিফিউজি-দের জন্যে সরকার কী একটা পরিকল্পনা করেছেন, তাই লিখতে বসে।

রায়, ম্যাকমোহন দুজনাই একসঙ্গে ঘরে ঢুকলে। দুজনাই উত্তেজিত। দমদম দিয়ে কোন এক দেশের মন্ত্রী উড়ে গেছেন, তাদের কথার উত্তরে "ভারতবর্ষ খুব ভাল দেশ, মিঃ নেহেরু খুব চমৎকার লোক" এই ধরণের কথাবার্তা ছাড়া আর কিছু না বলে। রায় খুব মনমরা হয়ে পড়েছে কারণ আর কোন কাগজের লোক সেখানে ছিল না। ম্যাক সান্ত্বনা দিয়ে বললে, "সে যদি কিছু না বলতে চায় তুমি কি করবে ?"

রায় ক্ষোভ প্রকাশ করলে, "হাউ ডিসগ্রেসফুল !"

চক্রবর্তী হঠাৎ একটু নড়ে চড়ে উঠল। গোপাল এ কদিনেই লক্ষ্য করেছে দুজনের ভেতর একটা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব আছে। চক্রবর্তী রায়কে মনে করে দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবপ্রবণ লোক আর রায় বলে চক্রবর্তীর সাংবাদিক না হয়ে ইস্কুলের পণ্ডিত হওয়া উচিত ছিল। চক্রবর্তী তার লেখাগুলো একদিকে ঠেলে দিয়ে সিগারেট খেতে খেতে যেন যুদ্ধের জন্যে তৈরী হয়ে নিলে। হঠাৎ আড়চোখে রায়ের দিকে তাকিয়ে বললে, "আপনার স্ত্রী কেমন আছেন মিঃ রায় ?"

রায় হঠাৎ চুপসে গেল, তার উত্তেজনা কোথায় নিভে গেল। চাপা খেদের সঙ্গে বললে, "আর বলবেন না মশাই, মেয়েমানুষদের ব্যাপার।"

"কোন মিসহ্যাপ হয়েছে নাকি মিঃ রায়?" ম্যাক বললে।

চক্রবর্তীই উত্তর দিলে, "মিসহ্যাপ না ব্লেসিং, রায় আবার তৃতীয় সন্তানের জনক হতে চলেছেন।"

"ও, কংগ্রাচুলেশনস্", ম্যাকের গলায় কোন ঠাট্টার রেশ ছিল না।

রায় কিন্তু ক্ষেপে গেল, চক্রবর্তীর দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললে, "বেশ করেছি, আমি কারুর খাই না পরি।"

চক্রবর্তী ততক্ষণে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আবার টাইপ রাইটারে বসে গেছে।

হঠাৎ বিমর্ষভাবে ম্যাকের দিকে ঝুঁকে পড়ে রায় বলতে থাকে, "জানো, বিয়ে করেই আমার সর্বনাশ হয়ে গেল।"

গোপালের গলার কাছটায় কেমন করে ওঠে। বিয়ে করা প্রসঙ্গে রায়ের এ ধরণের মন্তব্য আরো কয়েকজন অন্য কাগজের লোকের মুখে শুনেছে। কিছুদিন গেলে বোধ হয় সে ব্যাপারটা ভাল বুঝতে পারত। প্রত্যেক জীবনের মত গার্হস্থ্য জীবনের পেছনেও সময়, যত্ন দেওয়া দরকার যা এদের অনেকেই দিতে পারে না। এই ঘামের সমুদ্রে সাঁতরিয়ে তারা আছড়িয়ে গিয়ে বিছানায় পড়ে। গোপাল এসব ঠিক বুঝতে পারে না।

চক্রবর্তী বললে, "আপনি তো মডার্ণ লোক মশাই। আবার শুনি প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন। আমি 'হার্ড বয়ল্ড' লোক ওসব প্রেম ফ্রেম বুঝি না। সোজা বায়োলজিকাল"...

আবার একটা অসোয়াস্তির দমক গোপালকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আবছাভাবে হলেও তার মনে হয় এও তার এক কলেজ বন্ধুদের আড্ডা, সেই এক ধরণের সংক্রামক নাবালকামি। এ লোকগুলো যখন খবরের প্রসঙ্গ আলোচনা করে, কোন কাগজ কোনদিন কি মিস্ করল, ইংরেজী অব্যয়টা কেন ঠিক হয় নি, কিংবা কম্যুনিস্টরা ভাল না সোশ্যালিস্টরা

ভাল, পণ্ডিত নেহেরু ভাল থিয়েটার করেন না সত্যিই একজন বড় দেশনেতা, রাশিয়ান আর্মি জোরাল না আমেরিকান আমি জোরাল, যখন এই ধরণের কথাবার্তা চলতে থাকে তখন কেউ কেউ বেশ বুদ্ধিমান, কেউ স্থির ধীর, কেউ অসহিষ্ণু,—অর্থাৎ কিনা একটা কোন কিছুর ওপর নিজেকে দাঁড় করাতে পারে। কিন্তু যখনই এর বাইরে কথা ওঠে তখনই আশ্চর্য ভোজবাজির মত গোপালের চোখে এরা হঠাৎ বামন হয়ে পড়ে। যেন জীবনের প্রায় সবটাই অভ্যেসের পর্যায়ে দাঁড়িয়ে গেছে। খানিকক্ষণ এদের আলাপ শোনার পরই মনে হয় কোন জিনিষের প্রতিই এদের আকর্ষণ নেই, টান নেই। প্রেম, বন্ধুত্ব, দেশ, ধর্ম, মানুষের এই সব প্রাথমিক অনুভূতির প্রতি কারুরই বিশেষ কোন হুঁস নেই। যেটা আছে সেটা ওপরচালাকী। অবশ্য পুরনো যুগের সাংবাদিকদের কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে গোপালের। তাঁরা ঠিক এ জাতের নন। সত্যিই একটা আদর্শ তা যেরকমেরই হোক না কেন—তাই সম্বল করে এ লাইনে এসেছিলেন কোন কিছুর পরোয়া না করে, কিন্তু তাঁরা আশ্চর্যভাবে ম্রিয়মাণ, ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর এমন কি অনেকে তিক্ত বিরক্ত, যেন তাঁদের কাজ ছিল খালি ইংরেজ তাড়াবার, এখন ইংরেজ চলে যাবার পর তাঁদের আর কিছু করবার নেই।

গোপালকে চুপচাপ দেখে ম্যাকমোহন বললে, “মিঃ চৌধুরী, তুমি যে বড্ড শান্ত দেখছি, একেবারে মুখই খোল না।”

গোপাল হেসে বললে, “কেন, এ লাইনে কি শান্ত লোক একেবারে অচল ?”

“না অচল না, তবে লোকে নানা কথা ভাবতে পারে। ভাবতে পারে আনসোশ্যাল কিংবা”—

গোপাল কথাটা পূরণ করে, “স্নব তো ?”

"অথবা বোকা", চক্রবর্তী জুড়ে দেয়।

"তা যদি ভাবে, ভাবুক", গোপাল সংক্ষেপে জবাব দেয়।

পাশ থেকে ফস্ করে রায় বললে, অর্থাৎ লেট দ্য ডগস্ বার্ক—না? চেহারায় আলাদা হলেও দেখছি দাদার থেকে আপনি একটুও আলাদা নন।"

গোপাল আবার অস্বস্তি বোধ করে। সে যে একটা আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে পড়েছে, মনে করে খারাপ লাগে, তাড়াতাড়ি বলে, "না না, সেরকম ভাবতে যাব কেন, আচ্ছা, আমার কপিটা একটু দেখুন না দয়া করে।"

ম্যাকমোহন ঠিক রায় এবং চক্রবর্তীর দলে পড়ে না, কারণ তার 'গড' আছে। কী ভাবে যেন প্রচুর মদ খেয়ে ফুর্তি করে প্রচুর দাপটে কাজ করার সঙ্গে তার 'গড'কে মিলিয়ে সে একটা প্রশান্ত জীবনবোধ তৈরী করে নিয়েছে। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হবার পর তার ধারণা হয়েছিল তাদের এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় পুরুষদের কুচি কুচি করে কাটা হবে এবং তাদের নারী সমাজ নিগৃহীত হবে ভারতবাসীদের হাতে। বিলেত পালাবার সব কিছু ব্যবস্থাও করে ফেলেছিল। তারপর বছর খানেক যেতে না যেতেই ত.র দূরদর্শী চোখ এদেশের মাটিতেই ভবিষ্যৎ খুঁজে পেয়েছে।

ম্যাক খুব প্রশান্ত মুখ করে বললে, "ঘ্যাখো চক্রবর্তী, তোমার লিভারের গণ্ডগোল হওয়ার পর থেকেই তুমি বড্ড সিনীক হয়ে পড়েছো। প্রেম আছে তার কারণ গড আছে। গড থাকলে প্রেম থাকতেই হবে।"

গোপাল তার দিকে ফিরে বললে, "আর গড না থাকলে?"

ম্যাক আশ্চর্য হয়ে যায় এত সোজা কথাটা কেন গোপালের মাথায় ঢুকছে না। ভেবে বলে, "গড না থাকলে প্রেম থাকবে না, এতো সোজা কথা।"

চক্রবর্তী চেঁচিয়ে উঠল, "ছাখো ম্যাক, প্রেম বলতে যদি রায়ের মত তুমি ভাবো একটু চাঁদের আলো, একটু গাছ, একটু হাওয়া তাহলে আমি বলব বাঙ্ক, ওসব বাজে।" তারপর সে একটা যুক্তি দেখালে যা মানে করলে দাঁড়ায় সব স্ত্রীলোকই এক কোন কারণে, অতএব গডের কথা তোলা কেন মিছিমিছি।

গোপাল উঠে গিয়ে কাগজের ফাইল ঘাঁটতে থাকে। সেই এক ছবি। একদিকে চক্রবর্তী আর একদিকে রায়। impotence আর garrulity, হয় ফুরিয়ে যাওয়া নয় প্যানপ্যান করা, মধ্যে ম্যাকমোহন তার গড আর চাবিমার্কা বিয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে। অবশ্য এছাড়াও ম্যাকমোহনের আত্মবিশ্বাসের কারণ আছে, সে যদি কোন কপি একবার প্রশংসা করে তাহলে চীফ মিঃ সেন ঘাড় নেড়ে দুবার প্রশংসা করবেনই, কারণ অফিস মনে করে ম্যাকমোহন ছাড়া এ ঘরে আর কেউ ইংরেজী লিখতে পারে না।

ইংরেজী লেখা! তার চেয়ে বরং বলা ভাল ভগবান লাভ করা, কিংবা কোন অলৌকিক সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা। গোপাল অবশ্য কলেজ জীবনে কিছুটা টের পেয়েছিল কিন্তু তা যে এমন হাস্যকর তীব্রতায় দেখা দেবে ধারণা করতে পারে নি। তার ভাবতে আশ্চর্য লাগে টলস্টয় জার্মান ভাল লিখতে পারতেন না বলে যখন অপমানিত বোধ করেন নি, বালজাক যখন তাঁর মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করার কথা স্বপ্নেও ভাবেন নি তখন এদেশের শিক্ষিত সমাজের আব্রহ্মস্তম্ভ এই একটি মরীচিকার পেছনে ধাওয়া করে তাদের সময় অর্থ সামর্থ্য ধ্বংস করে কেন? ইংরেজী লিখতে পারা এবং জ্ঞানী হওয়া, এই দুটো কথা কোন্ রাসায়নিক ক্রিয়ায় একেবারে এক হয়ে ভারতবাসীর কাছে এসে হাজির হয়েছে, সে মাঝে মাঝে নিজেকে জিজ্ঞেস করে। আর বারে বারেই এই রসায়ন অর্থাৎ দুশো

বছরের ঔপনিবেশিকতার গ্লানি তার রক্তে আগুন ধরিয়ে দেয়।

রায় যখন ভয়ানক মর্মাহত হয়ে পড়ে এবং প্রাণপণে প্রমাণ করতে চায় যে সে ইংরেজী জানে তখন গোপালের শারীরিক অসোয়াস্তি হয়। সে প্রথমেই ম্যাকমোহনকে তার কপি দেখিয়ে বললে, "তুমি যেরকম ইচ্ছে কলম চালাও সাহেব, আমার কোন আপত্তি নেই, এটা তোমার ভাষা সাহেব, আমার কিছু বলবার নেই।"

রায় ঠাট্টা করলে, "আপনি যে দেখছি বিনয়ের অবতার।"

গোপাল জোর দিয়ে বললে, "বিনয় না, যা সত্যি তাই বলছি।" তারপর বিরক্ত হয়ে বললে, "দেখুন মিঃ রায়, পৃথিবীতে মন খারাপ করার অনেক ব্যাপার আছে। এটাকে আর তার মধ্যে ফেলতে চাই না।"

শুধু ইংরেজী লেখা হলেও কথা ছিল না, সাহেব অফিসারদের রাজত্বের জন্যে একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস সরকারী দপ্তরে, মার্কেণ্টাইল ফার্মের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়। খুব প্রকাশ্যে নয় অনেক সময় অবশ্য বেশ প্রকাশ্যেই, তবে একটু কান খাড়া করলেই বোঝা যায়। মনে হয় ভারতবাসী প্রভু হিসেবে নৈবেদ্যর থালা ইংরেজকে না দিতে চাইলেও কাকে দেবে ঠিক ধারণা করে উঠতে পারে নি। এদেশকে যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের রাস্তাতেই চলতে হবে, সেটাই যে মুক্তির পথ তা ভারতীয় অফিসারদের সঙ্গে কথা বললে মনে হয়। অবশ্য এরই মাঝে মাঝে হঠাৎ এ ধরণের কথা কানে আসে, 'বাট নেহেরু ইজ এ ফাইন ম্যান,' কিন্তু তা এত অস্পষ্ট আর অসংলগ্ন যে হাওয়ায় উড়ে যায় সে কথা।

মাস খানেক যেতে না যেতে গোপালকে দেখা যায় পুলিশের দপ্তরে ঢুকতে। মুখ ঘেমে গেছে, চুল উড়ছে। একটা ছাই রঙের প্যাণ্ট আর বাদামী সিল্কের শার্ট পরনে, মুখে এমন একটা হাসি যার কোন মানে হয়

না, অথচ যেটা না হলে সহজভাবে মেলামেশা করা যায় না। গোপাল এ হাসিটা ম্যাকমোহনের কাছ থেকে আয়ত্ত করেছে।

কার্ড দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। কলকাতা যানবাহন চলাচলের দপ্তরের কর্তা হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন।

চেহারাটা খুব ভড়কে দেওয়ার মত নয়, অন্তত পুলিশ অফিসার বলতে ঘাড়-ছাঁটা, হাফপ্যাণ্টের ওপর তিন ইঞ্চি পুরু চামড়ার বেল্ট পরা কোন বিকট গলার আওয়াজের লোক নন মিঃ রবার্টসন; গোপালের একটু আড়ষ্ট মুখখানার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি তোমার দাদাকে খুব চিনতাম, চমৎকার লোক, তুমি যখন তখন আসবে। খবর না থাকলেও আসবে। আমরা বুরোক্র্যাট বড়সাহেব নই বুঝলে চৌধুরী।"

ফাইলের পর ফাইল আসে। মিনিট পনেরো গোপাল জানলার ফাঁক দিয়ে ট্র্যাফিক পুলিশদের কুচকাওয়াজ ছাখে। অনেকগুলো পুলিশের ট্রাক রোদ্দুরে পুড়ছে। এক সময় ফাইলমুক্ত হয়ে রবার্টসন নিঃশ্বাস ফেললেন। পাশের সেল্‌ফ থেকে একটা ম্যাগাজিন টেনে এনে বললেন, "চৌধুরী, তোমরা স্টোরী, স্টোরী করে ঘুরে বেড়াও। কিন্তু পাবে কোথায়? একটা কিছু ইম্প্রুভমেণ্টের কথা ভাবলে ওপর থেকে চেপে দেবে।" তারপর গলা নামিয়ে গোপালের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, "এটা কি লণ্ডন পেয়েছো মিঃ চৌধুরী, এটা কলকাতা।"

ম্যাগাজিনের পাতায় লণ্ডন শহরের যানবাহন পরিচালনা ব্যবস্থার ছবি। তিন সারি গাড়ি ছবির মত পর পর চলেছে। টিউব স্টেশনে কতকগুলো মেয়ে ভিড় করে আছে। সত্যিই কিছু বলবার নেই। চমৎকার ব্যবস্থা, সাহেব এবার ম্যাগাজিন বন্ধ করে পাইপ ধরালেন। চেয়ারে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ দোল খান তারপর একটু সামান্য ভারি চালে বললেন, "বুঝলে চৌধুরী।"

চৌধুরী বিলক্ষণই বুঝেছে। তবে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে নি। যে দেশের গাঁয়ে লোকে আট মাস শামুক ও গুগলি খেয়ে থাকে সেখানে টিউব স্টেশনের স্বপ্ন দেখাটা বেশ চায়ের টেবিলের আলাপ বলেই মনে হয় তার কাছে। তার বোধ হয় মুখটা একটু গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিল, বোধ হয় সে যে চিন্তা করে এরকম কোন ছাপ তার মুখের ওপর এসে গিয়েছিল। কারণ রবার্টসনের চোখ ছুটো সহসা কৌতূহলী হয়ে ওঠেছে। গোপাল তাড়াতাড়ি হাসবার চেষ্টা করে। সেই ম্যাকমোহনের কাছ থেকে শেখা হাসি, যার কোন মানে হয় না।

গোপালের মনে হোল সাহেব তাকে যেন পরীক্ষা করছেন সে ঠিক রিলায়েবল টাইপ কিনা, যার কাছে ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে তৃতীয় পক্ষের হয়ে কথা বলতে পারেন। সে চৌধুরীর ভাই বলেই সাহেব এত বেশী কথা বলছেন, কিন্তু টিউব স্টেশনের ছবিটা দেখার পরও তার মুখ থেকে যে কোন আশ্চর্য হবার ধ্বনি বেরোয় নি সেটা যে সাহেবের লক্ষ্যে এড়িয়ে যায় নি সে বুঝতে পারে। গোপালের মনে মুহূর্তের জন্যে একটা আলোড়ন উঠে মিলিয়ে যায়। এমনি ভাবে চলতে ফিরতে লোকের সঙ্গে কথা বলতে এমন ধরণের কথার ওপর নিয়ত হোঁচট খেতে হবে। সে ক্ষেত্রে তার কী কর্তব্য? ছুভাবে হোঁচট খাওয়া থেকে বাঁচা যায়। একটা হোল পাথর কি মুড়ি এড়িয়ে চলা, অন্য পথে এগুনো কিংবা খুব শক্ত দৃঢপদক্ষেপে চলা যাতে মুড়ি পাথর পায়ে লেগে ছিটকে বেরিয়ে যায়। তার মেজাজ দ্বিতীয় কায়দায় চলার জন্যে তৈরী, কিন্তু এ ব্যাপার বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে সে বজায় রাখতে পারে কিন্তু যেখানে চাকরীর জন্যে লোকজনের সঙ্গে মিশতে হয় সেখানে তো হেঁ হেঁ না করলে চলবে না। গোপাল এবার সাবধানে রবার্টসনের দিকে তাকায়। লোকজনের সঙ্গে মিশেমিশে মুখে যে একটা তাঁর সামাজিক ছোপ পড়েছে ধীরে ধীরে তার ওপর একটা বড়

সাহেবী রং ধরে, তাঁর নাকটা লাল হতে আরম্ভ করেছে, চোখ দুটো আরো ঠাণ্ডা প্রশান্ত বলে মনে হচ্ছে। কখন হয়ত বাঁ হাতের আঙ্গুল গুলো তুলে বলবেন, "আচ্ছা পরে দেখা হবে" গোপাল প্রমাদ গোনে। তার মানুষ দেখা মাথায় থাকুক। এখন একটা স্টোরী না জোগাড় করে গেলে মিঃ সেন বলবেন যে তাঁর কোম্পানী তো একটা দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়। গোপাল যেন তন্দ্রা থেকে নিজেকে ঝাঁকি দিয়ে বলে ওঠে, "দাদা তো লণ্ডনের টিউব বলতে একেবারে পাগল। ট্রামে বাসে ভিড় দেখলেই টিউবের কথা বলতেন।"

গোপাল চেয়ে থাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। তার নিজের কানেই তার কথাটা বড্ড বেয়াড়া লাগছিল। কিন্তু সেদিক থেকে জোর করে নিজেকে সরিয়ে সে রবার্টসনের দিকে তাকায়। ধীরে ধীরে তাঁর আড়ষ্ট শক্ত চোয়ালটার হাড় যেন মাংসের আবরণে বুঁজে আসছে, চোখ দুটোয় যে মরা মাছের ঠাণ্ডা ভাব এসেছিল তার বদলে স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ফিরে আসে। লোকটা যেন আবার নিজের রাজত্বে বাস করছে। আর গোপালের উদাসীনতা যে সাময়িক সন্দেহের কারণ ঘটিয়েছিল তা কেটে যাওয়ায় এখন যেন সেও সাহেবের রাজত্বে প্রতিষ্ঠিত। রবার্টসন খুশীতে শরীরটা আলগা করে বললেন, "সে আর ভাই বলে কি হবে। চৌধুরী বলত নাকি, হি ইজ এ ফাইন ম্যান।"

তারপর গোপালের দিকে একটু স্নেহের চোখে তাকিয়ে বললেন, "বোধ হয় ওটা ছাপাওনি না?…ঐযে…বড়বাবু…"

ব্যাপারটা বিশেষ কিছু না। কলকাতা রাজপথে দুর্ঘটনা বাঁচাবার জন্যে ব্যবস্থা, মোটরের বেগ কমাবার জন্যে রাস্তার মোড়ে কতকগুলো ট্র্যাফিক দ্বীপ বসানো হবে। দ্বীপের ওপর ক্যানার ঝাড় উঠবে।

নীল ছিটের শার্ট পরা বড়বাবু ঘামে ভিজে ফাইল হাতে করে গোপালের কাছে আসেন। রাস্তাগুলোর নাম ফাইল থেকে বার করেন। বেড়ালের মত গোলগোল চোখ দিয়ে এই অপরিচিত তরুণটির দিকে তাকিয়ে নীচু গলায় হঠাৎ বলেন, "নতুন নতুন ঠেক্‌ছে যে।"

গোপাল হেসে বললে, "হ্যাঁ ব্র্যাণ্ড নিউ, সবে পালিশ হয়েছে!"

"তাই বলুন, তা আমাদের এখানে আসবেন টাসবেন। আর নিজের ওপরওয়ালা বলে বলছিনা মশাই। এমন ভদ্র সাহেব…"

গোপাল ভাবলে এখানেও কি ঢং না করলে বড়সাহেব রাস্তার নামগুলো দেওয়া বন্ধ করে দেবে! সে ক্রমশ বিরক্ত হয়ে ওঠে। ঘামে শার্ট পিঠের সঙ্গে একেবারে সেঁটে গিয়েছে। বেশ অস্বস্তি লাগে তার।

ভদ্রলোক ফাইল থেকে মাথা তুলে বলেন, "আপনারা আর কী দেখলেন মশাই। এখন আর সাহেবের কী দর! উঃ কী দিনই না গিয়েছে।"

গোপাল বললে, "আর কোন রাস্তা?"

বড়বাবু বললেন, "উঃ আপনিও যে দেখছি পাওনাদার, বসুন না, এত গরমে আবার কোথায় বেরুবেন। মেসে থাকতাম, সেণ্ট্রাল এভিনিউ দিয়ে ফিরছি। উল্টো ফুট দিয়ে একটা গোরা আসছে, ভাবলাম ফুটপাথ দিয়ে রাস্তায় নামব কি না। ভাবতে না ভাবতেই গোরাটা এগিয়ে এল। সপাং করে বেত পড়ল মুখের ওপর।…কত দেখলাম স্যার। আর দুটো বচ্ছর…ব্যস্।"

গোপাল কৌতূহলী হয়ে বললে, "দুটো বচ্ছর পর কী করবেন?"

"দুটো বচ্ছর পরেই পেনশন নেবো। একটা খালি মেয়ে বাকী

আছে। সেটাকে বিয়ে দিয়ে বুড়ো মাকে নিয়ে একেবারে সটান কাশী, ব্যস।" ভদ্রলোক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ফাইল বন্ধ করলেন। গোপালের মনে হোল এই নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর জীবনের আটাশ বছরকেও উড়িয়ে দিলেন হাওয়ায়।

গোপাল ঘাড় ফিরিয়ে লিখছিল। পেছন থেকে কে একজন কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "ওসব কিচ্ছু হবে না ব্যস্, কিচ্ছু হবে না। এদেশে এসব হয় নি, হবে না।" গোপাল পেছন ফিরে আগন্তুককে লক্ষ্য করলে। চোখা বেঁটেখাটো তড়বড়ে এই ভদ্রলোকটিকে সে আগেই কয়েকবার দেখেছে ক্লাবের মিটিং-এ, হোটেলে, ককটেল পার্টিতে। ভদ্রলোক জন্তু জানোয়ারের দরদীদের নিয়ে একটি সভা তৈরী করেছেন। তবে জন্তু বাদ দিয়েও নানা সভাতে তাঁকে দেখা যায়। বলা যেতে পারে তিনি 'কলকাতা সমাজের' অন্তর্ভুক্ত।

ভদ্রলোক চেয়ারের হাতলের ওপর চড়ে বক্তৃতা দিলেন, "সিভিক সেন্স, মিঃ রবার্টসন, সিভিক সেন্স, বিলেতে বাচ্চা ছেলেরা ট্রামের টিকিটটা পর্যন্ত কুড়িয়ে রাস্তার কোণে ডাস্টবিনে ফেলে আর আমাদের দেশের লোক ইচ্ছে করে রাস্তার মধ্যেখানে পেচ্ছাপ করে রাখে।" গরমে উত্তেজনায় ভদ্রলোকের ফর্সা হাড়গিলে মুখখানা লাল হয়ে ওঠে।

গোপালের সঙ্গে রবার্টসন আলাপ করিয়ে দেবার পর ভদ্রলোক প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন গোপালের ওপর। যেন এতক্ষণ পর তিনি প্রতিপক্ষকে খুঁজে পেয়েছেন। টেবিলের হাতল থেকে লাফিয়ে নেমে বলতে থাকেন, "এই যে আপনারা সব খবরের কাগজের লোক দিন রাত্তির সব যা তা···সব হুজুগ নিয়ে মেতে আছেন ··অথচ যা দরকার, যাকে বলে একটা পাবলিক ওপিনিয়নের ব্যাপার···যেটার দরকার, ভয়ানক দরকার···" ভদ্রলোক কথার খেই হারিয়ে ফেলেন।
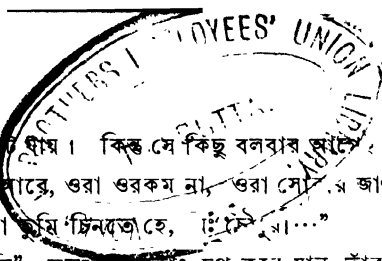
গোপাল চ[illegible] যায়। কিন্তু সে কিছু বলবার আগে[illegible] রবার্টসন জোর দিয়ে বললে, "[illegible]রে, ওরা ওরকম না, ওরা সো[illegible] জার্নালিজম করে। ওর দাদাকে তো তুমি চিনতে হে, [illegible]..."

"ও, আই সি", ভদ্রলোক হঠাৎ চুপ করে যান, তাঁর উত্তেজনা কমে আসে। একটা বৈদ্যুতিক পরিবর্তনের মত তাঁরও মুখ আবার স্বাভাবিক হয়ে আসে। গলার স্বর একেবারে নীচু সারগমে এনে বললেন, "তাহলে অবশ্য আলাদা।" তারপর গোপালের দিকে আন্তরিকতার ঢংয়ে ঝুঁকে পড়ে বাংলায় বললেন, "আরে মশাই, আপনিও তো জানেন, এই যে ভদ্রলোক এত করে ক্যানার ঝাড়ফাড় লাগাবে, একটা মারামারি হোক পুলিশের সঙ্গে, অমনি দেখবেন, সব কে উপড়ে ফেলেছে।"

ভদ্রলোক এক জায়গায় বসতে পারেন না, অনবরত নড়াচড়া করেন। একবার কাত হয়ে সুইং ডোরের দিকে তাকিয়ে চোখ কুঁচকিয়ে বললেন, "একবার তাকান, একবার তাকান এ দিকে।"

গোপাল দেখলে কতকগুলো তরুণ একটা কিউ দিয়েছে সামনের বারান্দায়, বোধ হয় পুলিশ সার্জেণ্ট হবার জন্যে ফর্ম নেবার অপেক্ষায়। একজন সাব ইন্‌সপেক্টর তাদের বুকের ছাতি মাপছে।

গোপাল অবাক হয়ে বললে, "কেন, কি হয়েছে?"

"এই দেখুন, এরাই হচ্ছে যাকে বলে দেশের যুবক সমাজ, এরা যখন রাস্তায় বেরয় তখন পুলিশকে একটা সাধারণ ভদ্রতা পর্যন্ত দেখায় না, আর এরাই এসেছে সার্জেণ্ট হতে।"

গোপাল হেসে বললে "এতে আর আশ্চর্য হচ্ছেন কেন? এক-দিকে পুলিশে লোকে ভর্তি হচ্ছে আর একদিকে পুলিশকে ঢিলোচ্ছে, এতে তো একটা কথাই প্রমাণ হয়।

ভদ্রলোক অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে বললে, "সেটা কী কথা?"

"সেটা হোল দেশে বেকারী বাড়ছে, লোকেরা খুব খুশী না।"

রবার্টসন গম্ভীর হয়ে যান। অথচ গোপাল এমন হাল্কা তরল-ভাবে কথাগুলো বলে যে সে যে খুব ভেবে কোন কথা বলছে, এরকম ধারণাও করা যায় না। একটু আড়ষ্ট হয়ে বলেন, "না না, চৌধুরী, তুমি ব্যাপারটা ওরকম হাল্কা করে দিওনা, আমার কি মনে হয় জানো, একটা 'মরাল ডিকে' আরম্ভ হয়েছে। সেই আগেকার দিনের মত অবস্থা নেই।"

গোপাল আড়চোখে একবার দেখে দুজনকে। যদিও তার মুখ-খানা ম্যাকমোহনের কাছ থেকে শেখা হাসির আভায় উদ্দীপ্ত ছিল কিন্তু তবুও সে আবার টের পায় যেন সাবধানী হয়ে উঠেছে রবার্টসনের চোখ। মুহূর্তে সেও সাবধান হয়ে পড়ে। কী দরকার ভদ্রলোকের বিরাগভাজন হয়ে। সামনের দিন এসে হয়ত কোন স্টোরী পাবে কোন ফুটপাথে গোলাপ বাগান খুঁড়ছেন। সেও সাহেবের মরাল ডিকের কথা যেন অন্তরে অন্তরে সমর্থন করে এই ভাবখানা দেখাবার জন্যে বিষণ্ণ হয়ে মাথা নাড়ায়।

পাশের ভদ্রলোকটি এবার তার দিকে তাকিয়ে আশ্বস্ত হয়ে বলেন, "এরকম অবস্থা কি আগে ছিল মিঃ চৌধুরী। গত শনিবারে আমাদের সাহেবদের রাগবি ম্যাচ। কি একটা ইউনিয়নের সঙ্গে গোলমাল চলছিল। সেদিন ম্যাচের দিন আমাদের সেক্রেটারী ছুটতে ছুটতে এসে বললে, "সর্বনাশ, কারা রাগবির গোলপোস্ট উড়িয়ে দিয়েছে।"

ভদ্রলোকের করুণ মুখ চোখ দেখে গোপালের হাসি পেয়ে যায়। গলার কাছে হাসি সুড়সুড় করতে থাকে। কোথায় ডালহৌসী স্কোয়ার আর কোথায় ময়দানে তাদের রাগবির গোলপোস্ট, এর মাঝে ঠিক একটা শুভলগ্ন দেখে যারা একটা মিলন ঘটিয়েছে তাদের কাণ্ড দেখে গোপালের বেদম হাসি পেয়ে যায়। কিন্তু সামনে ছলছলে চোখ

রবার্টসন। এরকম মুহূর্তে হেসে ফেললে সে ভদ্রলোকের চিরদিনের শত্রু হয়ে থাকবে।

ভদ্রলোক হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে গোপালের দিকে তাকিয়ে বলেন, "বলুন কোন সভ্য দেশে এরকম হয়েছে? রাগবির গোলপোস্ট…"

গোপাল হ্যাঁ কি না বলল কিছুই বোঝা যায় না, সে মাথা নীচু করে একটু দুলে ওঠে। দুলে উঠেই ভাবলে এটা একটা নতুন আর্ট সে আয়ত্ত করেছে। যখনই বেকায়দায় পড়ে যাবে তখনই সে এবার থেকে এভাবে দুলবে।

রবার্টসন হঠাৎ ভারি ধরা গলায় বললেন, "আমাদের মানুষের ওপরে বিশ্বেস হারালে চলবে না।…'গড' সব দেশে আছে সবখানে।"

গোপাল আশ্চর্য হয়ে তাঁর দিকে তাকায়, ম্যাকমোহনের মত রবার্টসনও শেষ পর্যন্ত 'গড' এনে ফেললেন।

সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। অফিসে ফিরে গরমে ঘেমে প্যাচ প্যাচ করতে করতে একমনে সে টাইপ করছিল। আগামীকাল তার ছুটি সেই জন্যে দেরী হলেও ক্ষতি নেই। কেউ যে পাশ থেকে তার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে খেয়াল ছিল না। হঠাৎ একটা অস্পষ্ট আওয়াজে সে পাশ ফিরল, "হ্যাল্লো আপনি এখানে?"

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে যে মূর্তিটি তার মুখটার ওপর আলো না পড়ায় গোপাল একটু হকচকিয়ে যায়। "আমাকে চিনতে পারলেন না? বাব্বাঃ আপনি যে দেখছি বড়সাহেব হয়ে গেছেন।" আগন্তুকের গলাটা এবার বেশ চেনা চেনা ঠেকল। দু'এক পা এগিয়ে আসতেই গোপাল চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল, "আরে দিলীপবাবু, আসুন আসুন।"

দিলীপ এগিয়ে এসে বললে, "অফ অল্ পারসন্‌স আপনি যে এখানে থাকবেন তা ভাবতেই পারি নি।"

"হ্যাঁ আমি জাতে উঠেছি।"

দিলীপ হেসে বললে, "না না, আমি তা বলছি না। আপনার মধ্যে একটা নিজস্বতা একটা যাকে বলে…"

গোপাল বলে উঠল, 'আর বলবেন না, জানেনই তো, খবরের কাগজে কাজ করি। ওগুলো নিয়ে এত বেশী নাড়াচাড়া করতে হয় যে ওগুলোর মানে হারিয়ে গেছে।"

দিলীপ ঠিক আগের মতই আছে। ভদ্র, মুখমিষ্টি, কাউকে সে চটাতে ভালবাসে না। আলাপ কোন গুরুতর মোড় নিলেই সেখান থেকে কাট মারে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ঘরটার চারদিকে তাকিয়ে বললে, "ভালই হোল আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়ে। আমি অবশ্য এসেছিলাম অন্য একটা কাজে। আমার স্ত্রীও, মানে খুশী, আপনার কথা বলছিল। আসবেন না একদিন।"

দিলীপ তার কার্ড বের করে টেবিলের ওপর রাখলে, তার নামের পাশে কয়েকটা ডিগ্রী, তারপরে একটা হাসপাতালের নাম। সেখানে সে চোখের ডাক্তার, নীচে তার বাড়ির ঠিকানা ভবানীপুরের এক রাস্তায়।

দিলীপ আবার বললে, "আমরা একটা ক্লাবের মত করেছি, অবশ্য সন্ধেবেলা আমাকে অনেক সময় চেম্বারেই কাটাতে হয়। তাহলেও আসবেন না একদিন। আমার স্ত্রীও বলছিল…"

"ঠিক আছে, একদিন সময় পেলেই যাব," গোপাল বেশ আগ্রহ দেখিয়েই বললে।

ছয়

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি যেতে না যেতেই সূর্যদেবকে বন্দনা করার কোন কারণ রইল না। একটা হিংস্র অত্যাচারী শাসকের মত

সমস্ত কলকাতা জালিয়ে পুড়িয়ে ঘামিয়ে অস্থির করে তুললে। ১০৫ ডিগ্রি উত্তাপ হয়ত উত্তর ভারতের তুলনায় বেশী নয়, কিন্তু ঘাম। ঘাড় দিয়ে, পিঠ দিয়ে, পেট দিয়ে ঘাম বইছে, চোখের পাতায় ভুরুতে ঘাম জমছে। এত ঘামের সমুদ্রে সাঁতরিয়ে আর কোন শক্তি অবশিষ্ট থাকে না, সন্ধের পর হুড়হুড় করে স্নান করে খোলা হাওয়ায় বেলফুলের গন্ধ শোঁকা ছাড়া। কিন্তু গোপালের তা হবার উপায় নেই। আটটার আগে সে অফিস থেকে বেরুতেই পারে না। আর রাত্তির নটায় বাড়ি ফেরা আর একেবারে সাড়ে দশটা এগারোটায় বাড়ি ফিরে ঘুমিয়ে পড়া, এ দুটোর মাঝখানে বিশেষ কিছু তফাৎ থাকে না।

অফিসে সাড়ে দশটায় এসে রাত্তিব সাড়ে আটটা করার একমাত্র কারণ মিঃ সেন। কারণ সাড়ে ছটা সাতটায় কাজ ফুরিয়ে গেলেও মিঃ সেনের ঘণ্টা ছয়েক ধরে আলপিনের দরকার হয়, কোন কোন ফোন নম্বর গোপাল ছাড়া রাত্তিরের লোক করলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। মিঃ সেন সাড়ে ছটার পরই টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে কাজ করতে শুরু করেন। ম্যাকমোহন অবশ্য কাজ হলেই চলে যায়, তবে মিঃ রায়, অনিল এমন কি চক্রবর্তীও আঙ্গুল মটকায়, 'ডাকের' কাগজ ঘাঁটে, বিজ্ঞাপন কলামে চোখ বুলায়। অবশ্য চক্রবর্তীর খুব অসুবিধে হয় না, সে 'হেস্টিংস-এর সহিস' এ ধরণের কোন রম্য রচনা লিখতে বসে।

মিঃ সেনকে দেখে গোপাল প্রথমে আশ্চর্য হয়েছিল। সাহেবদের সঙ্গে দহরম মহরম করাই যদি সাহেবী হবার নমুনা হয়ে থাকে তাহলে দাদার চেয়ে অনেক বেশী সাহেব মিঃ সেন। অথচ তার দাদার যে সব বাঙালীপনা ছিল না তা মিঃ সেনের পুরোমাত্রায় আছে। তিনি একদিকে সাহেব আবার আর একদিকে গুরুজন, যার সামনে সব কথা

আলোচনা করা যায় না, সিগারেটটা মুখের ওপর না খেলেই ভাল হয়।

গোপাল যখন সন্ধে সাতটার পরই আঁকপাঁক করতে থাকে তখন মাঝে মাঝে সে তাকায় সেনের দিকে। সেনের নির্বিকার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় সাহেবরাও এ অফিস যত না ভালবাসে, তার চেয়ে তাঁর ভালবাসার পরিমাণ অনেক বেশী। এ অফিসের একটি ইঁট খসলে যেন তাঁর বুকের একটি পাঁজরা খসে যাবে। কী কষ্টেই না 'সঙ্কটজনক আবহাওয়ায়' তাদের অফিস চলেছে, এ কথাটা যখন তিনি খুব গম্ভীর-ভাবে ইস্কুল মাস্টারের মত বলতে থাকেন তখন গোপালের ইচ্ছে হয় টাইপরাইটার তুলে তাঁর মাথায় আছাড় মারে।

এক একবার সে এই ধরণের আত্মনিপীড়নে একটু তৃপ্তিও পায়। সন্ধেটা বন্ধ থাকায় প্রথমত বাড়িতে ফেরার ভাবনা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, সম্প্রতি লোকজনের সঙ্গে অফিসের বাইরের কোন প্রসঙ্গ আলাপ করলেই সে বিরক্ত হয়ে পড়ে। সেই বিরক্তির হাত থেকে সে বেঁচে যাচ্ছে। সন্ধের হাওয়ায় ঠাণ্ডা হয়ে সে বেলফুল শুঁকতে না পারুক, অন্তত বাড়িতে ফিরে খেয়েদেয়ে স্নান করেই সটান ঘুমিয়ে পড়তে পারে। অবশ্য এরকম বেশীদিন চলে না। নিজেকে সকলের কাছ থেকে আলাদা করেও সে যেমন শান্তি পায় না তেমনি এ ভাবে নিজেকে ছত্রাকার করে দিয়েও তার শান্তি নেই। সে আবার তর্ক করে, ঝগড়া করে, ভাবতে চেষ্টা করে। এক একদিন মাঝ রাত্তিরে গরমে ঘুম ভেঙ্গে গেলে জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখের কাছে জল আসে। এটা বোধ হয় বয়সের দোষ। তবে যে সমস্ত দিন উচ্ছ্বাসকে চলতে ফিরতে চাবুক মারে তারই চোখের কাছে জল আসে এক এক দিন রাত্তিরে। গুজারাম পাশের ঘরে আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে ঘুমোয়। অনেকদিন আগেকার তোলা ঝাপসা হয়ে যাওয়া তার মার ফটোখানা আয়না টেবিলের

পাশ থেকে অন্ধকারে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, টাইমপিস ঘড়ির শব্দ হয়, হাসিও তার বাচ্চা নিয়ে আর একটা ফটো থেকে তার দিকে তাকিয়ে আছে। গোপাল একবার বাবার কথা ভাবতে চেষ্টা করে, কিন্তু ঠিক মনে পড়ে না। তার ছেলেবেলার কথা তাকে খুব একটা নাড়া দিতে পারে না, সে বরঞ্চ ভাবে তার বর্তমানের কথা, আগামীর কথা, তার খালি মনে হয়, সে যেন শুরুই করে নি তার জীবন, যেন অজস্র অপরিচিত রঙে রঙীন হয়ে তা সামনে দুলছে। আবার এক একদিন অবসাদ আসে। তখন ভাবে তাদের অফিসের রায় হতে তার আপত্তি কি, কিংবা চক্রবর্তী হতে আপত্তি কি? চক্রবর্তী তাকে একদিন বলেছিল, "দেখুন অরিজিন্যাল হবার চেষ্টা করবেন না। আমি কাগজপত্তরের ফাইল ঘেঁটে ঘেঁটে একটা জিনিষই আবিষ্কার করেছি, নকল করা, নকল করতে শিখুন।" গোপালের কী দরকার মানুষের ঐতিহ্যের বোঝা টেনে? এটা কী তার জমিদারী? সেও নকল করে আর একজন চক্রবর্তী হবে··· রায় যে কি বলছিল আসলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই, বইতেই আশ্চর্য হবার কথা থাকে? গোপাল চমকিয়ে ওঠে। গুজারামকে বোবায় ধরেছে। সম্প্রতি প্রায়ই ধরে, বুড়ুক, বুড়ুক, বুড়ুক···কী রকম অদ্ভুত আওয়াজ বেরোচ্ছে তার গলা দিয়ে। গোপাল গিয়ে গুজারামকে ঝাঁকি দেয়। নেশার চোখ মেলে গোপালের দিকে তাকিয়ে সে বলে, "কেয়া সাব, কেয়া হুয়া?" গুজারাম কিছুদিন থেকে গোপালকে ছোটবাবু না বলে 'সাব' বলতে শুরু করেছে।

বিকেলের দিকে এক একদিন ঝড় আসে। দু এক ফোঁটা বৃষ্টিতে মাটি ভিজতে না ভিজতেই আবার শুকিয়ে যায়। তবে গ্রীষ্মের তীব্রতার সবচেয়ে শেষ ধাপ বোধ হয় পার হয়ে আসা গেছে। যদিও রোদ্দুরের তেজ মোটেই কমে নি, তবে হাওয়ায় আগুনের হল্কাভাব কিছু কম।

ডালহৌসী স্কোয়ারে নিয়মিত টহল দিতে দিতে গোপালের এমন একটা অবস্থা হয়েছে যে ছুটির দিন তার মনে হয় সে যেন কলকাতায় নেই। আরও কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করেও সে এ ধরণের উত্তর পেয়েছে। আধবর্গ মাইল বাংলাদেশের এ জায়গাটুকুর প্রত্যেক ইঞ্চি যে কত দরকারী, আগে ছাত্রজীবনে কখনও সে টের পায় নি। কত আকাঙ্খার গোরস্থান, কত আশার রঙ্গভূমি এই ডালহৌসী স্কোয়ার—অথচ সে আশ্চর্য হয়ে যায় এ জায়গা যে কী সাংঘাতিক প্রয়োজনীয় তা আগে কেন তার মনে হয় নি। এক একটা বিরাট নিস্তব্ধ ঠাণ্ডা পাথরের দেয়ালে—কোনটায় চকচকে পেতলের ওপর জনসন নিকলসন, কোনটায় বা ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জী বা চার্টার্ড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লেখার পেছনে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশের হৃৎপিণ্ড যে কাঁপছে, সেখানে কোথাও খিঁচ ধরলে যে তাদের সংসার ছত্রাকার হয়ে পড়ে, কোথাও কোন ওপরওয়ালার চোখের স্নিগ্ধ কিরণে সারা যৌবন রঙে রসে ঝলমল করে ওঠে—এত বড় একটা বিরাট সত্য কী করে তার চোখের আড়ালে ছিল ভেবে লজ্জা পায়। আরো স্পষ্ট করে তার মনে হয়, যারা এই ডালহৌসী স্কোয়ার জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত তারাই বাংলাদেশের সামাজিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। আর যারা এখানে মুখ পায় না তারা অন্য কোথাও মুখ পায় না। বিপন্ন, অসহায়, গোবেচারী সেই ভাল মানুষ ভদ্রলোক-দের কথা মনে করে সে তার হাতের মুঠি খোলে আর বন্ধ করে। না, কিছুতেই সে সেই অসহায় ভাল মানুষদের দলে যাবে না, তার চেয়ে যদি—তার চেয়ে যদি কিছুটা ধূর্ত হওয়া যায়—আর ধূর্তই বা কেন, সে যদি চোখকান খোলা সজাগ মানুষদের সারিতে এসে দাঁড়ায় তাহলে আপত্তি করার কী আছে?

আফিসে ঢুকতে না ঢুকতেই ম্যাকমোহন বললে, "চল, একটা ককটেল পার্টি আছে।"

শার্টের বোতাম খুলে দিয়ে জিরুতে জিরুতে গোপাল বলে, "না সাহেব, ওসব আমার পোষায় না, তুমি যাও।"

গোপালকে কথা শেষ করতে না দিয়ে ম্যাক বললে, "ভাখো গোপাল, আমি নজর করেছি, তিনমাসের ওপরে তো তোমার চাকরী হয়ে গেল। এখন তুমি কনফার্মড, আমরা যা প্রিভিলেজ পাচ্ছি, তুমিও সব পাচ্ছ। অথচ তুমি এখনও ঠিক 'নিউজম্যান' হতে পাবো নি।"

ম্যাকমোহন গোপালের কোন ক্লান্তি, বিরক্তি কেয়ার করে না। কোন ইডিওলজির তরফ থেকে নয় নিউজের হাতিয়ার নিয়ে সে গোপালকে আক্রমণ করে। তাকে কোন ভাল লাগা, না ভাল লাগার কারণ ইত্যাদির প্রসঙ্গেই যেতে দেয় না। দারুণ অন্তরঙ্গতার স্বরে বলে, "গোপাল, ইউ আর এ ব্লাডি স্নব।"

আর গোপাল একটু ভয় পেয়ে যায়। তার নিজেকে একাকার করে দেবার ইচ্ছেটা এত লাঞ্ছিত হয়ে পড়ে যে সে প্রায় চীৎকার করে ওঠে, "চল ম্যাক চল, আমি ভাবছিলাম, যা গরম পড়েছে।"

গোপাল ভাবছিল ম্যাক বলবে, খবরের লোকদের আবার গরম ঠাণ্ডা কী? ভাল খবর পেলে এই দুর্দান্ত গরমেও হিমালয় নেমে আসবে ইত্যাদি। কিন্তু ম্যাক দয়া করলে। রায় একটু অসন্তুষ্ট হোল, সে ভেবেছিল আজকে ককটেল পার্টিতে নিজেকে একটু হাল্কা করতে পারবে, তার দিকে তাকিয়ে গোপাল একবার মৃদুভাবে বললে, "মিঃ রায় গেলেই তো"...কিন্তু ম্যাক চেঁচিয়ে বললে, "মিঃ রায় তো রোজই যাচ্ছে, তুমি তাই বলে পালাতে পাচ্ছো না। অতো সাবজেক্টিভ চিন্তা কোর না, বুঝলে, একটু সোস্যাল হও"...ইত্যাদি।

ক্যালকাটা ক্লাবে সেদিন খনি মালিকদের ককটেল পার্টি ছিল। সন্ধেবেলার চাপা ভ্যাপসা গরমে একঘরভর্তি সাহেব মেমসাহেব মারোয়াড়ী আর স্বল্প কয়েকজন বাঙালী ভদ্রলোক হাঁসফাঁস করছে।

কাঁধকাটা গাউন, হাতে গেলাস নিয়ে মেমসাহেব, সেরোয়ানীতে ভুঁড়ি চেপে তারই পাশে জনৈক মারোয়াড়ী তরুণ, এক জায়গায় ভিড় করে আছে একদল বিগত যৌবনা বাঙালী মহিলা, যাদেরকে কলকাতার যে কোন সন্ধেয় পার্টিতে দেখা যায়। তাদের ভিড় ঠেলে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে আসতেই গোপাল চিনতে পারে। তরুণ মুখার্জী, সংবাদ সরবরাহ লাইনে একজন নামজাদা ফোড়ে। ঢ্যাঙা চেহারা, ফ্যাকাশে মুখ, হাত ভর্তি লোম, শার্টের কলার ঠেলে গলার ডিম পর্যন্ত লোম গজিয়েছে। লোকটাকে দেখেই কুকুরের কথা মনে পড়ে, ঠিক গ্রে হাউণ্ড। অফিসে দু-তিনবার এসেছে গ্রে হাউণ্ডের মত লাফাতে লাফাতে, তারপর বড় সাহেবদের সঙ্গে দেখা করেই টুক করে বেরিয়ে গিয়েছে। মুখার্জী সাহেবের উঠতির মূলে কিন্তু সত্যগোপাল। হঠাৎ গোপালের একটু মজা লাগে ভদ্রলোকের হাবভাবে।

ম্যাকমোহনের কাছে সে এগিয়ে আসতেই ম্যাকমোহন গোপালের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে, "মাই ইয়ং ফ্রেণ্ড"। আর গোপাল যা ধারণা করেছিল ঠিক তাই হোল। একটা ছোট্ট "ও, কেমন আছেন ?" বলার পরই তাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করেই সে ম্যাকমোহনের দিকে ফিরে আলাপ করতে থাকে।

এবার গোপালের চেহারা পাল্টে যায়। তার নাকের পাতা কাঁপতে থাকে, মুখ লাল হয়ে ওঠে। হাত মুঠো করে এগিয়ে এসে সে কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, "মিঃ মুখার্জী"।

মুখার্জী শুনেও শুনতে পায় না। দ্বিতীয়বার আরও তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠতে গোপালের চার পাশের গুঞ্জন থেমে যায়। পাশের মেমসাহেবটি গেলাস থেকে মুখ তুলে তার দিকে কৌতূহলী হয়ে তাকায়। গোপাল দ্বিতীয় বার বললে, "মিঃ মুখার্জী, আপনি বোধ হয় আমায় চিনতে পারলেন না।"

মুখার্জী অবাক হয়ে বলে, "মাপ করবেন, কোথায় ঠিক..."

"বাঃ আপনি যে আমাদের বাড়ি প্রায়ই আসতেন, মনে নেই, আপনি দাদাকে বড্ড জ্বালাতন করতেন শুনতাম"...

গোপাল খুব হাল্কা ভাবে বলে কথাটা, যেন কাউকে কোন আঘাত করা তার স্বপ্নেরও বাইরে। কিন্তু মুখার্জীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। "ও হ্যাঁ, তাই...মনে পড়েছে যেন", আরও কয়েকটা ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করে সে ভিড়ের মধ্যে মিশে যায়।

গেলাস হাতে ভেতরের বারান্দায় হাওয়াতে এসে গোপাল চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। পাশের ঘরে নাচের বাজনা বাজছে। ক্যাটকেটে লাল শাড়ী আর সাদা সাটিনের ব্লাউস, ওদিকে কালো ফ্রক কোট পরনে টাক পড়া মোটাসোটা মাঝবয়সী নাচিয়ে—ছেড়ে ছেড়ে ঘুরে ঘুরে আবার জোড়ায় জোড়ায় এক হচ্ছিল। কিন্তু স্পষ্টতই বোঝা যায় কোন উন্মাদনা নেই। গরমে ঘামে স্নোপাউডারের দুর্গ গলতে স্বরু করেছে, তার ভেতর থেকে একটু একটু মিঠে হাসবার চেষ্টা বড্ড করুণ লাগে। ম্যাক কখন দৌড়ে গিয়ে টুক করে নেচে এল। রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে এসে বললে, "ইউ আর ফানি, মুখার্জীর সঙ্গে ওরকম করলে কেন?"

দুতিন পেগ খাওয়ার পরই গোপালকে বেশ রংদার মনে হচ্ছিল। ছলছল করছে তার চোখ, মুখ কেমন থমথমে ভারী। উদাসীন ভাবে সে পাশে বসা এক ঝাঁক মাঝবয়সী মেমসাহেবদের লম্বা চওড়া খোলা ঘাড়ের ওপর চোখ বুলাচ্ছিল।

ম্যাক তাকে টেনে এনে একটা সোফায় বসিয়ে দিলে। তারপর অন্তরঙ্গ ভাবে বললে, "ঐ যে লাল শাড়ী পরা মিস্ দাস, বেড়ে মেয়ে, বললেই নাচবে।"

"আমি নাচতে জানি না।"

"আরে তেমন নাচতে কি আমিও ছাই জানি, একটু গা গরম করে এসো না।"

রাত্তির দশটা বেজে গেছে, কিন্তু কারুরই বিশেষ হুঁস নেই। দু-তিনটে বিদেশী এমব্যাসির লোকও ঘোরাফেরা করছে। ঘরের এককোণে পাটের অফিসের কতকগুলো বড় সাহেব হাঁটু গেড়ে কার্পেটের ওপর বসে পর পর কতকগুলো ফ্ল্যাশ লাইটে ফটো তোলাচ্ছে। তারপর হাতে চাপড় দিয়ে কয়েকজন বাঙালী মহিলা ও মেমসাহেব একটি ইংরেজী গান গাইতে সুরু করলে। ব্যাণ্ড মাষ্টারও হঠাৎ 'ইণ্ডিয়ান সেরিনাড' নাম দিয়ে বম্বে টকিজের 'মেরা বুল বুল সো রাহা হ্যায়' তাদের গীটারে জুড়ে ঘরের হাওয়া ব্যাকুল করে তোলে।

আরো দুতিন গেলাস খালি হবার পর দুজনেই ভয়ানক অন্তরঙ্গ বোধ করতে থাকে। ম্যাক বললে, "ভ্যাখো তুমি মুখার্জীকে বেশ করেছো, ও একটা ছ্যাঁচড়া। বড় সাহেবদের সঙ্গে কেবল খাতির। কিন্তু যারা সাধারণ মানুষ—যেমন আমরা তাদের একদম তোয়াক্কা করে না।"

গোপালের যদিও দূরে ট্রের ওপর গেলাসগুলো একটু আবছা লাগে তাহলেও মোটের ওপর বেশ মজাই লাগে তার। ম্যাকমোহন রায়ের মত নয়, এজন্যে সে মনে মনে তার একটু তারিফও করে তবে তার ভয় হয় আহ্লাদে আটখানা হয়ে ম্যাক যদি গান জুড়ে দেয়। কেউ কেউ দিয়েওছে ঘরের এককোণে।

হঠাৎ ম্যাকের দিকে ঝুঁকে পড়ে তীক্ষ্ণ গলায় সে বলে উঠল, "আচ্ছা ম্যাক, সত্যিই কি এ লাইনে আমার কোন ভবিষ্যৎ আছে?"

'ভবিষ্যৎ' বলতে ঠিক কি বোঝায় এ লাইনে সে সম্বন্ধে তার কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। তবু ড্রেসিং গাউন পরে কায়রো কি ব্যাংককের কোন ব্যালকনি থেকে সে তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে, ফরেন করেসপণ্ডেন্টদের রূপকথা জাতীয় যে একটা ভূমিকা সাংবাদিকদের

মধ্যে আলোচনা হয় সেই রকম কিছু তার মনের মধ্যে খেলে যায় মুহূর্তের জন্যে।

ম্যাকমোহন এদিকে বেশ ন্যালাখ্যাপা মাইডিয়ার ধরনের লোক, কিন্তু সিরিয়াস্ কথা—বিশেষ করে তার লাইন সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ উঠলেই সে গম্ভীর হয়ে পড়ে। ম্যাক যেন আঁচ করতে পারে তার মনের কথা। তার চোখ দুটো তাদের স্বাভাবিক জ্যোতি হারিয়ে দুটো বাদামী নিষ্প্রভ বলের মত জেগে থাকে। থেমে থেমে সাবধানে বলে, "তুমি চেষ্টা করলে অনেক দূর যেতে পারো গোপাল।"

"কী করে? আমার তো মনে হয় সেণ্টারের কোন মন্ত্রীর মেয়েকে বিয়ে না করলে…"

"বাজে কথা বোল না গোপাল। সে রকম কোন চান্স এলে নিশ্চয় টেকআপ করবে। কিন্তু তা বাদ দিয়েও তো তোমার সামনে অনেক রাস্তা খোলা আছে।" একটু দম নিয়ে বললে, "এই আমার কথাই ধরো না, যখন ইণ্ডিয়া স্বাধীন হোল, একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিলাম, ভাবলাম বিলেত পালাব। তারপর ভাবলাম আমি একজন নিউজম্যান, আমার লজ্জা কী? মাই গড, আমার কোন ফিলজফি নেই, আশা করি তোমারও নেই গোপাল।"

গোপাল যেন ম্যাকমোহনকে আর একবার নতুন করে দেখে। তার ভদ্র মোলায়েম মুখখানা কেমন যেন শক্ত কঠিন লাগে। মনে হয় লোকটা এই ব্যাবহারিক জগত সম্বন্ধে অনেকখানি জানে। অনেক ব্যাপার তার নখদর্পণে। তার মাইডিয়ার ভাবটা নেহাতই একটা আস্তরণ, প্রায় ভড়ং। এই কলকাতা-দিল্লী-ভারতবর্ষ নামধেয় পৃথিবীর অংশটিতে সাফল্য নামে গুপ্তধনের চাবিকাঠি যেন এদেরই হাতে। আর এই কাঠি হাতে আছে বলেই এরা এত সহজে মানুষ আর তার গতিবিধির ওপর এমন অক্লেশে রায় দিতে পারে।

"তবে তোমাকে অনেক গোঁড়ামি ছাড়তে হবে গোপাল", ম্যাক-মোহন একটু ইতস্তত করে বললে। একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভাবনাকে ভাষা দিতে যেন সে চেষ্টা করে। থেমে থেমে ধীরে ধীরে বলে, "তোমাকে আরো বড় আউটলুক নিতে হবে। শুধু দেশের একটিমাত্র অংশের সুখদুঃখের সঙ্গে যদি নিজেকে বেঁধে ফেল তাহলে কিন্তু বেশী দূর এগুতে পারবে না বলে দিচ্ছি।"

গোপাল প্রায় চমকে ওঠে। ম্যাকমোহন ঠিকই ধরেছে। যারা সাফল্য লাভ করেছে তাদের চালচলনে একথাটাই প্রকট। মাথা নীচু করে সে প্লেটের ওপর সিদ্ধ পেঁয়াজের বল কাঠি দিয়ে খোঁচাতে থাকে।

ম্যাকমোহন বললে, "আমায় ভুল বুঝো না গোপাল। আমি অনেক ঠেকে শিখেছি। এ লাইনে থাকতে গেলে কোন বিশ্বাস অবিশ্বেসের কথা নাই। এতে আমার ভাল লাগছে কি না লাগছে তাতে বড় কিছু যায় আসে না। যে কোন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে..."

গোপাল তার হাতটা তুলে বললে, "আর না ম্যাকমোহন, আমি বোধ হয় একটু বেশী টেনেছি। তোমার কথাগুলো একেবারে মাথায় গিয়ে ধাক্কা মারছে।"

ম্যাক আবার দৃঢ় গলায় বললে, "তুমি যা ভাবছো গোপাল তা ঠিক হবে না। এখানে কোন আদর্শ ফাদর্শ বলে কিছু নেই, কোন কাগজেই নেই, থাকতে পারে না।...বুঝছো না দেশে এখন আগেকার দিনের জারনালিজম্ নেই।"

গোপাল কৌতুহলী হয়ে বললে, "কী রকম?"

"যেমন ধরো তোমার রমেনবাবু চল্লিশ টাকা না পঞ্চাশ টাকায় কাগজে ঢুকেছিলেন। কেন? যে লোকে বলবে সে মিঃ সি, আর

দাশের একজন সহকর্মী। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে। এখন ওরকম স্বাদেশিকতা ফাদেশিকতার বালাই থাকলে চলবে না। দেখছোনা, ইণ্ডিয়ান এমব্যাসিগুলো, রেডিও, প্রেস সব জায়গায় শুধু একটাই কথা, সেটা হোল এফিসিয়েন্সি? ইংরেজকে তুমিও গালাগাল দেও, আমি যে দিই না তা নয়। তবে ইংরেজের এফিসিয়েন্সি দিয়েই তো উনিশশো পঞ্চাশ সালে এদেশ চলছে।"

ম্যাকের স্পষ্ট অকাট্য দ্বিধাহীন যুক্তিগুলো শুনতে শুনতে গোপালের মনে পড়ে তার গত কয়েক মাসের অভিজ্ঞতা। সত্যিই এই গত কয়েক মাসে অন্তত সরকারী বেসরকারী উচ্চমহলে ঘুরে একটা জিনিষই সে বারবার আবিষ্কার করেছে। সেটা হোল ক্লাইভের বংশ-ধরদের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা। আমলাদের মধ্যে তো সেকালের জঁাদরেল ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের লোকেদের সঙ্গে একালের অফিসারদের তুলনা করে একটা বিষন্ন আবহাওয়া সৃষ্টি করা প্রায় রেওয়াজে দাঁড়িয়েছে।

ম্যাকের মুখেচোখে উৎসাহ যেন নেচে বেড়াচ্ছে। টেবিলের ওপর আঙ্গুলগুলো মেলে এক এক করে দেখিয়ে বলে, "যেমন মনে করো, মহেঞ্জদারো, ট্যাগোর, ফাইভ ইয়ার প্ল্যান—যে কোন সাবজেক্ট তুমি নাও না কেন, তোমায় এমনভাবে সাজাতে হবে যেন বিদেশের লোকও বুঝতে পারে। আরো মডার্ণ হতে হবে। আর এদেশে তোমায় কে টাকা দেবে বলো?" তারপর হঠাৎ তার উৎসাহ নিভে যায়। আফশোসের স্বরে বলে, "আমার আবার মডার্ণ হয়েও কোন সুবিধে নেই।"

গোপাল অবাক হয়ে বলে, "কেন?"

"কেন? তাও বুঝতে পারছো না? আমার নাম যদি ম্যাক না হয়ে মুখার্জী হোত তাহলে দেখতে একেবারে মাৎ করে দিতাম।"

বাইরে বেরুতে একটু গুমোট ভাব কাটে। হাওয়াও দিচ্ছে, গাছগুলো দুলছে মনে হোল। রাস্তার মোড়ে আসতেই ম্যাকের কথাগুলো যেন গোপালের কানে হাতুড়ি পিটতে থাকে। হঠাৎ তীব্র আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যায়। প্রায় পাঁয়ের ওপর দিয়ে একটা দোতলা বাস চলে গেল। গোপাল রাস্তার উল্টো ফুটে দাঁড়িয়ে শেষ ট্রামের জন্যে তাকিয়ে থাকে। তার চোখের সামনে ভাসে একটা মস্ত বড় সুদূরপ্রসারী আলো ঢাকা রাস্তা। সামনের মাঠের ঘন অন্ধকারে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশ থেকেই যেন সেটা মোড় নিয়েছে।

সাত

ছুটির দিনের সন্ধেবেলাটা সেবার যতই এগিয়ে আসে ততই গোপালের মনে হয়, আর খেয়াল নয় এবার ঠুংরী। ছুটির সন্ধে কাটাবার এক সার্বজনীন প্রথা আবিষ্কৃত হয়েছে—সিনেমা হাউস-গুলোতে ভিড় করা। কিন্তু বেশীর ভাগ ছবিই গোপালকে ক্লান্ত করে। আর যে ভাবে কেউ কেউ বলে, 'বাংলা ছবি ভাল লাগে না, ইংরেজী ছবি দেখি'—সে ভাবের আশ্রয়ও গোপালের নেই। বেশীর ভাগ বিদেশী ছবির প্রকৃতি তার কাছে বড্ড বিদেশী, বড্ড সুদূর, তার চেয়ে আনন্দ পেতে গোপালের নেহাৎ বেড়াতে ভাল লাগে।

কিন্তু ঠুংরী কে শোনাবে তাকে? অমিয় যে তাকে সন্ন্যাসী বলেছিল সে কথা ভেবে তার বুকটা খচ্ করে ওঠে। বাইরে রোদ্দুর পড়ে এসেছে। গরমের দিনে সহরের একমাত্র সান্ত্বনা সন্ধের হাওয়া উঠেছে। রাস্তায় নামতেই একসারি মেয়ে গোপালের সামনে দিয়ে যেন ভাসতে ভাসতে চলে গেল। গোপাল সেদিকে খানিকক্ষণ অগ্রসর হয়। তারপর ট্রামের স্টপেজে যেখানে হাইড্রোজেন পোরা

রঙ্গীন বেলুনগুলো হাওয়ায় উড়ছে সে জায়গায় এসে সে থমকে দাঁড়ায়।

হঠাৎ খুশীর কথা মনে হয় গোপালের। ঠুংরী শোনাতে পারবে কি না সে বিচারে নয়, এমনি। দুবছর পার হয়ে গিয়েছে তাদের আলপের পর। দৈবাৎ কথাচ্ছলে খুশী যদি বলেই থাকে তার কথা আর ভদ্র, মিশুকে দিলীপ যদি তার ভদ্র ব্যবহারের নিদর্শন দেখাবার জন্যেই কথাটা পেড়ে থাকে তাহলেই কি সেখানে যাবার যথেষ্ট যুক্তি আছে ?

গোপাল একবার তার ব্যাগ খুলে কার্ডখানা হাতের তেলোয় নিলে। তারপর আর কোন কিছু চিন্তা না করেই ট্রাম ধরলে রাস্তা পার হয়ে।

ভবানীপুরের বনেদী বাড়ি বলে মনে হোল। যদিও বাড়িটার কলি ফেরানো হয় নি অনেক বছর, একদিকের দেয়ালের বেশ কিছু জায়গা জুড়ে চটা উঠে গেছে কিন্তু তার চওড়া থামওয়ালা গাড়িবারান্দা, মার্বেলের সিঁড়ি আর দুমানুষ সমান লম্বা দরজায় পিতলের ঝকঝকে হাতল দেখেই খেয়াল হয় যে এ বাড়িকে ফ্ল্যাট করে ভাড়া দেওয়া যাবে না। আর দিলীপের বাবা যে একজন প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার তা নীচের বৈঠকখানা দেখেই টের পাওয়া যায়। খুশী আর দিলীপের আস্তানা সামনের বারান্দা যে অংশে গিয়ে পড়েছে সেখানে। আসবাবগুলোর চেহারা সেদিকে আলাদা, অতো ভারী না আর বারান্দায় ঢুকতেই পুরনো তেলচিত্রের ছড়াছড়ি নেই। গোপাল লক্ষ্য করলে যামিনী রায়ের যশোদা ও কৃষ্ণ দিলীপের বসবার ঘরে ঠিক মাথার ওপরেই।

যে লোকটি এগিয়ে এল তাকে পুরোপুরি বেয়ারাও বলা যায় না, আবার পুরোপুরি চাকরও নয়। লোকটি জানালে দিলীপের আসতে দেরী হবে, কিন্তু তিনি অপেক্ষা করতে পারেন।

গোপাল ঘরে ঢুকে একটা বেতের চেয়ার টেনে বসল। ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে ভাবে বড্ড তাড়াতাড়ি আসা হয়ে গেছে, আরো পনেরো মিনিট পুরিয়ে সাড়ে ছটায় এলেই ঠিক হোত। টেবিলের ওপর অনেকগুলো ইংরেজী ম্যাগাজিন আর মেডিকেল জার্নাল পড়ে'। গোপাল "হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া"-র পাতা উল্টাতে থাকে।

খুট করে শব্দ হয়। না, খুশী না। খুশী ভেতর থেকে খবরের কাগজ পাঠিয়ে দিয়েছে দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ার হাত দিয়ে।

বছর পঞ্চাশেক বয়সের ভদ্রমহিলা, রোগা, চোখে চশমা, বড়লোক আত্মীয়ের বাড়ি থাকার দরুণই বোধ হয় একটু শঙ্কিত ভাব মুখে চোখে, চোখ নামিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, "আপনি একটু বসুন।"

গোপাল কাগজটা টেনে নেয়। তাদেরই কাগজ। কাল যে খাদ্য-মন্ত্রীর রিপোর্ট করেছে সেটাই চোখ বুলিয়ে পড়তে থাকে। খাদ্যমন্ত্রীর সংখ্যাতত্ত্ব যদি সঠিক হয় তাহলে আবার চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে লোকেরা খেতে পাচ্ছে না কেন, কথাটা সে যখন ভাবছিল তখন দ্বিতীয়বার আওয়াজ হোল।

খুশী! কী বদলিয়ে গিয়েছে এই সময়ের ব্যবধানে। অথচ মোটা হয় নি, যা সাধারণত হয়ে থাকে, কিংবা খুব গিন্নী হয়ে পড়েছে বলেও বোধ হোল না, কিন্তু একটা পার্থক্য ঘটেছে—আর সেটা বেশ বড় রকমের পার্থক্য—সেটা তার সাদা সিল্ক, চীনে না সিঙ্গাপুরী খোঁপা, 'ও আপনি' বলার একটা মামুলী ঢং-এ যেন একসঙ্গে এসে খোঁচা দেয়।

খুশী আগের চেয়ে ফর্সা হয়েছে। সাদা সিল্কের শাড়ীতে তার লম্বা ঘাড় বেঁকিয়ে বসার সচেতন ভঙ্গীটা নতুন লাগে। খুশী বললে, "দিলীপকে বলছিলাম। এই ঠিক সেদিনই আপনার কথা হচ্ছিল। এই তো দুতিন দিন আগেই।"

গোপাল লক্ষ্য করলে খুশীর গলা একটু ভারী হয়েছে, নীচের পর্দায়

এলে ছেলেদের গলার আওয়াজের মত, মুহূর্তের জন্যে গমগম করে মিলিয়ে যায়। তার হঠাৎ মনে হয় আর একজনের কথা, যার গলার এমনি আওয়াজ, তার মাসী।

নিজেকে ঝাড়া দিয়ে বললে, "তোমরা নাকি একটা ক্লাব বানিয়েছো।"

"হ্যাঁ, কিন্তু সেখানে কি আপনি আসবেন। আপনার আবার তো শুনি কি সব মতটত আছে।"

গোপাল হেসে বললে, "মত তো তোমারও আছে, মত একটা থাকতে ক্ষতি কী?"

"না দেখুন, মত কোন থাকা আমার পছন্দ হয় না, মত থাকলেই যত বিপদ, মানুষকে ঠিক সহজ ভাবে নিতে না পারলেই যত দুঃখ। আমি বলি অতো ঝামেলা করে কি লাভ?" খুশী একটা নিঃশ্বাস ফেলে টান হয়ে বসে।

গোপালের চোখে বিদ্রূপ ফুটে ওঠে। আস্তে আস্তে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে, "আমার তো মনে হয় খুশী মত না থাকলে মানুষ মানুষই হয় না।"

"বড্ড বইয়ের কথা, এইটা আপনাদের বড্ড মুস্কিল," মুখের উপর এসে পড়া চুলগুলো সরাতে সরাতে খুশী হঠাৎ মুরুব্বীর চালে কথাটা বললে, তারপর কি ভেবে বললে, "দিলীপকে আমি সব সময় বলি......"

"তুমি দিলীপকে বোল খুশী। আমায় ওসব বোল না," গোপাল তার বাঁ হাতটা ওপরের দিকে তুলে বলে।

খুশী আশ্চর্য হয়ে বললে, "মানে?"

"মানে আবার কী, তার মানে আমি দিলীপ নই।"

খুশী একটু অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। না, নিত্য-

গোপাল বেশ বদলে গেছে। কয়েকবার আগের কথা মনে পড়ে তার। শার্টের হাত ওল্টানো, ধুতি পরা নিত্যগোপাল। উৎসুক ভাবুক চোখ, নীচু গলা। আর সামনে কেতাদুরস্ত, যত্নে চুল-পাল্টানো লোকটি। পালিশ জুতো, সিল্কের শার্ট আর তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল চোখ—কোথায় একটা পার্থক্য ঘটে গিয়েছে।

হঠাৎ আরো অন্তরঙ্গ বোধ করে খুশী। আপনি "তুমি"-তে নামিয়ে বললে, "তুমি বড্ড পাল্টিয়ে গিয়েছো গোপাল। আমি বিলেত গিয়ে যা বদলিয়েছি তার চেয়ে শতগুণে তুমি দেশে থেকেই বদলে গেছ।"

"কেন, কি পাল্টানো দেখলে ?"

খুশী ভুরু উঁচু করে বলে, "সে কি আর এক কথাতে বলা যায়। সেই যেদিন হাসির বিয়েতে তোমার সঙ্গে দেখা হল, তোমার তো গলা দিয়ে কথাই বেরুচ্ছিল না, আরও তখন কয়েকবার দেখেছি চোখ নীচু করে থাকতে, কী যেন ভাবতে সব কথায়, বেশ সাই টাইপ," একটা বিশেষণে গোপালের অতীতকে নির্ধারিত করে সে বেশ নিজের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছে মনে হোল।

গোপাল বললে, "হ্যাঁ তা একটু ছিলাম, কেউ কেউ বলত সন্ন্যাসী, সেটা ঠিক, তবে মেয়ে দেখলেই তরুণদের বাঘ হতে হবে এটা তখনও বিশ্বাস করতাম না, এখনও করি না।"

খুশী একটু অবাক হয়ে তাকায়। তারপর ধীরে ধীরে বলে, "দিলীপ এখনই চেম্বার থেকে ফিরবে, একটু বোসো।"

হঠাৎ একটু রহস্যজনক ভাবে তাকিয়ে বলে, "তাহলে তোমার রাজনীতিটিতি ছেড়ে দিয়েছো তো ?"

গোপাল চুপ করে থাকে। সে যে বিরক্ত হয়েছে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। তার খুশীর একদিনকার কথা মনে পড়ল, খুশী বেশ সাজিয়ে বলেছিল, 'কেউ ভগবান চাইলে সেখান থেকে আমি পালিয়ে যাই।'

খুশীর চোখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলে, "না রাজনীতিতে নেই, তবে ভগবান এখনও চাই।"

খুশী হাল্কা ভাবে বলে, "তাই বলো, অতো হেঁয়ালী করছো কেন ?"

"না হেঁয়ালী না খুব স্পষ্ট করেই বলছি। তখন যে যে জিনিষ ঘেন্না করতাম এখনও সেই সেই জিনিষ ঘেন্না করি। বোধ হয় আরও বেশী করে করি।"

খুশী ঠাট্টা করলে "যেমন ?"

গোপালের চোখ দুটো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। খুশী ঠিকই বলেছে, শুধু নামেই নয় গোপালের চেহারায়ও পরিবর্তন এসেছে, আগে যে রকম প্রশান্তভাবে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতো এখন সে চাউনি সম্পূর্ণ হারিয়ে না গেলেও এক নতুন তীব্রতা এসেছে তার চোখে। সে যেন তীব্রভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে চায়। তেমনি এক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি খুশীর দিকে মেলে গোপাল বললে, "আগে বড্ড বেশী শ্রদ্ধা করতাম মানুষকে, এখনও করি। তবে সে মানুষ হোল বড় মানুষ, যারা মনের দিক থেকে বেঁড়ে, তাদের মাথায় আজকাল পা দিতে শিখেছি, তাদের আর সম্মান করি না।" তারপর খুশীর দিকে ঝুঁকে পড়ে বললে, "কী কী জিনিষ ঘেন্না করি বলছিলে ? যেমন ভালবাসার নামে প্যানপেনে উচ্ছ্বাস অথবা…" গোপাল হঠাৎ কথা থামিয়ে দেয়। তার চোখ দুটো আস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

খুশীর কৌতূহল জাগে। এমন জোর দিয়ে গোপালকে কথা বলতে আগে সে শোনে নি। উৎসুক ভাবে বললে, "অথবা ?"

"অথবা হিসেব," গোপাল শান্ত গলায় জবাব দেয়।

"হিসেব ? ভালবাসায় আবার হিসেব কী ?" খুশী একটু উত্তেজিত ভাবে বলে।

"আমি তো তাই জানতাম, ভালবাসার আবার হিসেব কি ? এখন দেখি লোকে হিসেব করে। সেটা বড্ড ঘেন্না করি।"

আলাপটা বড় চড়া পর্দায় উঠে গেছে। একবার গোপালের মনে হোল টপ করে নামিয়ে আনবে কোন সিনেমার গল্প তুলে। কিন্তু সে তো বিশেষ সিনেমা ছ্যাখে না, আর তা ছাড়া সে মোটেই অনুতপ্ত নয়। গোপাল কোন বক্তৃতা করতে এখানে আসে নি, সে বিষয়ে সে পুরো-পুরিই সচেতন ছিল। খুশী এ রকম বিশ্রী ভাবে না খোঁচালে সে নিশ্চয় এ সব কথা গায়ে পড়ে বলত না।

খুশীর মুখ মুহূর্তের জন্যে ম্লান দেখায়। সেও দিলীপের আর্ট আয়ত্ত করে ফেলেছে। কোন গুমোট অবস্থার সৃষ্টি করতে চায় না। কাজে কাজেই সে হাসলে। হাসিটা বেশ ভাল ভাবেই 'ম্যানেজ' করতে পারলে। একটু অন্তরঙ্গ ভাবে বলে, "তুমি তো কবিতা লিখতে শুনতাম। আমি বোধ হয় পড়েওছি একটা না দুটো কোথায়। যা অদ্ভুত অদ্ভুত লেখো তুমি বাবা, ঠিক তোমার কথাবার্তার মত। একদম বুঝতে পারি না। তুমি একটা বিয়ে করো, বুঝলে গোপাল," বেশ উজ্জ্বল ভঙ্গীতে গায়ের কাপড়টা নাচিয়ে বললে খুশী।

গোপাল বুঝলে খুশী ঢুকে গেল নিজের গহ্বরে, কিন্তু এই প্রত্যাবর্তনে একটা চটক আছে, গোপালের সেটা ভাল লাগল। তার মনে হোল যদিও খুশী তার আসন করে নিয়েছে এই সমাজে, ডাঃ বি. এম. বোসের পুত্রবধূ হিসেবে, তবুও তার সঙ্গে সময় কাটানো মন্দ না।

ঠিক এমনি সময় একজনের আবির্ভাব হোল যাকে দেখা মাত্রই গোপালের ভুরু কুঁচকে যায়। অবিনাশবাবুর আড্ডার আনন্দ।

রোগা হ্যাংলা, ফর্সা ফ্যাকাশে চেহারা, আনন্দ দেড়খানা গল্প লিখে তিরিশটা বছর পার করে দিয়েছে। গোপালকে দেখে সে একটু চমকিয়ে যায়। তারপর তার পালিশ করা চিকণ গলায় বললে,

"এই যে গোপাল। যাক আর একজন ক্যানডিডেট বাড়ল। একলা একলা প্রেম করতে বড্ড ভাল লাগে।"

আনন্দর কথা শুনে গোপালের মেজাজ চড়ে যায়। যেন আনন্দর আশ্চর্য হবার কিছু নেই। দেড় বছর কবিতার আলোচনা করলে, তারপর একটা ছোট গল্প লিখে প্রচণ্ড পরিশ্রান্ত হয়ে গোটা শীত মাউথ অর্গান বাজিয়ে কাটালে। শেষে আবার রবীন্দ্র সংগীত মাথা চাড়া দিয়ে উঠল যখন সেখানে কিছুদিন হাত পা ছুঁড়ে একদা প্রাতঃকালে এক জোড়া বাজখাঁই গোঁফ নিয়ে রাস্তার পথিকজনকে চমকিয়ে দিলে। না আনন্দ সব পারে।

আনন্দ বসে পড়েই বলতে স্থুরু করে, "তারপর আজকাল কি করছো টোরছো? সেই রকমই আছো? চাকরী না করেও তো বাবা বেড়ে চেহারা বানিয়েছো দেখছি।"

একটা চাপা রাগ গলার কাছে উঠে আসে গোপালের। কিন্তু মুহূর্তেই সামলে নেয় সে। শান্তভাবে বলে, "না আনন্দ, চেহারা বানিয়েছি সাহেবদের চাল খেয়ে।"

"তুমি চাকরী করছো তাহলে?" আনন্দ একটু অবাক হয়।

খুশী আলোর দিকে তার নখগুলো তুলে পরীক্ষা করছিল এতক্ষণ। চাকরী কথাটা শুনে ঘাড় ফিরিয়ে বললে, "কই, চাকরী পেয়েছো বলনি তো। কোন কলেজে?"

"কলেজে না, কাগজে।"

"কাগজে, সেখানে আবার কি কাজ?" খুশীর ভুরু কুঁচকে যায়।

"এই দৌড়োদৌড়ি ছোটাছুটি করার কাজ। কোথায় বাড়ি পড়ল, কেউ খুন হোল······"গোপাল হাল্কা ভাবে তার পেশা সম্বন্ধে বলতে স্থুরু করে।

"ও, তুমি তাহলে শেষ পর্যন্ত জারনালিস্ট হলে।" একটা আফশোস্

প্রকাশ্যেই বেজে উঠল খুশীর গলায়। গোপাল বুঝতে পারে। খুশী আফশোস্ করছে, ইংরেজীতে যাকে বলে রেসপেকটিবিলিটি তার জন্যে। প্রফেসরদের অবস্থা যে রকমই হোক না কেন, টাকাওয়ালা লোকের বাইরে অন্তত তাদের পংক্তি দেওয়া যেতে পারে। আর জারনালিস্টদের মধ্যে পংক্তি দিতে রাজি আছে খুশী একমাত্র এডিটরদের, আর যারা সবাই তারা বোধ হয় তার কাছে নিতান্তই এলেবেলে। এ ধরণের অভ্যর্থনা গোপাল আগেই পেয়েছে, তবে তাকে ব্যাপারটা মোটেই বিচলিত করে নি। সে অন্তত রেগে গিয়ে তার পেশা সম্পর্কে কোন বক্তৃতা দিতে বসবে না।

আনন্দ টেবিল থেকে একটা পিতলের বাঘ তুলে লোফালুফি করতে থাকে। সে একটু অস্থির বোধ করে। তার একটু গান গাইবার ইচ্ছে। মাঝে মাঝে বন্ধুমহলে সে গান গেয়ে আনন্দ পায়। আর যদিও প্রকাশ্যে সজোরে আপত্তি করে, কিন্তু জেনে শুনেও কেউ যদি অনুরোধ না করে তাকে তাহলে সে চটে যায়। তাছাড়া তার কেমন যেন গোপালকে অসহ্য ঠেকে। একটু অচেনাও ঠেকে। তার কাটা কাটা কথা, খুশীর সঙ্গে কথাবার্তায় কোন রকম বিশেষ ঝোঁক না দেখানো সবটাই তার মেজাজের দিক থেকে সুদূর। পিতলের বাঘ ছেড়ে এবার সে তার নিজের আংটি নিয়ে পড়ে। হঠাৎ তার আংটি পরিষ্কার করার কথা মনে পড়ে যায়।

গোপাল হেসে বললে, "আনন্দ, তুমি তোমার ঘড়ির কাঁটাও সাফ করো, বড্ড ময়লা জমেছে।"

"তুমি বেশ বদলে গিয়েছো গোপাল, কাগজে কাজ করে। নাইট ডিউটি করলে বোধ হয় এরকম হয়। কী বলো খুশী?"

গোপাল বললে, "কেন আনন্দ, আমি তো আগেও তোমায় মহাপুরুষ ভাবতাম না।"

খুশী নীচু গলায় বলে, "তুমি কি পণ করেছো গোপাল অন্যকে আঘাতই করবে। কেন, দুঃখ বাড়িয়ে লাভ কী? যথেষ্ট দুঃখ তো আছে।"

গোপাল আশ্চর্য হয়ে বলে, "দুঃখ, আঘাত, এ যে একেবারে কবিতা বলছো খুশী।"

খুশী আস্তে আস্তে বললে, "কেন ওটা কি তোমার একচেটিয়া নাকি। আচ্ছা, তুমি আজকাল কবিতা লিখছো না।"

গোপাল কপট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, "যাক, তাও একটা লোক আছে, কবিতা লেখা বন্ধ করলে মন খারাপ করবে।"

খুশী আহত হয়ে বললে, "তোমার কী হয়েছে বলতো? ওরকম ঠোক্কর দিচ্ছো কেন?"

আনন্দ বললে, "আমরা গোপালের কবিতা তারিফ করি না সেই জন্যে বোধ হয়।"

গোপাল উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। আনন্দর দিকে চোখ পড়তেই তার উপর বিরক্তিটা যেন কাঁপতে কাঁপতে মাথায় উঠে এল। একটু গলা চড়িয়ে বললে, "প্লিজ আনন্দ প্লিজ, আমাকে তোমাদের সাহিত্য থেকে বাঁচাও। কবিতা লিখেছিলাম ভাল লাগত। এখন লিখতে ইচ্ছে করে না। ব্যস। তারপর আর কোন কথা নেই। আমি এখন একজন কাগজের রিপোর্টার, ব্যস।"

গোপাল জানলার কাছে সরে গিয়েছিল, নীচেই গাড়িবারান্দার থাম্বার গা এলিয়ে মাধবী লতার ঝাড় উঠেছে। গোপাল সেদিকে একবার তাকিয়ে পেছন ফিরতেই দেখলে আর একজনের আবির্ভাব হয়েছে।

লম্বা দোহারা চেহারা সেই বিধবা ভদ্রমহিলাটি ঘরে ঢুকলেন। পর্দার ফাঁকে দুটো প্লেট হাতে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করেন। খুশী

বিরক্ত হয়ে বললে, "এসো এসো পিসী, ওখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন অমন করে।" ভদ্রমহিলা আর একবার ইতস্তত করে এগুতেই পর্দার কোণে ধাক্কা লেগে প্লেট থেকে মাংসের স্ত্যপ একটু ছলকে পড়ল। খুশী আরও একটু বিরক্তির স্বরে আদেশ করলে, "একটু দেখে এসো পিসী।"

পিসীর মুখে চোখে গাঁয়ের ছাপ এখনও আছে। ঝোল ভর্তি দুটো প্লেট হাতে নিয়ে তিনি আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। ছোট টুলটা খুশীর ঠিক পেছনে, আনন্দ একবার সেদিকে হাত বাড়িয়েই হাত সরিয়ে নিয়েছে। কিছুক্ষণ বোকার মত চুপ করে থেকে নিঃশব্দে পিসীমা তাঁর হাঁটু দিয়ে একটা ভারী টুল সরাতে থাকেন। গোপাল আশ্চর্য হয়ে ভাবে, খুশী কেন এই আত্মীয়াটিকে জব্দ করে আনন্দ পাচ্ছে। খুশীর দিকে তাকিয়ে তার মনে হোল সে যেন কাল সকালে ক্যাডবেরির চকোলেট পিসীমার ছেলের হাতে দিয়ে এর দাম দেবে।

কিন্তু আর দেখতে পারে না সে। অসোয়াস্তি, উদ্বেগে, পিসীমার পা কাঁপছে আর একহাতে প্লেট হেলে পড়ায় টপটপ করে ঝোল গড়াচ্ছে পিসীমার শাড়ীতে। আনন্দ মাথা নীচু করে নখ পরিষ্কার করছে। জানলা থেকে প্রায় দৌড়ে এসে গোপাল টেনে নেয় প্লেট দুটো। তারপর শান্তভাবে পিসীমাকে বললে, "আপনি শাড়ীটা ছেড়ে ফেলুন।"

গোপালের ব্যবহারে খুশী লজ্জা পায়। পিসীমা চলে যাবার পর বলে, "তুমি আবার অতো দৌড়োদৌড়ি করলে কেন ?"

আনন্দ বললে, "গোপাল কেমন স্মার্ট তাই দেখালে।"

খুশী একবার গোপালের মুখের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলে, "আনন্দ তুমি সেই গানটা করো না, "জীবনে পরম লগ্ন কোর না হেলা, হে গরবিণী।" কেমন একটা মদালস ভাবে টেনে বলে খুশী।

আনন্দ নেচে উঠল। সে এই সুযোগের জন্যেই এতক্ষণ উসখুস্ করছিল। একবার সম্মতির জন্যে গোপালের দিকে তাকাতেই গোপাল বললে, "গাও, আনন্দ গাও তোমার আবার লজ্জা কী।"

আনন্দ গায় মন্দ না, অন্তত সে যদি এতক্ষণ কথা না বলে গান করত তাহলে এতখানি সে অসহ্য হোত না গোপালের কাছে। খালি একটা ব্যাপার একটু বেশীক্ষণ হওয়ায় তার গানের লয় মাঝে মাঝে কেটে যাচ্ছিল। খুশী একটা বিশেষ ভঙ্গীতে বসে আছে, তার টান করে বসার ভঙ্গী, চশমার ফাঁক দিয়ে ঝকঝকে চোখ,—বোধ হয় ভাবের ঝোঁকে আনন্দ সেদিকে একটু বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছিল।

গান শেষ হবার পরও তার রেশ থাকে। সুরের চেয়েও ভাষার জোরে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে বাতাস। খুশী হঠাৎ বলে উঠল, "আনন্দ তোমার ছাত্রী পড়াতে গেলে না। সাতটা কখন বেজে গেছে।"

"আজকে আর যাচ্ছি না," আনন্দ বেতের চেয়ারের ভেতর আরো তলিয়ে গিয়ে বললে।

"সে কি। সেদিনও তো কামাই করলে, এ ভাবে চললে কি পড়ানো হয়। দ্যাখো দেখি, তার দিদির কাছে আমি কী বলে মুখ দেখাব।"

খুশী এমন জোর দিয়ে কথা বলে যেন আনন্দর পক্ষে তা ফেলা মুস্কিল। পরম আত্মীয়ার মত সে তিরস্কারও করলে, "তোমার কোন 'সিসটেম' নেই আনন্দ।"

আনন্দ আর বসে থাকতে পারে না। একবার গোপালের দিকে তাকিয়ে বললে, "দেখলে তো," তারপর খুশীর দিকে না তাকিয়েই বেরিয়ে যায়।

খুশী মন্তব্য করে, "একেবারে ছেলেমানুষ।"

বাহির থেকে কোন গোলমাল আসছিল না, শুধু বারান্দা দিয়ে

পিসীর আনোগোনা টের পাওয়া যায়। খুশী উঠে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দেয়। তারপর হঠাৎ দরজায় পিঠ দিয়ে বলে, "তুমি কেন গান গাওনা গোপাল? তোমার গলায় গান আছে।"

গোপাল এতক্ষণ পর খেয়াল করলে তার কালো সিল্কের ব্লাউস, কানে দুটো মুক্তোর টপ। চোখে তার বিদ্রূপের আলো না স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা বোঝা গেল না। কিন্তু পাঁচ মিনিট আগে যে খুশী তার আশ্রিতা পিসিমাকে জব্দ করে আনন্দ পাচ্ছিল এ যেন ঠিক সে খুশী নয়। আর তার চাউনি, বন্ধ দরজা যেন একসঙ্গে ধাক্কা মারে গোপালের মাথায়। বোধ হয় আধমিনিটও না। গোপাল পরে ভেবে দেখেছিল, তার চেয়ে বেশী সময় যায় নি। কিন্তু এই আধমিনিটেই হয় তো সে লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতে পারত। গলা টলা কাঁপিয়ে একটা যা তা বলে ফেলত। তার কেমন সন্দেহ হয়। খুশী নিশ্চয় পরীক্ষা করছে, আর সে নিশ্চয় নাক কুঁচকাত, হাসত মনে মনে। গোপালও যে শেষ পর্যন্ত কাদার ডেলা এই ভেবে সে হয়তো আরও চারপাশের লোকদের ধিক্কার দিতে লেগে যেত। আরও উঠে পড়ে ডাঃ পি এম বোসের পুত্রবধূ হওয়ার যুক্তির সমর্থন পেত। এক ঝলক তাজা হাল্‌কা বাতাস যেন গোপালের মুখে এসে লাগে। আরামের দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ারে হেলান দেয় সে।

খুশীও লক্ষ্য করলে, কয়েক মুহূর্তের জন্যে গোপালের মুখে একটা কালো থমথমে ছায়া ঘনিয়ে এসেই মিলিয়ে গেল। আবার সে তার স্বাভাবিক দীপ্তি মুখে চোখে ফিরিয়ে এনেছে। পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে গোপাল বলে, "গান গলায় নেই খুশী, মনে আছে।"

খুশী কী মনে করে বলে, "তুমি ও চাকরীটা ছেড়ে দাও গোপাল। অত দৌড়োদৌড়ি তোমার পোষাবে না।"

গোপাল চটে যায়, খুশী তাকে আনন্দ ঠাউরে মাতব্বরী করছে এটা

তার সহ্য হয় না। বলে, "হ্যাঁ আমিও তাই ভাবছি, ছেড়ে দেব।"

"না না আমি ঠাট্টা করছি না", একটু আহত হবার ভাব ফুটে ওঠে তার গলায়।

"তাহলে কী করছো?"

খুশী বললে, "আমি কি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা ছাড়া কথা বলব না?" তারপর একটা কথা মনে পড়ে গেল তার, যেন এবার একটা সত্যিই কথা পাওয়া গেছে। বললে, "কই তুমি চাকরী পেলে, খাওয়াবে না?"

"খাওয়াব। কখন খাবে বল," উদাসীনভাবে গোপাল জবাব দেয়।

এত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে যাবে, খুশীর ভাল লাগে না। দিলীপের ফিরতে ফিরতে নটা সাড়ে নটা হয়ে যাবে, সে সময়-টুকুর ক্লান্তি কাটানো যায় বই পড়ে, আর বই খুললেই তার হাই উঠবে। অথবা পিসীমার পেছনে তদারক করে বেড়ানো। তার চেয়ে—

খুশী হঠাৎ বলে বসল, "এখনই যাবে? চল না।"

গোপাল আশ্চর্য হয়ে যায়। ঘড়িতে দেখলে সাড়ে সাত। তারপর খুশীর উৎসাহ দেখে বললে "চল।"

রাস্তায় নামতেই তার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। উল্টো ফুটে ভিড়ের মধ্যে তার অফিসের এক সহকর্মী তার দিকে তাকিয়ে এমন বিশ্রীভাবে চোখ নাচিয়ে দিলে যার মানে করলে দাঁড়ায় "বেড়ে ভাই, বেশ পিটছো।" সে যে প্রেম করছে এ নিয়ে নির্ঘাত তাদের অফিসে কাল জটলা হবে।

গোপাল একবার বললে, "তোমার বাবা কেমন আছেন খুশী?"

খুশী একটু থমকে দাঁড়ায়, তারপর বলে, "তোমার অতো হাঁড়ির খবর জানার কী দরকার। বাবা কাশীতে। তিন হাজার থেকে রোজ দশ হাজার নামজপ শুরু হয়েছিল। তাতেও যখন দাদার ভাল কোন চাকরী হোল না তখন কাশী চলে গেলেন।"

পুরনো কোন কথা তুলতেই খুশী যেন বিরক্ত হয়। আর যে মেয়েটির সঙ্গে তার প্রেম হচ্ছে মনে করে কাল অফিসে জটলা হবে তাকে নিয়ে চৌরঙ্গী যেতে সারাপথ গোপালের যে কি অসোয়াস্তি হয় সে বলতে পারবে না কাউকে। চারদিকের লোকজন, কথা, শব্দ, কোন দিকেই খুশীর মন নেই। এমন কি তার সাধারণ ব্যবহারেও অযত্ন, অমনোযোগ। গোপাল কোন কথা পাড়লে খুশী বললে, "তুমি ভাবছো আমাকে ওসব কথা বলে খাবার কথা ভুলিয়ে দেবে?"

চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ের চওড়া রাস্তায় পড়তেই গোপালকে যেন ভূতে ধরল। সে হঠাৎ অফিসে তার কোন ভদ্রলোকটিকে পছন্দ হয় তাও বলতে স্থরু করে। কবিতার কথা তোলে, কেন মাইকেল মধুস্থদনের কবিতা তার সবচেয়ে প্রিয়...ইত্যাদি। খুশী ছোট্ট হাই তুলে বললে, "তুমি ভাবছো বোধহয় চা খাইয়েই সারবে। ওরকম কিপ্টেমি চলবে না কিন্তু।"

আবার খাওয়া। সে স্পষ্ট বোঝে খাওয়াটা একটা ছল মাত্র, খাওয়া ছাড়া কোন কথা তুলতেই খুশী নারাজ। গোপাল পেছন ফিরল। কয়েক হাত দূরেই একটা চীনে রেস্তোরাঁ। বুক পকেটে হাত দিয়ে ব্যাগটা টিপতেই কয়েকটা নোট তাদের অস্তিত্ব জানিয়ে খড়মড় করে উঠল। গোপাল একবার পেছনে তাকিয়ে বললে, "এসো।"

দু প্লেট অর্ডার দেওয়ার পরও সে যখন তৃতীয় প্লেটের অর্ডার দিচ্ছে তখন আড়চোখে খুশী তাকায় গোপালের দিকে। আর এ লোকটাকে তার কাছে অচেনা ঠেকে। এ যেন সেই নিত্যগোপাল নয়, যে তার একটা কথাকে প্রায় বেদবাক্য মনে করে আর কোনদিন তাদের বাড়ির ধারেকাছে আসে নি। গোপালের মুখের কোন পরিবর্তন হয় নি। বরং সে আগের চেয়ে আরো বেশী আজেবাজে কথা বলছে, খালি

নাকের পাতা মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে তার। তৃতীয় প্লেটের মাংস খুশীর সামনে স্তূপ হয়ে পড়ে থাকল।

গোপাল কিছু দেখেও দেখে না। একবার শুধু মুহূর্তের জন্যে তার চোখ দুটো বিদ্রূপে জ্বলে উঠল। কিন্তু তারপরেই হেসে বললে, "কই খেলে না তো, ঠিক আছে চল।"

চৌরঙ্গীতে সন্ধের ভিড়। বাতাসে সিগারেটের গন্ধ। একজন প্যান্ট পরা অন্ধ ভিখিরী ম্যাণ্ডোলিন বাজাচ্ছে। গোপাল তার হাতে একটা আনি গুঁজে দেয়। খুশী হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, "একটু বেড়ালে হোত না গোপাল।"

"দূর, কোথায় বেড়াবে। রাত হয়ে গেছে," বলে একটা চলন্ত বাসে প্রায় ঠেলে তুলে দিল খুশীকে। নিজে সে উল্টো দিকের বাস ধরলে।

আট

কদিন বিষ্টি উড়ে গেল। আবার ভ্যাপসা গরম আর ঘাম। আর এরই সঙ্গে সঙ্গে গোপালের কাছে এক সর্বনাশের মত নেমে এল পঁচিশে বৈশাখ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন।

কলেজ জীবন থেকে গোপাল এ ব্যাপারে একেবারে অনড়। কোন লেখক নিয়ে সরস্বতী পুজোর মত বাজনা বাজিয়ে ফুলের মালা ছড়িয়ে সারা বছরে একটিবার উৎসব করার এক অস্বাভাবিক অবস্থায় তার সমস্ত মন বিরূপ হয়ে ওঠে। কিন্তু এবারে তার আর নিস্তার নেই। কারণ সে কাগজের লোক। দেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জনমতের ভার তার ওপর। কাজেই এ সংস্কৃতির জোয়ালে নিজেকে জুততে হবেই, অন্তত চাকরী রাখতে গেলে।

এ কদিন বাংলা দেশের কাগজগুলো ঘাঁটলে গোপালের

ছেলেবেলার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়। ছেলেবেলায় তার দিদিমার যখন ঘুম পেত গল্প বলতে বলতে তখন তিনি স্থুরু করতেন : "তারপর রাজপুত্তুর মাঠ পেরোচ্ছে, মাঠ পেরোচ্ছে, মাঠ পোরোচ্ছে…" ঘুমে জড়িয়ে আসত তাঁর গলা। গোপাল বিরক্ত হয়ে বলত, "বলনা দিদিমা, তারপর কী?" দিদিমা তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলতেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, পেরোচ্ছে তো পেরোচ্ছেই, পেরোচ্ছে তো পেরোচ্ছেই…।" তারপর হয় দিদিমার তন্দ্রা কাটত নয় সে নিজেই ঘুমিয়ে পড়ত। এ কদিনের কাগজ ঘাঁটলে একটা কথাই শুধু পাওয়া যায় : রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, গুরুদেব, গুরুদেব, গুরুদেব…। কেউ যদি বিরক্ত হয়ে ভাবে তারপর? তখনই উত্তর আসবে : "গুরুদেব, গুরুদেব, গুরুদেব, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ।" কাগজের হেডলাইন পড়ে মনে হবে না রবীন্দ্রনাথ লেখক ছিলেন। তিনি বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ সদৃশ। তাঁর জন্ম হয়নি, "আবির্ভাব" হয়েছে। মৃত্যু হয়নি, হয়েছে "তিরোভাব"।

এ বছর গোপালের আরও অসহ্য লাগার কথা। কারণ বিরাট প্যাণ্ডেল খাটিয়ে সাতদিন ধরে হরি সংকীর্তনের মত রবীন্দ্র সংকীর্তনের ব্যবস্থা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে এক প্রেস কন্‌ফারেন্সে হাজির হোল গোপাল।

যিনি ডেকেছিলেন কনফারেন্স তাঁকে তার খবরের কাগজের জীবনে বেশ কয়েকবার দেখেছে গোপাল। ভদ্রলোক নিজে এক কাগজের অন্যতম মালিক। তাঁর এক থিওরি আছে তাঁর কাগজকে জনপ্রিয় করার। রাজনৈতিক খবরের বদলে তাঁর ইচ্ছে তাঁব কাগজ তিনি নাচগান আর সংস্কৃতি দিয়ে ভরে দেবেন। মাঝবয়সী, গিলেকরা পাঞ্জাবী গায়ে, রীমলেস চশমা পরা ভদ্রলোকটির মুখে চোখে আত্মতৃপ্তির একটা ভাব। গোপালের দিকে তাকিয়ে বলেন, "আপনারা রবীন্দ্রনাথ

পড়েন টড়েন তো ? দেখুন দেখি কী ব্যাপার ? এত বছর চলে যাচ্ছে অথচ একটা কিছু করা যাচ্ছে না গুরুদেবকে নিয়ে।"

সবাই চুপ করে থাকে। ভদ্রলোকের প্রকাণ্ড উৎসাহে কারো কারো একবার মনে হয়, হয়তো কিছু করার আছে নিজেদের নাম কেনা ছাড়াও। গোপাল কিন্তু অবাক হয়ে বলে, "কী করবেন ?"

এমন তীক্ষ্ণ গলায় সে বলে যে ভদ্রলোকও একটু আশ্চর্য হন। গোপালের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন, "কী করবেন মানে ? কী বলছেন আপনি ? এত জিনিষ আছে করার, এত ব্যাপার আছে, এত··· ।"

"এত কী ?"

ভদ্রলোক কী উত্তর দেবেন মুহূর্তের জন্যে বুঝে উঠতে পারেন না। গোপালের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পাশের ভদ্রলোকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এটা একটা কথা হোল ? এত করবার আছে···" তারপর হঠাৎ তাঁর উত্তরটা মনে পড়ে যায়। টপ করে গোপালের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলেন, "এই ধরুন, কাল আমার মেয়েকে আমি ব্রাউনিং পড়াচ্ছিলুম। নোট বইতে দেখি লিখেছে, ব্রাউনিং বেঁচে থাকতেই ব্রাউনিং সোসাইটি তৈরী হয়েছিল। আমাদের দেশে দেখুন এরকম কিচ্ছু হয়নি। এরকম একটা তো কিছু তৈরী করা যায়। এরকম ক-ত ব্যাপার আছে।"

গোপালের গা ঘোলায়। ভদ্রলোক আরও অনেক কথা বললেন। প্রতি ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে রবীন্দ্রনাথকে ছড়িয়ে দিতে হবে ইত্যাদি। আর গোপালের ঘুরে ঘুরে তার ছেলেবেলার গল্প শোনার মতই মনে হচ্ছিল : রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, গুরুদেব, গুরুদেব, গুরুদেব।

একবার তার মনে হল একটা প্রশ্ন করে, ভদ্রলোক রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন কিনা, তারপর মনে হোল কী দরকার হৈ চৈ করে। চারদিকের এই আর্থিক অনটন ও অব্যবস্থার ভেতর বাঙালী মধ্যবিত্তের

বছরে কয়েকদিন ফুর্তি করা দরকার। গোপাল হাই চেপে বসে থাকে।

অফিসে পা দিতেই মিঃ রায় চেঁচিয়ে উঠল, "দেখছেন, কত জায়গায় পঁচিশে বৈশাখ হচ্ছে। আপনি যাই বলুন কালচার যদি কোথাও থাকে তাহলে এই বাংলা দেশে। এতে আপনি না করতে পারবেন না।"

গোপাল জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিল। তার মুখখানা ম্লান দেখায়। মিঃ রায়ের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বলে, "কী দরকার ছিল সে আগুন ছড়িয়ে পড়ার? সব খানে ছাই হয়ে এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়ে কী লাভ হল?"

মিঃ রায় অবাক হয়ে বললেন, "কিসের আগুন বলছেন?"

"মানে ঐ রবীন্দ্রনাথ।"

সে রাত্তিরে গোপাল ঘুমোতে পারে না, ছটফট করে। সন্ধেবেলার ঘটনাগুলো তাকে পীড়া দেয়, আহত করে। সে নিশ্চয় তিরিশ সালের কোন লেখকদের মত রবীন্দ্র-বিরোধী জ্যাঠামিতে বিশ্বাস করে না। কিন্তু পঁচিশে বৈশাখের এই ধূপ ধূনো আর রজনীগন্ধার ঝাড়ের আড়ালে একটা প্রশ্ন মস্ত বড় হয়ে জেগে থাকে: যে উজ্জ্বল কুসংস্কারমুক্ত দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের লেখায় সমস্ত বাংলা দেশের হিন্দু-মুসলমান মধ্যবিত্ত কি তা মেনে নিয়েছে? মহাত্মা গান্ধী যখন বলেছিলেন দেশবাসীর পাপের ফলে বিহারের ভূমিকম্প ঘটেছে রবীন্দ্রনাথ তার তীব্র প্রতিবাদ করেন। দেশ জোড়া ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধতা করেন তিনি। জুনিয়ার পার্টনার হিসেবে নয় আপন গৌরবে পাশ্চাত্যের সামনে রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়েছিলেন। সে ঐতিহ্য কি বাঙালী মধ্যবিত্ত হৃদয়ে গ্রহণ করেছে?

গোপালের কাছে মনে হয় পঁচিশে বৈশাখের উৎসব মহাসমুদ্র না হয়ে হয়েছে গোষ্পদ। রবীন্দ্রনাথ যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাঁর আগে পেছনে কেউ নেই। তাঁর ধারা নেই, ইতিহাস নেই। এদেশে মাইকেল মধুসূদন বলে কি কোন কবি ছিলেন?—সে সব জানার

দরকার নেই। একটা সর্বরোগহরণ রবীন্দ্রমাদুলী হাতে বাঁধলেই সব জানা হয়ে যাবে। গোপাল ভাবে, হয়তো রবীন্দ্রনাথের জীবিত অবস্থায় এ ধরণের ব্যাপার ছিল না। সে প্রাণপণে এ কথাই বিশ্বাস করতে চেষ্টা করে। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে ততই তার মনে হয় বাঙালী মধ্যবিত্তের অধিকাংশের কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দাঁড়িয়েছেন এক পরম পলায়ন হিসেবে। তারা তাদের বিরাট দৈন্যের বেদীতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা সুরু করেছে।

গোপাল জানলার কাছে উঠে আসে। হাওয়া নেই। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। কতকগুলো ফ্যাকাশে মেঘ আকাশের কোণে জটলা করছে। কয়েকটা তারা, তাও অতি নিস্প্রভ। বর্ষার আকাশ নয়, গ্রীষ্মের আকাশ নয়, এক মাঝামাঝি মধ্যবিত্ত আকাশ।

গোপালের হঠাৎ মনে পড়ল এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের কথা। ভদ্রলোক একজন দুঁদে পুলিশ অফিসার ছিলেন। কম বয়সে কিছু কিছু অকারণ হিংস্রতাও দেখিয়েছেন। সম্প্রতি ভদ্রলোক রিটায়ার করে এক আশ্রমে যাতায়াত শুরু করেছেন।

গোপাল শুনে আশ্চর্য হয়েছিল। ইতিহাসে সে বারবার পড়েছে ধর্ম কিম্বা সাহিত্য সমস্ত সত্তার মূল ধরে আলোড়িত করে মানুষকে। এদেশে চৈতন্য, কবীর, নানকের আন্দোলনে এ ধরণের ভাব ছিল। ইউরোপে তো অনেক ক্ষেত্রে ধর্ম আন্দোলন মানেই সামাজিক সত্তাকে চ্যালেঞ্জ। সেখানে ধর্ম আন্দোলনের মূল কথাই হল, এ পরিবেশে ভগবান নেই। গোপাল আশ্চর্য হয়ে ভাবে, কি সাহিত্যের সাধনায়, কি ধর্মের আন্দোলনে তার সামাজিক সত্তা আলোড়ন করে বাঙালী মধ্যবিত্তের এই প্রশ্ন নেই কেন? কী তুরীয় পদ্ধতিতে নেহাৎ ভাত ডাল খাওয়ার মত এক লাফে ভগবানের কাঁধে ওঠা যায়, কী আশ্চর্য

সস্তা সমীকরণে জীবনের প্রতি একান্ত উদাসীন অথবা কেবলমাত্র উচ্ছ্বাসপ্রবণ ভদ্রলোকেরা অকস্মাৎ সাহিত্য সাধনায় মত্ত হয়ে ওঠেন।

গোপাল ভাবতে থাকে: সাহিত্য, ধর্ম, প্রেম—এতো সেই ঘুরে ফিরে জীবনকেই জানার কথা, তার রহস্য উদ্ঘাটন করে নিজে ঐশ্বর্যবান হবার কথা। জীবনের ক্ষেত্রে বেঁড়ে, অথর্ব হয়ে থেকে কি ভাবে সাহিত্যে, ধর্মে মেতে ওঠে মানুষ। মানুষ ভালবাসেই বা কী করে!

মনস্থির না থাকলে বোধ হয় সবই অসহ্য লাগে। গরমও আরো পীড়াদায়ক ঠেকে। অথচ গোপাল তো বিলেতের মানুষ না। এই গরম, ঘামের অসোয়াস্তি, এ তো বছরের অর্ধেক জুড়ে। কিন্তু গোপাল যেন ধুঁকছে একটা জন্তুর মত। এখন আর ঘাম মোছবার দরকারও মনে করে না। রোদে ঘুরে লাল হয়ে, ঘামে সপসপে ভিজে, কাপের পর কাপ চা খায় আর ঝিম মেরে পড়ে থাকে।

তার তন্দ্রা ছাপিয়ে ম্যাকমোহনের গলা ভেসে আসে, "আজ কী দিলে?"

"কলেরায় কটা লোক মরেছে।"

ম্যাক হেসে বললে, "আচ্ছা তোমার কী হয়েছে বল তো? সব সময়েই গুম মেরে বসে থাক। তারপর গোপালের মুখের দিকে চেয়ে চোখ নাচিয়ে বললে, "কী, খুব মেয়েদের পেছনে দৌড়চ্ছ বুঝি?"

ডেভিড রিডার্স ডাইজেস্ট থেকে মুখ তুলে বললে, "মিঃ চৌধুরী কাগজে ঢুকে কবিতা লিখতে পারছেন না। আমি ঠিক বলিনি মিঃ চৌধুরী?"

"তুমি যে আমার জন্যে এত ভাবছ ডেভিড এ জন্যে ধন্যবাদ", গোপাল বললে।

রায় কোথায় ছিল এতক্ষণ কারো চোখে পড়েনি হঠাৎ পাশ থেকে বলে উঠলে, "ওসব ঠিক হয়ে যাবে ম্যাক। ওরকম ভাব কি আর

আমাদের হয়নি ? রোজ চাকরী করতে এসে মনে হোত চাকরী ছেড়ে দেব। আর কিছুদিন যাক, সব ঠিক হয়ে যাবে।”

ম্যাক বললে, “তুমি যে কিছুই বলছ না গোপাল।”

“কী বলব! কবিতা লিখছি না প্রথম নম্বর, চাকরী ছাড়ছি না দ্বিতীয় নম্বর। আর কি বলার আছে।”

না, কবিতা কিম্বা চাকরীর ব্যাপার না। গোপাল আজকাল বাড়িতে ফিরতে চায়না। ফিরলেই অসোয়াস্তি। তার চেয়ে এদিক সেদিক ঘুরে শারীরিক ভাবে একান্ত ক্লান্ত হয়ে সে বিছানায় গিয়ে শোয়। একটা ভোঁতামির রাজত্বের ভেতর সে যেন নিজেকে জোর করে ঠেলে রেখে দেয়। পাছে জেগে উঠে অস্থির হয়ে পড়ে সে জন্যে রাত্তির নটার শোতে কয়েকবার ফিল্মও দেখে। কয়েকবার শো-এর মাঝখানেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। রাত্তির বারোটায় দারোয়ানের হাতের ঠেলায় শূন্য বিশাল হলঘরে জেগে উঠে বাড়ির দিকে দৌড়োয় সে। মাঝে কয়েকবার পারিবারিক কর্তব্য করবে ভেবেছিল। দুদিন মামার বাড়ি গিয়েছিল। মামা বেশ বর্ধিষ্ণু লোক। ভদ্রলোক দোকান থেকে মিষ্টি আনিয়ে বললেন, “এই নাও চারআনাওয়ালা সন্দেশ।” তারপর গোপাল আর সেদিকে মাড়ায় নি। এ ছাড়া এক খুড়তুতো ভাইয়ের বাড়িও হাজির হয়েছিল। ভদ্রলোক সম্প্রতি বিবাহ করেছেন এবং বিবাহের পর তার মার সঙ্গে তার বউয়ের বনছে না। দুতিন দিন গিয়ে এই প্যানপেনেনি শোনা যখন গোপালের অসহ্য হয়ে উঠেছিল তখন সে কোন কথা না বলে পালিয়ে এসেছে। তার মনে হয়েছিল খুড়তুতো ভাইটি এই বিরাট সমস্যাটি সমাধান করতেই সারা জীবন কাটিয়ে দেবে।

এ ছাড়া পারিবারিক কর্তব্যবোধে ঘন ঘন চিঠিও লিখলে কয়েকখানা হাসির কাছে। উত্তরে একমাত্র বাবলু ছাড়া হাসির তরফ থেকে

কোন নতুন বিষয়বস্তু খোঁজার চেষ্টা দেখা গেল না। বাবলুর কটা দাঁত গজিয়েছে, বাবলু কেমন খেলছে, ভগবান করুন সবাই যেন ভাল থাকে ইত্যাদি। সত্যগোপাল বিশেষ উচ্চবাচ্য করেন নি। তিনি ভাল আছেন, কার্সিয়াঙে এবার ঠাণ্ডা কম। এই রকম একটা দুটো কথা।

সেদিন দুপুরে জোর করেই গোপাল ঘুমিয়ে পড়ল, চারদিকে দরজা জানালা বন্ধ করে'। এই গরমের ক্লান্তি ছাপিয়েও একটা উত্তেজনা উঠে আসে যেটা গোপাল ভুলে থাকতে চায়। তাই ছুটির দিনে দুপুরে ঘুমোবার অভ্যাস শুরু করবে কিনা সে ভাবছে।

উত্তেজনাকে ব্যাখ্যা করার কোন ভাষা সে খুঁজে পায় না, প্রায় যন্ত্রণার মতই এই উত্তেজনা তাকে আচ্ছন্ন করে। আলাদা আলাদা করে সে একে ভাগ করবার চেষ্টা করেছে, কতখানি জৈবিক, কতখানি মানসিক, কতখানি পারিপার্শ্বিক সামাজিক অবস্থার অসোয়াস্তি, কতখানি চাকরীর গ্লানি। কিন্তু এ ভাবে আর ভাগ করা যায় না। সমস্ত অস্তিত্বের একটা প্রকাণ্ড ভাষাহীন অস্বস্তি তাকে চেপে ধরে, তাকে বই দিয়ে ভরানো যায় না। তা বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কথাবার্তার পরেও জেগে থাকে। অথচ তার যে ভীষণ একলা একলা লাগছে, সকলের থেকে একটা আলগা ভাবে থাকার পীড়ায় সে ভুগছে, এ ধারণাও তার মাঝে ঠাঁই পায় না। তার বাঁচার দেমাক আছে, অহঙ্কার আছে, যেখানে সে একতিলও আপোষ করতে চায় না। সেই দেমাক ক্ষুণ্ণ করে সে কারুর কোলেও মাথা রাখতে পারবে না। কিন্তু মাঝে মাঝে যখন এই অহঙ্কারের বোঝা বড্ড ভারী হয়ে পড়ে, সমস্ত মাথা টনটন করে তখন সে ছুটে যায় 'সামাজিক' হতে, হাল্কা হতে, আবার দ্বিগুণ মাথা টনটনানি নিয়ে ফিরে আসে। সেখানে হয় সেই বুক চাপড়ানো হতাশার শরিক হতে হবে, নয় অতিরঞ্জন করতে হবে, ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ভাবতে হবে। অথচ এমন একটা বিরাট গভীর নদী যার কথা সে

বইতে পড়েছে,—যার ঐশ্বর্যের জন্যে চীৎকার করতে হয় না, ফোঁপাতে হয় না, কিন্তু ঠিক বয়ে চলে যায় যুগের পর যুগ, সমস্ত অশান্তি বিরক্তিকে বুকে নিয়েই—যে নদীর কথা সে কবিতায় লিখেছে কিন্তু বুকে হাত দিয়ে তার ঠিকানা সে এখনও পায় নি। আর তার মনে হয় এই বিরাট অস্তিত্বের মাঝখানে না দাঁড়াতে পারলে তার জন্ম বৃথা, তার কর্ম বৃথা। তার মনুষ্যত্ব শুধু ভালমানুষামীর পর্যায়ে দাঁড়ায় মাত্র।

গোপাল শুয়ে শুয়ে বালিশের নীচে হাত মুঠো করলে। শুধু না নয়, জীবনে হ্যাঁ করতে হবে। আর এই হ্যাঁ-টা কোন ঝলমলে উপসংহার নয়, কোন নাটকীয় ক্লাইম্যাক্স নয়, সারা জীবন ধরে এই না-কে হ্যাঁ করার দায়িত্ব নিতে হবে।

গোপাল ফ্যানের গতি আরো বাড়িয়ে দেয়। তারপর বালিশের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে ভাবে তার দিলীপকে ভাল না লাগুক, হাসির স্বামী সুবোধকে মনে হোক অসহ্য কিংবা সত্যগোপালকে তার কাছে খুব একটা বিবর্ণ মানুষ বলে মনে হোক, সেটাই তো সব কথা নয়। তার নিজের জীবনে পূর্ণতা আনতে হবে, যে পূর্ণতার কথা সে বইতে পড়েছে তার সামান্যতম অংশ সে প্রতিষ্ঠা করবে তার জীবনে।

ঘুম আসে না, ঘরের মধ্যে আস্তে আস্তে তাপ কমে যায়, খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে কয়েকবার ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক আসে। বাইরে যেন ছায়া নেমেছে, ঘরের ভেতরটাও অন্ধকার দেখায়।

গোপালের বোধ হয় তন্দ্রাই এসেছিল। হঠাৎ মেঘের আওয়াজে সে উঠে বসে। বেশ গম্ভীর ভারী জল ভরা আওয়াজ যা এতদিন প্রায় লোকে ভুলে গিয়েছিল। গোপাল উঠে জানলা খুলে দেয়। বেলা তিনটেতেই আকাশ অন্ধকার হয়ে এসেছে, আর একটা চমৎকার আলো ফুটেছে রাস্তায়। ভোর অথচ ভোর না, এরকম এক হলদে আভায় গাছের মাথাগুলো অন্য রকম দেখায়। কাকের শব্দ আসছে

গাছগুলো থেকে। অন্ধকার থমথমে আকাশের বুকে একটা মস্ত বড় সাদা ঘুড়ি ওড়ে। আর সাথে সাথে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক আসে।

গোপাল চপ্পল পায়ে গলিয়েই ছুটতে ছুটতে রাস্তায় এসে নামে। কার্তিক ক্যাবিন তুপুরে বন্ধ, কোন ভিড় নেই রাস্তায়। গোপাল কি মনে করে কালীঘাটের দিকে রওনা হয়। এ দিক দিয়ে সে নয়নের কাছে কয়েকবার গিয়েছে। একটা চওড়া গলির তুধার দিয়ে কৃষ্ণচূড়া ফুটেছে আর সেগুলো ছাড়িয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে গোপাল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। আকাশের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘন কালো নীল মেঘ ঘুরতে ঘুরতে আসছে। আর গোপালের ঠিক মাথার উপরেই বোধ হয় হাওয়ার চাপে একটা ফাঁক, আর সেই ফাঁক দিয়ে পরাজিত সূর্যের এক টুকরো আলো ঠিকরে পড়েছে। গোপাল একটা ছাদের মাথায় তাকিয়ে চমকে যায়, এখানে আবার বকের পাঁতি কোথায়? কিন্তু বক না হলেও নীল মেঘের গায়ে গায়ে সাদা পায়রার ওঠানামা দাঁড়িয়ে দেখবার মত। ঝড় আসছে। তার নিঃশ্বাস গায়ে এসে লাগে। ট্রাম লাইনের উল্টো দিক থেকে ঘুরতে ঘুরতে ধুলোর ঝড় আসে। মুহূর্তেই নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। বাতাস ধাক্কা দিয়ে তিন চার পা এগিয়ে দেয়। আর সঙ্গে সঙ্গে ফোঁটা ফোঁটা মোটা দানায় বৃষ্টি নামে ক্ষিপ্র গতিতে। হঠাৎ কোথা থেকে ভয়চকিত একটি গরু লেজ তুলে দৌড়তে দৌড়তে এসে ধাক্কা মারলে। গোপাল ফুটপাথে বসে পড়ে। কোমরে সামান্য লেগেছে। কিন্তু গোপাল আর ওঠে না। পা ছড়িয়ে বসে থাকে। তার চুল থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত গা বেয়ে বৃষ্টি ঝরে।

নয়

ধীরে ধীরে বর্ষার মেঘের আবির্ভাব হয়। তারা ঠিক মৌসুমী না কালবৈশাখী মেঘেরই বংশধর এ নিয়ে আবহাওয়া অভিজ্ঞদের সন্দেহ

থাকে। তারপর আর সন্দেহের কারণ থাকে না। হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে হিমালয়ে বাড়ি খেয়ে কালো গম্ভীর জলে ভারি মেঘের দল বাঙলাদেশের দক্ষিণ প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

সেদিন সকালে মাদ্রাজ থেকে ক্যালকাটা মেল যতই বিহার-বাঙলা সীমানা ছাড়িয়ে এগিয়ে আসে ততই আকাশ কালো হয়ে ওঠে, কলকাতার কাছাকাছি আসতে জানালা দিয়ে যাত্রীদের মুখে জলের হাওয়া এসে লাগে।

একটা বিরাট তৃতীয় শ্রেণীর কামরার এককোণে সমস্ত শরীরটা কুঁকড়িয়ে গালের নীচে হাত রেখে যে শুয়েছিল তাকে দেখে ঠিক বয়স ধরা যায় না। তার শোওয়ার ভঙ্গীতে যে স্বচ্ছন্দতা তা সাধারণত তিরিশ বছরের এদিকের স্ত্রীলোকদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু আয়ও একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে ধরা পড়ে। বয়সের ছাপ ঘুমন্ত চোখের নীচে, আর সারা শরীরের কাঠিন্যে। তবু সে যে চল্লিশ বছরের এক মহিলা তা ভাবতে কল্পনাশক্তিকে পীড়া দিতে হয়।

গাড়ির অবাঙালী লোকজন তার চালচলন দেখে তাকে 'মাতাজী' নাম দিয়েছে। নয়ন প্রায় তিনদিনের রাস্তা অভুক্ত অবস্থায় কাটিয়েছে। যেমন ভাবে এসে বসেছিল ঠায় সেই একভাবে বসে আছে। এই অবস্থাতে সে গাড়ির অন্যান্য যাত্রীদের সুখ সুবিধে তদারক করে আসছে।

সারা রাত্তির না ঘুমিয়ে ভোরের দিকে তার একটু তন্দ্রা এসেছিল। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। বাইরে তাকিয়ে দেখলে রেল লাইনের দুধার দিয়ে যতদূর চোখ যায় সমস্ত আকাশ জুড়ে মেঘ নেমেছে। রেল লাইনের ঠিক নীচেই জলের ধার ঘেঁষে ধান রোয়া হয়েছে।

আবার বাঙলাদেশ, আবার কলকাতা। নয়নের সমস্ত মনটা গান

করে ওঠে। এতো শুধু বাঙলাদেশ প্রীতি নয়। এ তার নিজেকে ভালবাসা, নিজের অতীত ভবিষ্যৎকে ভালবাসা, যে ভালবাসা থেকে সে নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে বাইরে একবছর কাটিয়ে দিয়ে এল।

নয়ন উঠে হাত দিয়ে তার এলোমেলো চুলগুলো ঠিক করতে করতে ভাবলে এই একবছর একেবারে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন করে সে থাকল কী করে?

তার ছোট মামার শেষ চিঠির কথা মনে পড়ল। ছোট মামা ভুয়ো ভুয়ো করে তাকে বলেছেন, সে যেন কোনক্রমেই আশ্রম না ছাড়ে, তার জন্যে মাসে মাসে যা পাঠানোর ব্যাপার তা তিনি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন দেবেন ইত্যাদি। প্রকারান্তরে অবশ্য জানিয়ে দিয়েছেন, আশ্রমের বাইরে এলে তাঁর সমস্ত সহানুভূতি হারাবে নয়ন।

নয়ন গত তিন বছরের ঘটনা একবার নাড়া চাড়া করে দেখে। না, গুরুচরণের সঙ্গে যে ব্যাপারটা গত তিন বছর আগে হয়েছে সেটা একেবারেই মুছে গেছে মন থেকে।

কারণ এটা তো শুধু তিন বছর আগের একটা ঘটনা নয়। অন্তর দুতিন বছর বয়স হবার পর থেকেই অর্থাৎ তার বিবাহিত জীবনের প্রায় সবটা জুড়েই এই ঘটনা। গুরুচরণ প্রথম দিকে তো এরকম ছিল না। গুরুচরণদের পৈতৃক বাড়িতে ঝাড়লণ্ঠনের মৃদু আলোয় স্বামীর কয়েকটা ছবি নয়নের মনে উঁকি ঝুঁকি দিয়েই মিলিয়ে যায়। না, বাইরে মেশামেশি করতে না দেওয়া নয়ন সহ্য করতে পারত। নয়ন তো সহ্য করেই ছিল, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। ভালবাসা থাকলে সে শেখের বিবিও হতে পারতো। কিন্তু যেখানে মনের কোন সম্পর্কই ছিলনা সেখানে ফিরে যাবার কথা স্বপ্নেও মনে হয় না নয়নের। গুরুচরণ তার জীবনে একটা স্মৃতি মাত্র এবং তাও মৃত স্মৃতি, তার কোন তাপ নেই।

নয়ন একজনকেই ভালবেসেছিল, তার বাবাকে। সেই বিশাল লম্বাচওড়া চেহারা, দিলদরিয়া আড্ডাবাজ, রঙ্গপ্রিয়, বেহিসেবী খরুচে লোকটিকে সে ভালবেসেছিল। তার সমস্ত প্রশ্নই ছিল বাবার কাছে, সমস্ত চিন্তাই ছিল বাবাকে জুড়ে। বাবা মারা যাবার পর এসংসারের দিকে তাকিয়ে একবারও মনে হয় না যে এরকম একটা লোকের অস্তিত্ব কোন দিন এ সংসারে ছিল।

সাধারণত তখনকার দিনে যা হোত তার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। গুরুচরণ এখন খয়া, খিটখিটে ভেঙ্গেপড়া চেহারা কিন্তু তখন নেহাৎ মন্দ ছিল না। নয়নের বাবা অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে তাকে বাড়িতে রেখে পড়িয়েছেন। আর তার পৈতৃক সম্পত্তির গল্প শুনে বিয়েও দিয়ে দিয়েছেন।

নয়নের বিয়ে যখন হয় তখন তার বয়স তেরো, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে তখন সে বুট পরে ক্রিকেট খেলত, বিয়ে হবার পর প্রায় একবছর গুরুচরণ নয়নকে সঞ্চয়িতা পড়িয়েছে, তারপর ধীরে ধীরে তার পৈতৃক বাড়ির বাসনকোসন থেকে আরম্ভ করে বিরাট লাইব্রেরীর বই একে একে বিক্রী করেছে। বিয়ের তৃতীয় বছরের পর নয়নকে দেখা গেল গুরুচরণের বৈঠকখানার একটিমাত্র ঘরে। মামলায় হেরে গিয়ে বাড়ির সমস্ত অংশ বিলিয়ে দিয়ে গুরুচরণ সম্পূর্ণ অন্য একটি ব্যক্তি হয়ে নয়নের কাছে এল। আর নয়নের চরিত্র থেকে যে যে বস্তু একেবারে তফাৎ ঠিক সেই সেই বস্তুর প্রতিমূর্তি হয়ে তার স্বামী এল তার কাছে।

এরপর চলল বছরের পর বছর ধরে বাহাদুরী নেবার পালা, ভাল স্ত্রী হবার জন্যে মরীয়া চেষ্টা। না খেয়ে না পরে, তার বাবার কাছ থেকে মাসে মাসে একটা মোটা মাসোহারা স্বামীর কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করে সে কাটিয়ে দিল দশ বছরের ওপর। যেবার

মাসোহারা আসতে দেরী হোত সেবার গুরুচরণ আরো অসহ্য হয়ে উঠত। কিন্তু ততদিনে অন্তু আর মান্তা দুজনেই বড় হতে সুরু করেছে। নয়নের আশা হোল তার জীবন হয়ত একেবারে ব্যর্থ হবে না।

এরপর বাবা মারা গেলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের পরিবারে অন্যান্য অনেক বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের মতই এক রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে গেল। তাদের কালীঘাটের বাড়ি বিক্রি হয়ে গেল। চার ভাইয়ের মধ্যে এবং বাবার দেনা শুধতে সে বাড়ির টাকা তলিয়ে গেল। মা রইলেন ভাইদের দাক্ষিণ্যে, যে জামাইবাবুকে বাবা লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছেন সেই নদিদির স্বামীর বাড়িতে কালীঘাটে, বছরের অর্ধেকের ওপর নয়ন কাটাতে লাগল তার বড়ছেলেকে নিয়ে। মা তাকে কাশীবাসী হবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেছে বারবার। কিন্তু সে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে রাজী হয় নি।

তারপর মাও মারা গেলেন বছর দুই হোল। স্বামীর সঙ্গে থাকা চলল না। অন্তু কলকাতার বাইরে ছিল। পাটনায় এক সরকারী দপ্তরে চাকরী নিয়েছিল। অন্তু এখানে এল একটা নড়বড়ে কোম্পানীর স্টেনোগ্রাফার হয়ে। কিছুদিন থাকার পরই নয়ন বুঝলে তার নিজের ভার আছে, আর এ ভার নেবার মত শক্ত কাঁধ অন্তুর এখনও তৈরী হয়নি। তারপর বোম্বাই থেকে ঝড়ের মত আর এক ছেলে মান্তা এসে হাজির। তার ফিল্মে নায়ক হবার অভিযান শেষ হয়েছে। মান্তা এক ঘরে থাকতে পারে না, তার আরও ঘর চাই, যে কোন কথাতেই খিটি-মিটি লেগে যেতে থাকে। এ অবস্থায় ছোট মামার পণ্ডিচেরী যাবার উপদেশ। মার মতে মত দিয়ে কাশীবাসী হবার রাস্তার মতই নিজেকে আত্মবিসর্জন দেওয়া মনে হলেও নয়ন ভাবলে, তার নিজের তো একটা সুরাহা হয়ে যাবে। সে তো আর কারুর ভার হয়ে থাকবে না।

কিন্তু আশ্রমে পা দিয়েই নয়ন তার ভুল বুঝতে পেরেছিল। মানুষ শুধু কুকুর বেড়াল নয়। তাকে যত্ন আত্তি করলেই সে বাঁচে না। আশ্রমে নয়নের খাবার পরার কোন কষ্ট ছিল না, কিন্তু অহরহ তার গায়ে কাঁটা ফুটত। শেষের কয়েকমাস প্রায় খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল, রাত্তিরে ঘুমোতে পারত না। ঘুমোলেই তার আগের জীবনের কথা মনে পড়ত। বিয়ের পর কয়েকটা দিনের নির্ভাবনার ছবি। বারান্দায় মেজের সামনে অন্তু তার ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে পড়ছে। মাঝে মাঝে নিজের বাবার ওপর ভয়ানক রাগ হোত। বাবা মারা যাবার সময় কেঁদেছিলেন, তোকে জলে ফেলে দিলাম। কিন্তু নয়নের তো তখনও অনেক কম বয়স ছিল, বুকভর্তি আকাঙ্ক্ষা ছিল, বাবা তার বন্ধু হিসেবে কি অন্য কোন রাস্তা তুলে ধরতে পারতেন না? অন্তত এরকম খোঁড়া হয়ে থাকার জ্বালা থেকেও তো মুক্তি দিতে পারতেন!

মেল খড়্গপুর পার হোল। স্টেশন পার হতেই নয়ন দেখলে দূরে বাঁশের ঝাড়ের ওপর মেঘ নেমেছে। ট্রেনের ভেতর থেকে কে এক ভাঙ্গা গলায় ভজন গাইছে। নয়ন ভাবলে, সে যা নয় তা আর হবার চেষ্টা করবে না। স্বামীর সঙ্গে সে অভিনয় করতে পারে নি, ধর্মের সঙ্গেও নয়। তবু তো তার ছেলেরা আছে। মান্তা বরাবরই চোয়াড়ে প্রকৃতির, বাপের কাছেই সে মানুষ। কিন্তু অন্তু হয়তো তাকে বুঝবে। হয়তো বাড়ির আর সবাই হাসবে। নদিদি হাসবে, নদিদির স্বামী তারিণীবাবু হাসবে, ছোটমামা হাসবে, তার অন্যান্য ভাইয়েরা হাসবে, কিন্তু অন্তু নিশ্চয় হাসবে না। সে যদি আবার দাঁড়াতে চায় তাহলে অন্তু নিশ্চয় তার পাশে এসে দাঁড়াবে।

আর একজন হাসত না, কিন্তু সে কোথায়?

নয়নের হঠাৎ গোপালের কথা মনে পড়ে। একটা ঝোড়ো

আবহাওয়ার মধ্যে সে গোপালকে দেখে এসেছে। এখন সে কোথায়, কি করছে? নয়নের কলকাতা আসতে এত দেরী হচ্ছে কেন?

এই একবছরে অন্তু আর গোপাল পাশাপাশি এই দুটো মুখ ভেসে উঠেছে তার মনে। গোপাল যখন কলেজ থেকে বেরিয়ে রাজনীতি সাহিত্য সুরু করলে তখনকারই গোপাল না, তার আরো দুতিন বছর আগে গোপাল সেই যেবার তাদের বাড়ি প্রথম এসেছিল তখন থেকে গোপালকে সে দেখে আসছে। অন্তুর কলেজের অন্যান্য বন্ধুরা সবাই একে একে মিলিয়ে গিয়েছে কিন্তু গোপাল মিলায় নি। কোন দিন সে চেঁচিয়ে বন্ধুত্বের কথাও বলে নি। প্রথম প্রথম নয়নের সঙ্গে মাথা নীচু করে কথা বলত। তারপর তার লজ্জা কেটে গিয়েছে। ইদানীং অবশ্য সে বেশী আসত না। পণ্ডিচেরী যাবার আগে নয়ন একবার ভেবেছিল তার সঙ্গে দেখা করে আসবে। কলেজের ফার্স্ট ইয়ার থেকেই গোপাল বয়সের তুলনায় অনেক গম্ভীর ব্যাপারে ঘাড় নাড়িয়ে মন্তব্য করত, আর নয়নের শুনতে বড্ড ভাল লাগত গোপালের কথা। কিন্তু তার কাছে যেতে নয়নের অস্বস্তি হয়েছে। সে প্রায় উপায়হীন হয়ে পণ্ডিচেরী যাচ্ছে, এতে গোপালেরই বা কী করার আছে, ভেবে পায় নি।

জলের ছাঁট এসে লাগায় নয়নের চিন্তায় ছেদ পড়ে। গাড়ি সাঁতরাগাছিতে আসতে না আসতেই প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। জানলা বন্ধ অবস্থায় গাড়ি যখন হাওড়ায় এসে পৌছল তখন মুষল ধারে বৃষ্টি চলেছে। অসংখ্য যাত্রী, কুলির মাঝখানে ঘণ্টাখানেক প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে নয়ন অপেক্ষা করতে থাকে। তারপর তার টিনের সুটকেশ আর একটা পুঁটলী বগলে নিয়ে বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে এগোয়। বাস থেকে নেমে দেখলে রাসবিহারী এভিনিউ-রসা রোড়ের মোড় পার

হতেই জল থই থই করছে। নয়ন জল ঠেলে কালীঘাটে তার দিদির বাড়িতে এসে ওঠে।

আগে সে কোন খবর দেয় নি। একেবারে কোন খবর না দিয়ে চলে আসায় নদিদি একটু বিরক্ত হন। অবশ্য মনে মনে একটু খুশীও হয়ে ওঠেন। নয়ন সুনিপুণ রান্না করে, তার আসা মাত্রই রাঁধার লোকটিকে ছাড়িয়ে দেওয়া যাবে। নদিদির চেহারা দেখে মনে হয় না যে নয়নের বোন। তার রঙ ফর্সা, কিন্তু মুখ চোখ থেকে গলার স্বর পর্যন্ত সব আলাদা, নদিদিকে দেখে মনে হয় তিনি হিসেবের বাইরে একটা কথা বলতেও রাজী নন। নয়নকে উঠোন পার হতে দেখেই বেরিয়ে এসে বললেন, "আবার যখন ফিরেই এলে তখন এত লোক হাসানো কেন ?"

তারিণীবাবু বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনিও প্রথমে চমকে উঠেছিলেন। পর মুহূর্তেই খুশী হয়ে উঠলেন, নয়ন থাকলে পান থেকে আরম্ভ করে হাতে জল দেওয়া পর্যন্ত সবই নয়ন নিজে যেচে করে। সে অন্যকে যত্ন না করলে বাঁচতে পারে না, তার ওপর যেটা সব চেয়ে সুবিধে, সে খুব কম খায়। তারিণীবাবু শুভাকাঙ্খীর গলায় বললেন, "তখনই বলেছিলাম তোমাকে। ওসব আশ্রম টাশ্রমে থাকার মন তোমার নেই। আমার কথা তো শুনলে না।"

নয়ন ধীরে ধীরে বললে, "আচ্ছা তারিণীদা, অন্তুর সঙ্গে কি তোমার কোনদিন দেখা হয়েছে ?"

বেঁটেখাটো তারিণীবাবুর মুখটিতেও হিসেব ছাড়া কিছু নেই। তিনি এক পা এগুলে দু পা পেছোন। অন্তুর প্রসঙ্গ উঠতেই দুহাত তুলে বললেন, "তোমার ছেলেদের খবর স্বয়ং ভগবানই রাখেন না। আমি কি করে জানব ?"

তারপর নয়নের পথশ্রমে ক্লান্ত মুখখানার দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের

জন্যে তাঁর হিসেবের জগতের বাইরে এক পা বাড়িয়ে বললেন, "ঐ তো শুনছিলাম কে বলছিল, বাসা টাসা তুলে দিয়েছে। এখন আবার হ্যারিসন রোডের কোন মেসে আছে। তোমার ছেলেদের যা কাণ্ড!"

নয়ন ব্যথা পায়। তার ছেলেরা অপারক হোক্ কিন্তু তাদের এ ভাবে খোঁটা দেওয়া তার কাছে অসহ্য লাগে। উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, "কী কাণ্ড হোল?"

"ঐ তো মেসওয়ালী না কে একদিন এসেছিল। অন্তু নাকি কয়েকমাস তার মেসের চার্জ দেয় নি। কোত্থেকে ঠিকানা জেনেছে। আমি বলে দিয়েছি ওসবের মধ্যে নেই।"

নয়নের অসোয়াস্তি লক্ষ্য করে বললেন, "তা তুমি এসেছো, কদিন থাকো, এসেই একেবারে ছটফট শুরু করেছো।" একটু সান্ত্বনাও দিলেন, "অতো ভাবনা কি? তিন কাল তো পারই করে দিলে!"

তারিণীবাবু মক্কেলদের কাছে চলে যান। নদিদি তাঁর মেয়ে জামাইয়ের জন্যে টিফিন কেরিয়ারে করে খাবার বেঁধে নিয়ে বেরোন। নদিদির মেয়ে-জামাই-অন্তপ্রাণ। তাদের বাড়ির লোকের অসুখ হলে এখান থেকে খাবার যায়।

বাইরে থমথম করছে আকাশ। তারিণীবাবুকে খাবার দিয়ে পান দিয়ে নয়ন চুপটি করে বারান্দায় এসে বসে। তারিণীবাবু কোর্টে যাবার পর সমস্ত বাড়ি খালি হয়ে যায়। আর নয়নের ছেলেমানুষের মত চোখে জল আসে। সে তার জায়গায় ফিরে এসেছে অথচ কোথায় তার জায়গা? স্বামীর ঘরে তার জায়গা হয়নি। আশ্রমে হয়নি। অন্তু একমাত্র সম্বল কিন্তু সেও কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাহলে তার জায়গা কোথায়?

হঠাৎ পেছনে খস খস আওয়াজে নয়ন চমকে যায়। ওপরের উকিলবাবুর নাতি, নয়ন তাকে বড়বাবু বলে। কোঁকড়া চুল, পাঁচ ছ

বছরের ছেলেটি অনেকক্ষণ থেকে তাকে দেখছে। নয়ন বললে, "এই যে বড় বাবু যে!"

বড়বাবু এগিয়ে এসে নয়নের কোলে মাথা রেখে বললে, "তুমি আর চলে যাবে না ছোড়দি, বল যাবে না"।

নয়ন ছেলেটিকে কোলে তুলে নেয়। কলকাতায় একমাত্র বড়বাবুই তাকে ডেকে নিলে। তার গলা ভারী হয়ে আসে। বড় বাবুর চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, "না, আর না বড়বাবু।"

দশ

অঝোরে বৃষ্টি নামে।

প্রথম কয়েকদিন সন্ধে হতে না হতেই আকাশ আঁধি করে আসে, মেঘ জমে, বৃষ্টি যত না হয় তার চেয়ে ধূলো ওড়ে অনেক বেশী। তার পর কয়েক দিন থম থম করতে থাকে, গুমোট লাগে, হাওয়ায় হল্কা না থাকলেও ঘামে গা ভিজে যায়। জুন মাসের মাঝামাঝি পেরোতে না পেরোতেই আকাশের চেহারা বদলে যায়। বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভাঙ্গে। মেঘলা দুপুরে সূর্যের তেজ নিভে যায়, পশ্চিমের আকাশের রঙ ছাপিয়ে মেঘ জমে। সন্ধে হতে আবার বৃষ্টি শুরু হয়। আর সমস্ত সহর যেন বাদলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস ফেলে। কোথায় খবরের কাগজে বান ডাকে, গ্রাম ধুয়ে মুছে যায় থই থই জলে, বন্যাপীড়িত লোকজনের সাহায্যের জন্যে আবেদন ছাপান হয়। কলকাতায় এক হাঁটু জল জমে। আর সেই ঘোলা জলে ঢেউ তুলে দোতলা বাসগুলো স্টিমারের মত জল কাটতে কাটতে চলে যায়। জলে জলাকার সেই কলকাতার দিকে তাকিয়ে মাস খানেক আগের ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে পিচগলা রাস্তার ছবিগুলো মন থেকে মুছে যায়। কলেরা-বসন্ত উপক্রুত শহরে বিরাট সান্ত্বনার মত বৃষ্টি পড়তে থাকে।

বৈষ্ণব কাব্যে জলের শব্দের সঙ্গে কবিরা যুক্ত করেছেন প্রতীক্ষা। আর সে প্রতীক্ষায় জলে ভরা আকাশের মতই সমস্ত মন ফুঁসতে থাকে, বৈষ্ণব কবিদের ভাষায় ছাতি ফেটে যায়। কিন্তু প্রতীক্ষা মানেই তো এলোমেলো হাওয়ায় বুক চাপড়ানি নয়। কোন মানুষের জন্যে সেই প্রতীক্ষা, যাকে কেউ চেনে, জানে, চলতি কথায়, যাকে কেউ ভালবাসে। কিন্তু যার সেরকম কোন লোক নেই সে আবার প্রতীক্ষা করবে কেন? যাকে একেবারে খরচের খাতায় তুলে দেওয়া হয়েছে, যাকে তারিণীবাবুর মত ধারে কাছে আশেপাশের বিচক্ষণ অবিচক্ষণ সব লোকই বলে দিয়েছে মাত্র এক কাল আছে তিনকাল গিয়ে, তার সেই এক কাল সাজাবার জন্যে কেন এই নিবিড় প্রতীক্ষা করে থাকবে সে?

নয়ন প্রতীক্ষা করে অন্তুর জন্যে। অন্তু আসবে, আবার সে সংসার বাঁধবে। এক একবার সন্দেহ হয়। অন্তুর যে একেবারে কোন সাড়ই নেই, গত তিন বছরের আর্থিক অনিশ্চয়তার জ্বালা-পোড়ানিতে সে যে শুকিয়ে খ্যাংরা হয়ে গিয়েছে। তার গোড়ায় জল দিলেও সে কি বেঁচে উঠবে! আর তার ছোট ছেলে, তার ওপর তো কোন ভরসাই করা যায় না। তার মতির কোনই ঠিক নেই। কিন্তু যদি অন্তু নাও দাঁড়ায়, যদি হাজার জল ঢেলেও শুকনো গাছ সঞ্জীবিত না হয়, তাহলে? তাহলে কি আবার পণ্ডিচেরী, কাশী? নয়নের বুক ঠেলে প্রতিরোধ উঠে আসে, কালো মেঘের মত থমথম করে তার বুক, যেন এখনই ফেটে পড়বে। নয়ন চুল এলো করে জানলার শিক ধরে প্রতীক্ষা করে।

বারে বারেই আর একজনের কথা মনে হয়, গোপালের কথা, কিন্তু বারে বারেই সে নিজেকে শাসন করে। এ ভাবে প্রার্থীর মত, ভিখিরীর মত, একটা সমস্যার বাণ্ডিল হয়ে সে আছড়ে পড়তে পারবে

না গোপালের ওপর। একদিন সে সন্ধের পর বেরিয়েছিল। অন্ধকারে গোপালের বাড়ির নীচে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। তেতলার পরিচিত ঘর খানায় আলো জ্বলে, চেনা সিঁড়ি হাতছানি দেয়। কিন্তু নয়ন সংযত করে নিজেকে। না, সে যাবে না, শুধু সহানুভূতি কুড়োতে সে গোপালের কাছে যাবে না।

তারিণীবাবুর বাড়ির পাশেই একফালি খোলা জমি কী ভাবে ফাঁকে তালে এই চার দিকের বাড়ির দৌরাত্ম্যেও সতী আছে। তারই এক কোণে চৌবাচ্চার ধারে রক্ত করবীর ঝাড়। পাশেই জাম গাছ, আর নীচে একটা বাঁশের চাঁছের দোতলা থেকে দিন রাত্তির এক পাগলী চীৎকার করে: "ওরে আমার সোনা, সোনারে"। ছেলে মারা যাওয়ায় সে পাগল হয়েছে, মাঝ রাত্তিরে কখনও কখনও তার চীৎকার তীব্র হয়ে ওঠে, কানে এসে বাড়ি ছ্যায়। তারই সঙ্গে ভেসে আসে কেওড়াতলাগামী শ্মশান মিছিলের হরিধ্বনি। পাগলীর বুক চাপড়ানি এক একদিন যখন খুব বাড়ে তখন উল্টোদিকের বন্ধ দরজা থেকে নদিদির রুক্ষ গলার আওয়াজ আসে, "মরনা মরনা, সোনা তো অনেক দিন মরেছে, তুইও মর।"

নয়ন চুপ করে থাকতে পারে না। মাঝ রাত্তিরেও নদিদিকে বলে, "ছি, কী বলো নদিদি। আমরা মা নই?"

নদিদি গজরাতে থাকে। সে নয়নের নাগাল পায় না। এত বড় দাপট গেল নয়নের ওপর দিয়ে, কিন্তু তার মেজাজের একচুল এদিক ওদিক হোল না। ছেলেবেলায় সে যেমনটি ছিল ঠিক তেমনটি আছে।

পরদিন মেঘলা দুপুর। তারিণীদার এক শাঁসাল মক্কেল এক হাঁড়ি মাগুর মাছ দিয়ে গিয়েছিল। নয়ন শুধু ডাল দিয়ে ভাত খেয়েছে। নদিদি রাগ করে বললেন, "তোমার নিজের নেই ঠাঁই, তার ওপর ঢং দেখে বাঁচি না।"

কিন্তু নয়ন সত্যিই খেতে পারে না। এ মক্কেলটিকে খুনের কেস নিয়ে আসতে এ বাড়িতে সে কয়েকবারই দেখেছে। এই কদাকার আত্মতৃপ্ত মফঃস্বলের লোকটি একবার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে তারিণীবাবুকে বলেছিল, "আমাদের আর কোনও কাজ নেই স্যার। আমরা খালি 'মার্টার' করতে পারি।" আর তারিণীবাবু যিনি সচরাচর হাসেন না তিনিও তার কথায় বাচ্চা মেয়েদের মত ফিক ফিক করে হেসেছিলেন।

নদিদির শরীর খারাপ না হলে খোঁচা দিয়ে কথা বলেন না। তবে মাগুর মাছের লেজা চিবুতে চিবুতে তাঁর হঠাৎ অকারণ রাগ হয় নয়নের ওপর। বলেন, "এতে তোমার জামাইবাবুর দোষ কী বল? দেশে আইন কানুন আছে, শাসন আছে। উনি তো বে-আইনী কিছু করছেন না।"

আইনটা এ বাড়িতে এমন পরম ব্রহ্মের মত যে চট করে নয়ন কোন জবাব খুঁজে পায় না। স্বামী তার খুনের কেস করতেন না অন্যরকম পট্টি দিতেন। তাতেই সময় সময় বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠত নয়নের। আর যে লোকটার হাত থেকে রক্ত ঝরছে আর তা জেনে-শুনে তারিণীবাবু যখন তাকে নির্দোষ খাড়া করবার জন্যে সারা সকাল পাখী পড়ান তখন রাঁধতে রাঁধতে নয়নের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

নদিদি আর নয়ন! দুটি বোনের চেহারা মেজাজের বৈপরীত্য এক বিস্ময়। এদের ওপরের বোনটি ছেলেবেলায় মারা যায়। আর বড়দি কলকাতার বাইরে। চেহারা মেজাজে এই দু বোনের ভেতর কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। দুজনের খালি একটাই মিল। এ বয়সে যা সচারচর হয়ে থাকে, সেই রকম কুতুলী হয়ে পড়েন নি। নয়ন ছিপছিপে ঢ্যাঙ্গা, বয়সের তুলনায় অনেক হালকা। নদিদির অবশ্য পরিবারের ভেতর সুন্দরী খ্যাতি ছিল। যদিও একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় তাঁর বড় বড় চোখ দুটিতে কোন ভাষা নেই, প্রায় মরা মাছের

চোখের মত। তাঁর জীবনের প্রধান সুখ একটু গড়িয়ে নেওয়া। সময় নেই অসময় নেই, একটা ঢালা বিছনা পাতাই থাকে। সকালে ভাত চাপিয়ে দিয়ে পা ওপরের দিকে তুলে একটু গড়িয়ে নিলেন নদিদি। উঠতে বসতে নয়নকে বলেন, "এক্কেবারে মেম সাহেব, কী করেই বা আমাদের ঘরে জন্মেছিলি।"

মেম সাহেব কেন বলেন, তা তিনিই জানেন। দুখানি শাড়ী বাড়িতে ধবধবে স্টীম লণ্ড্রীর মত কেচে নয়ন একটা বছর কাটায়। সে সব সময় ফিটফাট ঝকঝকে। মাদুরের উপর চাদর মুড়ি দিয়ে সে যখন তার পুঁটলীর ওপর কাত হয়ে শুয়ে থাকে তখন তার মুখের প্রশান্তি দেখে মনে হবে সে পালঙ্কে শুয়ে আছে। নয়নের এই সাচ্ছন্দ্য, এই তেজ, কোন কিছুকে পরোয়া না করেও খুশী হওয়া—এ সবগুলো নদিদির কাছে ঢং কিংবা পাগলামী বলে মনে হলেও তিনি নয়নকে মনে মনে ভয় করেন।

মুখ ধুয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে নদিদি বললেন, "আর আমাদের কটা দিন? তোমার জামাইবাবু তো বলছিলেন এবারে সব আমাদের মামলা মোকদ্দমার পাট উঠবে।"

নয়ন বিস্মিত হয়ে বললে "কেন নদিদি?"

"বাঃ উঠবে না। শুনছি জমিদারী নাকি উঠে যাচ্ছে। তাহলে কারা আর মামলা করবে? জোতজমি থাকলেই না লোক মামলা করে। আর ওনারা তো মাগনাতে মামলা করবেন না।"

নয়ন ভাবলে, কারুর সর্বনাশের উপর দিয়েই কি সব সময় পৌষ-মাস আসবে? কেন, এমনিতে কি পৌষ মাস আসে না?

নদিদি খেয়ে দেয়ে দরজা দিলেন। এ সময় কেউ চেঁচিয়ে কথা বললেও তিনি বিরক্ত হন। ঘুমোবার ব্যাপারে তিনি স্বামী ছেলেমেয়ে কারুর তোয়াক্কা করেন না। অনেক রাতে যখন গানের জলসা সেরে

নদিদির ছেলে দরজা ধাক্কা দেয় তখন নয়নকেই দরজা খুলে দিতে হয়।

নয়ন চশমা লাগিয়ে পড়তে শুরু করে, সম্প্রতি খালি চোখে তার পড়তে অসুবিধে হচ্ছে। গীতার যে অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন পার্থকে, স্বজন হত্যাও পাপ নয় যদি তা কর্তব্য হয়, সেই খানটা এসেই নয়নের সব ওলোটপালট হয়ে যায়। ছেলেবেলাতেও তার এমনি হোত। মাস্টার মশাইয়ের সামনে পড়তে পড়তে সে হঠাৎ বইয়ের সম্পর্ক থেকে অনেক দূরে গিয়ে এমন সব বেখাপ্পা প্রশ্ন করে বসত যে মাস্টার মশাই শেষ পর্যন্ত তার নাম দিয়েছিলেন পাগলী। নয়ন হঠাৎ কোথায় তলিয়ে গিয়ে ভাবতে থাকে, কর্তব্য কি, অকর্তব্য কি ? সে যদি এখন কাউকে ভালবাসে তাহলে কি তা কর্তব্য হবে ?

"আপনি কি অন্তুর মা ?"

হঠাৎ দারুণ ভাবে চমকিয়ে উঠল নয়ন। তার মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করে ওঠে, মনে হোল তার একান্ত নিজস্ব কথাগুলো যেন চার দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। দুটো হাত মুঠি করে টান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে কতক্ষণ।

এবারে নারীকণ্ঠের আওয়াজ একেবারে খন খন করে উঠল, "কেন এটাই তো তেইশের বি, তাহলে কি এও ভুল দিয়েছে !"

নয়ন এবার তাকিয়ে দেখে ভদ্রমহিলাটিকে। কুঁচকানো তোবড়ানো এক প্রৌঢ় ভদ্রমহিলা, বুক পিঠ প্রায় এক, চুল সামনের দিকে একেবারে পড়ে যাওয়ায় লম্বা মুখখানা আরো বিসদৃশ, প্রায় পুরুষ বলে ভুল হয়।

নয়ন বললে, "আমিই অন্তুর মা, কী চাই বলুন।"

নয়নের শান্ত সমাহিত গলার আওয়াজে ফেটে পড়লেন তিনি, "কী চাই ? কী চাই আবার ? টাকা, টাকা। টাকা ছাড়া কী চাইবার আছে আপনার কাছে ?"

"কিসের টাকা ?"

"কিসের টাকা! বাঃ আপনার ছেলে বলে নি, না তাও চেপে যাচ্ছেন," ভদ্রমহিলা মাঝে মাঝে হাঁপান আর চীৎকার করেন আঙুল নাড়িয়ে, "আটমাস দুধকলা দিয়ে সাপ পুষেছি, জানেন? ফণীর মাথায় মণি থাকে জানতাম, কিন্তু সে যে এমন ধারা ছোবল মারবে তাতো জানিনে।...আবার ঢং করে' জেঠিমা বলত। শুনতাম সে নাকি পড়াশোনা করেছে, চরিত্তির আছে। তা একেবারে লজ্জার মাথা খেয়েছে? আর পাঁচজনের মত বাক্স তোরঙ্গ রেখে...ছিঃ ছিঃ। কেন, ভিক্ষে করতে জানতো না? আমরা তো ভিক্ষেও দিই। চাইলে ও কটা টাকা হাতেই না হয় তুলে দিতাম।"

নয়নের হাত পা কাঁপছিল। হ্যারিসন রোডের এই মেসওয়ালী তারিণীদা পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল। ধীরে ধীরে বলে, "কত টাকা বাকী আছে?"

"দুশো চল্লিশ। কেন, দিতে পারবেন?"

নয়ন মাথা না নীচু করেই বলে, "অত টাকা—একসঙ্গে আমার পক্ষে........."

ভদ্রমহিলা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেন, "তাই বলুন, আমি ভাবলাম যখন অতো তেজ দেখিয়ে বলছেন........."

নয়ন চুপ করে থাকে। শান্ত দৃষ্টিতে সামনের জামগাছের বর্ষাস্নিগ্ধ পাতার ঝাড়ের দিকে চোখ রেখে বলে, "আপনি এ্যাদ্দুর থেকে এসেছেন, একটু জিরিয়ে নিন।"

একখানা চটের আসন পেতে নয়ন ভদ্রমহিলাকে বসতে বলে। তারপর বললে, "আমি আমার ছেলেকে ছোট করতে চাই না। কিন্তু টাকা না থাকলে আমি খোলাখুলি বলতাম। পালিয়ে যেতাম না।"

তারপর ঘরের মধ্যে উঠে গিয়ে একটা টিনের কৌটোর মধ্যে থেকে ঝেড়ে পুঁছে পয়সা গুনে গুনে পাঁচটা টাকা জোগাড় করলে। আগেও

সে সেলায়ের কাজ করত। কলকাতা আসা অবধি সে এক সেলাইয়ের স্কুলে যোগ দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে এ দিক সেদিক থেকে একটা দুটো কাজের অর্ডারও পায়। সেই রেজগিশুদ্ধ টাকাগুলো ভদ্রমহিলার মুঠোর মধ্যে দিয়ে অস্থির ভাবে নয়ন বললে, "এ টাকাটা খুবই সামান্য। তবু আমার রোজগারের টাকা। যে ভাবেই হোক আপনার টাকা আমি মাসে মাসে শোধ করব। মিথ্যে বলছি না।"

ভদ্রমহিলা হঠাৎ অপ্রস্তুত বোধ করেন। রাগে ফুলতে ফুলতে বাড়ি বয়ে অপমান করতে এসেছিলেন। কিন্তু নয়নের স্বাভাবিক ভদ্র ব্যবহারে তিনি যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন। পায়ের নীচে আসনের দিকে বিমূঢ় ভাবে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ, তারপর ধপ করে আসনের এক কোণে বসে পড়েন। আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ভাঙ্গা গলায় বলেন, "আপনি বুঝবেন, আপনি ঠিক বুঝবেন, আপনি তো ছেলের মা। একেবারে শুয়োরের পাল যত পেটে ধরেছি।"

নয়ন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। ভদ্র মহিলার সমস্ত চীৎকার কোথায় এক ফুঁয়ে উড়ে গিয়েছে।

প্রাণহীন ভাবে নিচু গলায় বলতে থাকেন, "বড়টা মাতাল, একেবারে লম্পট, মাঝে মাঝে দেখা দেয় আর বোনগুলোকে মার ধোর করে। মেজোটা নোট জাল করে জেল খেটেছে। একা একটা নাবালক ছেলের মুখ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি, হোটেল চালাচ্ছি। এত-গুলো মেয়ে। একটারও বিয়ে হয় নি।"

ভদ্রমহিলার চোখ একসঙ্গে নয়নের হাত আর সিঁথীর ওপর পড়ায় চুপ করে যান। একটু ইতস্তত করে বলেন, "অন্তর বাপ……"

নয়ন তার হাতের নোয়াটা ঘুরাতে ঘুরাতে তার সিঁদুরহীন সিঁথীর ওপর কাপড় টেনে দিয়ে বললে, "হ্যাঁ উনি বেঁচে আছেন।"

ভদ্রমহিলার গলা ভারী হয়ে ওঠে। বলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ আমায় আর

বলে দিতে হয় না। আমি বুঝতে পারি। আর কাকেই বা বলব। খোকার বাবাটিও যে বাবাজী হয়েছেন।"

এক আড়ষ্ট ব্যথায় ভদ্রমহিলার চোয়াল নড়ে উঠল। সংসারের জ্বালা পোড়ায় যে মুখ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, যে মুখের সাধারণত কোন পরিবর্তন নেই, সেই নির্মম, তীক্ষ্ণ মুখখানাও মোলায়েম হয়ে আসে। যাবার সময় হাতের মুঠোয় যা ছিল আসনের একদিকে ঠেলে দিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "আর কারুর জন্যে আমি করি না, কিন্তু অসুখে পড়লে আমি নিজে গিয়ে তার খাবার দিয়ে আসতাম। কেন পালাল ?"

নয়ন বারান্দায় বসে থাকে। ভদ্র মহিলাকে সে স্পষ্ট দেখতে পায়, হ্যারিসন রোডের একটা নড়বড়ে মেস, একগুচ্ছের বোর্ডার। মাথার ওপরে কেউ নেউ, আইবুড়ো মেয়ের পাল আর নাবালক ছেলে। আর ছেলে মাতাল, স্বামী বাবাজী।

চেঁচামেচিতে নদিদির ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। শুয়ে শুয়ে তিনি শুনছিলেন, এখন উঠে এসে তিরিক্ষে গলায় বললেন, "পাওনাদারকে আবার আসন বিছিয়ে বসতে দেয় কে ? যাক না কোর্টে, কেমন মুরোদ দেখি। ও সব মুখেই নবনবানি।"

আবার দ্বিতীয় দফা শয্যা নিলেন নদিদি। নয়ন বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলে আইনের ব্যাপারে নদিদিও পারদর্শী।

বিকেলে একলা চা খেতে মন কেমন করে নয়নের। অবশ্য এখানে ঠিক একলা না। তবে বৈঠকখানায় তারিণীদা আর তার মক্কেলদের জন্যে চা পাঠিয়ে দিয়ে শুধু নদিদির সঙ্গে একলা বসে চা খাওয়া তার অসহ্য। বিশেষ করে নদিদির মেয়ে খুকু যখন তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসে তখন আরও অসহ্য বোধ হয়। ফরসা ফ্যাকাসে খুকু বিয়ের বছর তিনেক যেতে না যেতেই একেবারে কমলা লেবুর ছিবড়ের মত

আবর্জনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। খক্‌খক্ করে দিনরাত কাশছে, নলি ওঠা হাত, সমস্ত সময় মুখ বিচড়িয়ে আছে, এ মানুষটার গায়ে গয়নার শোভা হবে কিসে নয়ন ভেবে পায় না। অথচ নদিদি আর তার মেয়ে একত্র হলে শাড়ীর পাড় আর গয়না ছাড়া আর কিছু আলাপ করে না।

সেদিনও বিকেলে খুকু এসেছিল। অবশ্য বেশীক্ষণের জন্যে নয়। নদিদি মেয়ে নাতি নাতনীদের নিয়ে সিনেমা দেখতে গেলেন, একটি হিন্দী মহব্বতের ছবি।

সন্ধের অন্ধকারে জানলার ধারে বসে একলা একলা চা খেতে খেতে নয়নের চোখের পাতা হঠাৎ ভারী হয়ে এল। ঠিক তার মনের মত খেলা-পড়া ভাবার সঙ্গী সে একজনকেই পেয়েছিল, সে তার বাপ। যতই কাজ থাক, নয়ন ছাড়া তাঁর চা খাওয়া হোত না। আর সেই প্রকাণ্ড লম্বা বড়ো লোকটা বিদঘুটে রসিকতা করতেও পারতেন। খুব একটা গুরুজনবোধ ছিল না, মেয়েদের সামনেও শাঁসাল খিস্তি থেকে তাঁর বিরাম ছিল না। সন্ধের পর ইজিচেয়ারে শুয়ে গড়গড়ায় টান দিতে দিতে মেয়ের কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার শ্বশুর বাড়ির খবর জানতে চাইতেন, তাঁর ধারণা তাঁর বিরাট স্নেহ দিয়েই তিনি মেয়ের সমস্যা মিটিয়ে দেবেন। নয়নের অস্বস্তি হোত, বলত, "কী হবে বাবা ও সব শুনে, প্রত্যেক সংসারেই কিছু না কিছু অশান্তি আছে।"

অমনি শান্ত হয়ে যেতেন ভদ্রলোক। ভাবতেন মাসোহারার অঙ্কটা বাড়িয়ে দেবেন কিনা জামাইয়ের মতি ফেরানোর জন্যে। সেই বাবা মারা যাবার সময় কার্বাঙ্কেল-ভরা বিরাট পিঠখানা অতি কষ্টে কাত করে নয়নের দুহাত ধরে বলেছিলেন, "একেবারে ভাসিয়ে দিলাম তোকে।" নিজে এত কষ্ট পেলেন মেয়ের দরুণ অথচ তাকে দাঁড় করানর জন্যে যদি একটু হাত বাড়াতেন। নয়ন ভাবছিল ইস্কুলে যে

শেলাইয়ের ক্লাসে তার জ্বর আসত সেই শেলাই শিখতে হবে এত দিনের পরে।

বাইরে খালি জমিটা দিয়ে কার পায়ের শব্দ আসে। অতি চেনা শব্দ, জমির সঙ্গে ঘষটে ঘষটে শ্লিপারের আওয়াজ। চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে নয়ন জানলার কাছে আসে। বর্ষার সন্ধে। রেডিয়োয় সেতার বাজছে, নয়ন আস্তে আস্তে ডাকলে, "কে, অন্তু"—

কর্কশ অথচ ক্লান্ত গলায় জবাব এল, "হ্যাঁ।"

ঘরে ঢুকেই অন্তু চাপা গলায় বললে, "দোর দিয়ে দাও।"

তার উদভ্রান্ত চোখমুখ দেখে নয়ন বললে, "কেন থাক না, কী হয়েছে তোর?"

বিরক্ত হয়ে অন্তু বলে, "কী আর হবে? দুটো ট্রাম বদলিয়ে এসেছি। সেই মেসওয়ালীটা গুণ্ডা লাগিয়েছে আমার পেছনে।"

ভয়ে আড়ষ্ট অন্তুর চেহারা। গত কয়েকদিন নিশ্চয় তার খাওয়া-দাওয়ার কোন ঠিক ছিল না। চোখমুখ বসে গেছে, চুলে তেল নেই, গালে দাড়ি, সমস্ত শরীরে অযত্নের চিহ্ন। কাপড়টা যেন কতকটা ইচ্ছে করেই হাঁটুর ওপর ঠেলে তুলেছে সে। দরজা এঁটে দিতে দিতে বললে, "নাঃ কলকাতায় আর থাকতে দিলে না দেখছি।"

নয়ন আস্তে আস্তে বললে, "মেসওয়ালী এখানে এসেছিল অন্তু। তুই তো তার সঙ্গে একবার দেখাও করতে পারতিস।"

অন্তু প্রায় লাফিয়ে উঠল, "এখানেও এসেছিল। উঃ, আর তুমি চাও আমি তার হাতে পড়ি। আমায় রাস্তায় গুণ্ডারা মারুক ধরুক তাই তুমি চাও।"

অন্তুর গলা চড়ে যায়। রাগে তার মুখ থম থম করে। বলে, "অন্যের মা-রা চায় কী করে ছেলেরা বিপদ থেকে বাঁচবে। আর তুমি চাও যত বোঝা চাপানো যায় তার মাথায়।"

বোঝা! কথাটা কাঁটার মত গিয়ে বেঁধে নয়ন-কে। স্বামী ছেড়ে সে ছেলের ওপরেই নির্ভর করেছিল। তার নিজের অক্ষমতার গ্লানিতে সে মরে যায়। কিন্তু আর কী ছিল সে সময় তার সামনে? সে কি সেই বোঝা সমানভাবে ভাগ করে নেয় নি তার ছেলের সঙ্গে?

শান্তভাবে বললে, "ভদ্রমহিলা দুঃখ করছিল তুই তার সঙ্গে দেখা না করে চলে এসেছিস বলে।"

"ওসব ভিটকেলী আমার অনেক জানা আছে।"

"ভিটকেলী হোক যাই হোক, এভাবে চোরের মতন কদ্দিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবি? তোর অবস্থা খোলাখুলি বল না তাকে। তাছাড়া স্টেনোগ্রাফি তুই ভাল জানিস, লিখতে পারিস। চেষ্টা করে দেখ না অন্তু। একটা চাকরী—"

অন্তু ঘুরে দাঁড়ায় নয়নের কথার মাঝখানে। ভাঙ্গা গলায় বলে, "কেন সবাই মিলে একটা মরা মানুষকে খোঁচাচ্ছো?"

"কেন মরতে যাবি?"

অন্তু চীৎকার করে উঠল, "এসব কথা কে শিখিয়েছে তোমায়? দিন রাত্তির কানের কাছে লেকচার দিও না মা, আমি পাগল হয়ে যাব।"

ব্যথায় অধীর হয়ে নয়ন বললে, "লেকচার কেন দেব অন্তু? তুই একটু শান্ত হয়ে বোস। আমি চা করি।"

চা করতে করতে নয়নের কত কথাই মনে পড়ে। ছেলেবেলার সেই অন্তু, গায়ে নীল ভেলভেটের জামা, দুষ্টুমি ভরা চোখ, একরাশ কোঁকড়া চুল। যখন সংসারে নতুন করে ঝড় উঠেছে, দেনার দায়ে সবকিছু বিকিয়ে অন্তুর বাপ প্রলয়কাণ্ড করেছে, তখন এই ছেলের দিকে তাকিয়েই তো সে বুক বেঁধেছিল।

নয়নের মা খুব ছড়া কাটতেন। কৃষ্ণনগরের মেয়ে, বুড়ী মরবার

শেষদিন পর্যন্ত তাঁর কথা বলার ঢং-এ পারিবারিক শতরকম দুর্যোগের আকাশেও ফুল ফুটিয়েছেন। একটা অসভ্য কথা যা নয়ন মুখে আনতে পারবে না, তার মা প্রায়ই বলতেন, "মার প্রাণ, না খান্‌কীর প্রাণ।" কেন বলতেন, নয়ন মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবে। বোধ হয় খানকীর বেঁচে থাকবার আকাঙ্ক্ষার মত মারও মা হবার আকাঙ্ক্ষায় কোন লজ্জা নেই।

অন্তু হঠাৎ ভুরু কুঁচকিয়ে বললে, "শুনছি শেলাইয়ের স্কুলে ঢুকেছো, গান শিখছো। তুমি কি নটী হতে চাও নাকি?"

এমনভাবে বলে অন্তু যে ঠিক হুস্‌হাবাশ করে উড়িয়ে দিতে পারে না নয়ন। ক্রমশ তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে একটা কথা। ষোল বছরের যে অন্তু দুচোখ-ভর্তি স্বপ্ন আর ভালবাসা নিয়ে তাকে লিখেছিল, তুমি চলে এসো মা কলকাতায়। আমার স্কলারসিপ আছে। তার ওপর ট্যুইশানি করছি। একটু চেষ্টা করলেই ঠিক চালিয়ে নেব—যে অন্তু বি, এ পাশ করে চাকরী নিতে না নিতেই তার প্রত্যেক দিনের অপমানে ঠাসা দাম্পত্য জীবনের মাথায় পা দিয়ে নয়ন চলে এসেছিল সেই অন্তুর আর তার সামনে-বসা অন্তুর মধ্যে একটা তফাৎ আছে। এ মানুষটিকে সে যেন চিনতে পারে। অবস্থার চাপে পড়ে কিংবা অন্য যে কোন কারণেই হোক, অন্তু আজ যে মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে নয়ন তাকে আগে দেখেছে। এই পঙ্গু ক্ষিপ্ত মানুষটির একদিকে সর্ব-গ্রাসী ক্ষুধা আর একদিকে সর্বত্যাগী বিতৃষ্ণা, একদিকে কাউকে কাদায় ফেলা আবার অন্যদিকে তারই পায়ে মাথা খোঁড়ার ইচ্ছে। এমন কি অন্তুর কথা বলার ঢংটিও তেমনি ট্যারা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অন্তু কর্কশ গলায় বললে, "তাহলে এত ঢং করে পণ্ডিচেরী গেলেই বা কেন? ফিরেই বা এলে কেন?"

ঢং! নয়নকে কেউ শপাং করে চাবুক মারলে। কী করেই বা

সে অন্তকে বোঝাবে, যখন আত্মীয়স্বজনে মিলে তার এই টানা হেঁচড়া জীবনের একটি নিষ্পত্তি করে দিলে, আশ্রমে যাবার পরও মাসে মাসে তাকে কিছু পাঠিয়ে দিয়ে তার একটা হিল্লে করে দেবার ব্যবস্থা হোল, এককথায় যখন এই অনাথিনীকে সমাজ দয়া দেখালে, তখনও তার আত্মীয়-স্বজন-সমাজের এই দয়া, উপদেশ, তার জীবনের সমস্যাকে চুকিয়ে বুকিয়ে নিষ্পত্তি করে দেবার এই সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে সে উপেক্ষা করে চলে এল কেন? কেন সে আবার ফিরে এল এই সংসারে জ্বলবার জন্যে, পুড়বার জন্যে?

অথচ এগুলো না বুঝলে তো বোঝানো যায় না। অন্তু বুঝতো এককালে। সংসারের দায়িত্ব, দেনার দায়, অফিসের খেজালতি কি এতই বড় হয়ে ওঠে যে মানুষের চরিত্র পালটিয়ে দেয়? অন্তুর সঙ্গে যে তার বাপের একটা প্রকাণ্ড পার্থক্য থাকবে, একথাটা নয়ন তো প্রাণপণে বিশ্বাস করবার চেষ্টা করে এসেছে এতদিন।

অন্তু বললে, "আমরা কাদার মানুষ, কাদা মাখি। আমাদের সঙ্গে থাকতে গেলে তোমায় আমাদের মতই থাকতে হবে।"

নয়ন চুপ করে থাকে। কী উত্তর দেবে? কোনরকম দাঁড়াবার চেষ্টা করবে না, তিলে তিলে মরবার জন্যে নিজেকে তৈরী করবে। আর খেয়ে পরে বাঁচার সাধারণ চেষ্টাকে বিলাসিতা বলে ধিক্কার দেবে, নিজেদের দুর্বলতার কালি দিয়ে সারা পৃথিবী কালো করে বলবে, মানুষ মানেই স্বার্থপর, অন্ধকার জগতের জীব—এভাবে তো নয়ন কখনও ভাবতে শেখে নি। নয়ন নিষ্ঠুর নয়। কিন্তু তার মনে হোল এভাবে বাঁচা মানে জীবনের কোন দায়িত্ব না নেওয়া, জীবনের প্রতি সমস্ত শ্রদ্ধা অস্বীকার করা। পেছনের জানলা দিয়ে পালিয়ে না এসে অন্তু যদি সোজা দাঁড়িয়ে খোলাখুলি তার অবস্থা বলত আর সেজন্যে যদি তার

জেলে যেতে হোত, তাহলেও নয়ন তা এই অস্বস্তিকর অর্থহীন ফেরারী অবস্থা থেকে অনেক সম্মানজনক মনে করত।

অন্তু বুঝতে পারে নয়ন তার কথা মেনে নিতে পারছে না। তার মনে হতে থাকে, তার মার কতকগুলো জায়গায় একান্ত একটা নিজস্ব অস্তিত্ব আছে যার ওপর তার কোন হাত নেই। সে এই নিজস্বতার বেড়াকে সম্পূর্ণ চূর্ণ করে দেবার জন্যে আগে ধার করে সন্দেশ এনেছে, মা কিন্তু মুখেও তোলে নি। শেষ পর্যন্ত নর্দমায় তা ছুঁড়ে ফেলতে হয়েছে। আর অন্তুর মনে হয় এটা তার মার উচ্ছৃঙ্খল আচরণ। স্বামী-ছেলে বাদ দিয়ে বৌ-এর নিজস্বতা, মায়ের নিজস্বতা কী থাকতে পারে সে বিষয়ে অন্তুর বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই।

হঠাৎ রেগে উঠে অন্তু বললে, "কেন, আর সব মায়েরা আছে না! কই মতির মা তো গামছা পরে কাটিয়ে দেয়। আমরা থাকতে পারি ময়লা জামা পরে, দেনা করে, গামছা চড়িয়ে, আর তুমি পারো না?"

নয়ন দৃঢ় গলায় বললে, "না পারি নি, পারব না। অন্যের বাড়িতে রাঁধুনী হয়ে থেকেও যদি বছরে দুটো শাড়ী পাই তাই পরব। যদি ছেঁড়া হয় তালি দিয়ে কেচে পরব।"

তারপর গলা নামিয়ে বললে, "তুই এত রাগারাগি করছিস্ কেন অন্তু? পণ্ডিচেরী ছাড়লাম তো তোদের জন্যেই। আবার মাথা ঠাণ্ডা করে একটা চাকরী-বাকরী কর। আবার—"

অন্তু নিষ্প্রাণভাবে বললে, "ওসব বুজরুকী ছাড়ো। দুটো টাকা থাকে দাও।"

টাকা দিতে নয়ন ভেতরে গিয়েছিল। ফিরে এসে ডাকলে, "অন্তু"। কোন সাড়া এল না।

নয়নের জামাইবাবু (তারিণীদা) মানুষ হয়েছিলেন শ্বশুর বাড়িতে। এখন আলীপুরে কোর্টে প্র্যাকটিস করেন। ঢ্যাঙ্গা ফর্সা পানা চেহারা।

তবে সে চেহারা থেকে যেন কেউ সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছে। গলা কর্কশ, মক্কেলদের সঙ্গে সব সময় দর কষাকষি করে স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতে ভুলে গেছেন। বিপদে আপদে পড়লে নয়নের এখানে একটা আস্তানা আছে। তবে এ ব্যাপারেও তারিণীবাবুর হিসেবে এতটুকু গোলমাল হয় নি। এখন ঠাকুরের মাইনে কুড়ি টাকার কমে হয় না। তার ওপর আরও কুড়ি যোগ করলে তার খাওয়ার ব্যবস্থা। আর নয়ন খাবার ব্যাপারে অসম্ভব লক্ষ্মী, অর্ধেক দিনের ওপরে একবেলা খায়।

এই হিসেবের জন্যেই ওপরতলার আর একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর গলায় গলায় ভাব। দুতলায় দুই উকিল, বৈঠকখানা একই, একই ধরনের দর কষাকষি। তবে ওপর তলায় রেট বেশী। ওপরের তলায় ভদ্রলোক জালিয়াতির কেসে বেশী হাত পাকিয়েছেন। মাঝে মাঝে যেদিন মক্কেলদের ভিড় কম থাকে সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত পড়েন। আবার এক একদিন খুব উঁচু গলায় সোভিয়েট রাশিয়া, চীন, আমেরিকা, তৃতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা ইত্যাদি নিয়েও আলোচনা হয়। নয়ন কান খাড়া করে মাঝে মাঝে শোনে। একদিন নয়ন চৌকাঠ থেকে শুনছিল ওপরের তলায় ভদ্রলোক বলছেন, “আর মশাই, আমরা কি শুধু আইনই করি নাকি! এ লাইনের লোকই তো দেশ গড়লে—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, জে, এম, সেনগুপ্ত…”ভদ্রলোক আরও একগুচ্ছের নাম করে যান।

নয়ন বোঝে তারিণীদার এসব কোন বালাই নেই। ওপরের ভদ্রলোক যখন শাঁসাল কেস্ করে “আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী” বলে চীৎকার করতে থাকেন, তখন তারিণীদা সেদিকে যে একেবারেই কান দিচ্ছেন না, নয়ন তা টের পায়। নয়ন একদিন রান্না করতে করতে দেখলে ওপরতলায় মুটের মাথায় জালানি কাঠ উঠছে।

কয়েকটা কাঠের কুচি ডালা থেকে পড়ে গেল। হঠাৎ অসময়ে বৈঠকখানা থেকে তারিণীদা বেরিয়ে আসার আওয়াজে মাথা তুলেই নয়ন চোখ নামায়। তারিণীদা হেঁট হয়ে কাঠের কুচিগুলো পা দিয়ে সরাতে সরাতে কখন একেবারে তাদের এলাকায় সিঁড়ির তলায় চালান করে দিলেন। তারিণীদার হিসেব আগাগোড়া। যৌবনে দিলখোলা ভাব কথাটা তারিণীবাবুর ক্ষেত্রে একেবারে অচল। নয়নের মনে পড়ল ছেলেবেলায় বাবা তার জামাইয়ের হাতে দরকারের অতিরিক্ত খরচ দিয়ে দিলেও তেরো বছর বয়সের অসম্ভব ঢ্যাঙ্গা নয়নকে হাফ টিকিটে চালাবার জন্যে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের হাতে তাদের সবাইকে কিরকম নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল একদিন।

তারিণীদাকে তবু নয়ন বুঝতে পারে। বেচারীর টাকার চিন্তা হলেই হাঁফানির টান ওঠে। কিন্তু তার তাক লেগে যায় দিদির কাণ্ডকারখানায়। মক্কেলদের সঙ্গে দরদস্তুর না হয় আইনের দোহাই দিয়ে সহ্য করা যায়, কিন্তু নদিদির সারাতুপুর কালীঘাটের নানা ধরণের স্ত্রীলোকদের নিয়ে তেজারতি কারবার, বাচ্চা ছেলের দুল, ভাতের হার পর্যন্ত নিক্তিতে মেপে মেপে দরদস্তুর করে সিন্দুকে তোলা —এ ভাবতে গেলে নয়নের আর জ্ঞান থাকে না। মনে হয় না একই বাপ মায়ের তারা মেয়ে। বাড়িতে একখানা চেয়ার নেই, আসবাব নেই, বাইরের লোককে আপ্যায়ন করার মত একটি অতিরিক্ত পেয়ালা নেই। আছে ঘরজুড়ে একখানা সিন্দুক।

এরা স্বামী-স্ত্রী যেন প্রতিযোগিতা করে চলেছে টাকা জমানোর দৌড়ে। নদিদি স্বামীকেও হার মানিয়েছেন। ভোর চারটে হতেই তিনি গামছা পরে' গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে দেন। আবার স্বামীর কাছেই সে ঘুঁটে বিক্রী করেন। এভাবে তাঁর স্পেশাল ফাণ্ড তৈরী হয়। ফাণ্ডের একমাত্র খরচ জামাই খাওয়ানো। নদিদি জামাই বলতে অজ্ঞান।

নয়ন ভাবে সে যে যে জিনিষ চায় নি ঠিক সেই সেই জিনিষ তাকে করতে হচ্ছে সারা জীবন ধরে। নইলে এই পরিবেশে যেখানে দমবন্ধ হয়ে যায় সেখানেও সবাইয়ের সঙ্গে ভদ্রতা করে দিন কাটাতে হচ্ছে। আর মানুষ তো দিন কাটায় কোন লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যে। তার লক্ষ্য কী? এখান থেকে যাবেই বা কোথায়, ভেবে পায় না।

দুপুরে নদিদির মেয়ে এল, নয়নের মনে পড়ল গোপালের কথা। গোপাল একবার তাকে দেখে বলেছিল, "এ ছিবড়েটা কে?" ছিবড়েই বটে। ফ্যাকাশে রং, ড্যাবডেবে চোখ, রোগা। বোধ হয় বিয়ের কয়েক বছরের ভেতরেই চার ছেলে হওয়ায় শরীরের সামনের দিক সব সময় অকারণে উঁচু হয়ে থাকে। এদিকে গা ভর্তি গয়না। এসে অবধি কোলের ছেলেটাকে ঠোনা মারছে আর বলে চলেছে, "কই মা, সেই মকরমুখো বালাটা। এ্যাদ্দিন হয়ে গেল, সেকরার কাছে পড়ে, নিয়ে এলে না।" চব্বিশ বছর বয়সের মেয়ের এমন ক্লান্ত নেতিয়ে-পড়া গলার স্বর, ভাবতেই অবাক লাগে নয়নের। সারা দুপুর মায়ে-ঝিয়ে কোন্ বিয়ে বাড়িতে কী কী তত্ত্ব দেওয়া হয়েছিল আর তার মধ্যে কোনটাতে ফাঁকি দেওয়া হয়েছে তাই নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি করে।

নয়ন একপাশে শুয়ে মরার মত পড়ে থাকে। মনে হয় মাথা ধরবে। নদিদির বাড়িতে প্রত্যেক বাসন মাজা হয় চার বার করে। একেবারে ঝকঝকে মুখ-দেখার মত না হলে যশোদা বলে' যে লোকটি কাজ করে তার নিস্তার নেই। যশোদার একবার আঙ্গুল-হাড়া হলে' নয়ন বলেছিল, "আজ না হয় কেটলীর গায়ে একটু কালি থাক। মানুষের চেয়ে তো আর জিনিষের দাম বেশী না।" নয়নকে অবাক করে দিয়ে নদিদি বলেছিলেন, "তুই বুঝবি না নয়ন। জিনিষের মূল্য তুই কবে বুঝলি? তোর ফকিরের সংসার। মানুষের আবার দাম কী জিনিষ না থাকলে।" তারা মায়ে-ঝিয়ে দুজনে এমন ভাবে বিয়ের তত্ত্বের আলোচনা সুরু

করে দেয় যে নয়নের মনে হয় দুটো লোভী কুকুর এঁটো পাতা চাটছে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে সে শুয়ে থাকে।

এগারো

সেদিন সকাল থেকেই মেঘলা। পুরোপুরি বর্ষার আকাশ। আকাশের দিকে তাকিয়ে একবারও মনে হয় না এখানে মাস দেড়েক আগেই এক হিংস্র অত্যাচারী শাসক প্রচণ্ড দাপটে রাজত্ব করেছে। আর এই মেঘলাতে বিশ্বাস বাড়ির লাল রঙও ম্লান দেখায়। চারদিকে মৃদু আলোয় রাস্তা পথ ঘাট বাড়ির চেহারা বদলে যায়। গাছগুলোর পাতা পুরু ভারী হয়ে ওঠে। সকাল দশটাতে কাক ডাকে, সবে ভোর হয়েছে বলে তাদের ভ্রম হয়।

ঠিক জল ভরা মন নিয়েই গোপাল হাজির হয় অফিসে। সেদিন কাজের চাপ কম। টিফিনের পর মেঘলা দুপুর আর তার সঙ্গে মাঝে মাঝে জোলো হাওয়ায় গোপালের ঘরে লোকগুলো একটু মন খুলে আলাপ করে। মিঃ সেন বেশ কিছুদিন হল তাঁর নতুন বাড়ির তত্ত্বাব-ধানের জন্যে বাইরে আছেন। চ্যাটারটন সাহেবের সর্দি লেগেছে, তিনি কদিন হোল আর জ্বালাতন করেন না। মিঃ রায় জানলার বাইরে তাকিয়ে বললে, "নাইস হুইস্কি ওয়েদার।"

চক্রবর্তী বললে, "আপনি তো হুইস্কি ওয়েদার বলেই খালাস, আর কাল বিষ্টিতে ঠাণ্ডায় ছেলেটা এমন কাঁথা ভাসিয়েছে, সারা রাত ঘুমোতে পারি নি।"

ডেভিড বলে যে ছেলেটি সময় পেলেই বিলিতি ম্যাগাজিন ঘাঁটে সে মাথা তুলে বললে, "এবারে তো আমার ছুটি ফেলেছে আগষ্ট মাসে, এই বর্ষায় কোথায় বা যাই।"

ম্যাকমোহন বললে, "তোমার আর কি ডেভ, বিয়ে করোনি

থাওয়া করোনি। একলা মানুষ। হুট করে চলে যাবে। না ভাল লাগে ফিরে আসবে।”

রায় স্বগতোক্তি করে, “হ্যাঁ বিয়ে করলেই একেবারে হাত-পা-বাঁধা। বিশেষ করে এ-লাইনে বুঝলেন মিঃ চৌধুরী, শিখে নিন।”

গোপাল আগেও একথা শুনেছে অনেকবার। বিয়ে করলে সমস্ত রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, কিছু করবার থাকে না ইত্যাদি। আর বার বার তার একটা প্রশ্ন জাগে, সত্যিই কি কিছু করবার ছিল? সে তার নবলব্ধ কায়দায় মাথা নাড়ায় একটু বেশী জোরে ঘাড় দুলিয়ে। এ ধরণের ভঙ্গীতে সম্মতি জানানো হয় বেশ জোরাল ভাবে। আবার একটা চাপা ঔদাসীন্যও জানিয়ে দেওয়া যায়।

এবার ওয়েদারের বদলে রাজনীতি আসে। লণ্ডন টাইমসের এক করেসপণ্ডেণ্টের লেখার ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে চক্রবর্তী বললে, “দেখেছো কী সব ব্যাপার হচ্ছে। চীনেরা একেবারে তাজ্জব বানিয়ে দিলে।”

রায় বললে, “হ্যাঁ ঐ দিকেই তো তাকিয়ে আছি।”

ডেভিড অবাক হয়ে বললে, “কোন্ দিকে?”

রায় গম্ভীর ভাবে বললে, “পূব দিকে, সূর্যের দিকে।”

“পূব দিকে জাপানও আছে মিঃ রায়।” ডেভিড পেন্সিল কামড়িয়ে বলে।

চক্রবর্তী বললে, “ইণ্ডিয়া কমিউনিষ্ট হলে আমাদের রায়ের বড্ড মুস্কিল হবে। ওরা এলেই তো রায়ের তামাক খাওয়া উঠে যাবে।”

রায় উত্তেজিত হয়ে ইংরেজী বাংলা মিশিয়ে বললে, “সার্টন্‌লী নট, কমিউনিজম মানে স্ট্যাণ্ডার্ড অফ লিভিং নীচু করা নয়। আই অল-সো নো সামথিং এবাউট কমিউনিজম।”

বেশ জোর তর্ক বেধে গেল। ভারতবর্ষে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে বিদেশ থেকে আনা ভাল তামাক খাওয়া রায়ের চলবে কিনা, এ আলোচনায় চক্রবর্তী, ম্যাকমোহন সকলেই অংশ গ্রহণ করে। রায় চীৎকার করতে থাকে। তার ধারণা এ দেশে সাম্যবাদ এলে তার মত বামপন্থী লোকেরা এস্তার ফার্পোয় বসে' আইসক্রীম খাবে। ডেভিড বললে, "কনসেণ্ট্রেশন ক্যাম্পে পাইপের তামাক পাওয়া যাবে না, খইনির তামাক হয়তো মিলতে পারে।"

মধুদা এসে পড়লেন। সিল্কের কোটখানা দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে কান খাড়া করে তিনি চার পাশের কথাবার্তা কিছুক্ষণ শুনলেন। তারপর ঢকঢক করে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে নিয়েই বলতে সুরু করেন, "কংগ্রেস বলো, কমিউনিষ্ট বলো ইণ্ডিয়া ইজ আফটার অল ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়া কখনও বদলায় নি, বদলাবে না।" মহেঞ্জোদারোর আমল থেকে ভারতবর্ষ কেমন ভাবে প্রত্যেক যুগের প্রভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে আছে তার একটা ফিরিস্তি দিয়ে মধুদা থামলেন।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট কাল তর্ক চলার পর মোটা ধারায় জল নামল। গোপাল উঠে গিয়ে শার্সির পাল্লা ভেজিয়ে দেয়।

বৃষ্টির পর রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে গেছে। ফিরবার পথে গোপালের বাড়ির একটু এগিয়েই কার্তিক ক্যাবিনের ধারে ঘোলা জল চক্‌চক্‌ করে রাস্তার আলোয়।

গোপাল জুতো খুলে জলে নামে। তারপর ক্লান্ত ভারি পায়ে জল ঠেলতে ঠেলতে বাড়ির দিকে অগ্রসর হয়। কয়েক পা এগোতেই আবার ঝির ঝির করে বৃষ্টি শুরু হয়। জলের ছিটে লাগে সারাদিনের ঘামে ভেজা মুখে।

যেমন রোজ ওঠে তেমনি মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে সে সিঁড়ি

ভাঙছিল। ছেলেবেলায় প্রত্যেকবার উঠবার সময় সে সিঁড়ি গুনতো, যে কোন দোতলা বাড়িতে একবার গিয়ে বলে দিতে পারত সে সিঁড়ির কটা ধাপ। এখনও তার সে অভ্যেস একেবারে কেটে যায় নি। তেতলার মুখে উঠে তার দরজার দিকে হাত বাড়িয়েই থমকে দাঁড়ায়। ফ্ল্যাটের সিঁড়িতে সম্প্রতি বালব চুরি হয়ে গিয়েছে, তবে রাস্তার আলোয় ঠাওর হয় কে একজন দাঁড়িয়ে। মহিলা হবে বোধ হয়। দরজার কড়া থেকে হাত নামিয়ে গোপাল বললে, "কে ?"

নয়ন মুখের ঘোমটা সরিয়ে এগিয়ে আসে। এই আবছা অন্ধকারেও তার ধারাল মুখের খাঁজ স্পষ্ট হয়ে আসে। গোপাল তার হাত ঘুটো ধরে নিজের কাছে টেনে নিয়ে বললে, "মাসী, তুমি এখানে ? তুমি তাহলে ফিরে এলে ! তা এখানে কেন, ভেতরে বসো নি কেন ?"

নয়ন ভিজে এসেছে, তার চুলে ফোঁটা ফোঁটা জল জমেছে। আরো হাল্কা দেখায় নয়নকে, কে বলবে সে অন্তুর মা ? মেদ তাকে কাত করে নি, কাত করে নি তাকে প্রৌঢ়ত্বের শুষ্কতা, প্রথম আলাপের সময় তার যে ঝলমলে ভাবটা ছিল সেটা নেই, কিন্তু তার চোখময় এক প্রখর দীপ্তি। মাথাটা একদিকে হেলিয়ে পা ঘুটো একসঙ্গে জড়ো করে যখন সে বসে থাকে তখন গোপাল অনুভব করে নয়ন বদলেছে এই গত একবছরে। তার হাসিটা কিন্তু তেমনি আছে। তার ঠোঁট ঘুটি প্রায় কালো, কিন্তু যেন শক্ত ষ্টিলের লাইনে আঁকা। নয়নের হাসিতে বৈরাগ্য নেই, প্রগলভতা নেই। গোপাল দৌড়ে একটা তোয়ালে নয়নের কোলে ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলে, "গুজারাম, বড়িয়া টি বানাও।"

গোপাল চা খেতে খেতে নয়নের দিকে তাকায় আর ভাবে ভাগ্যিস্ সে আজ সকাল সকাল এসেছিল। নইলে চৌরঙ্গীতে পা দিয়ে একবার যে খেয়াল হয় নি তা নয়। অন্য দিনের মত সন্ধেটা কোন রকম ভাবে পার করে দিয়ে হয়ত সে রাত দশটায় বাড়ি ফিরত।

চা-এর কাপ নিঃশেষ করে সিগারেট ধরিয়ে আস্তে আস্তে বললে, "কবে এলে, কালকে ?"

"না এসেছি অনেকদিন। প্রায় দেড় মাস হয়ে গেল," নয়ন শান্ত ভাবে জবাব দেয়।

গোপাল অবাক হয়ে বলে, "দেড় মাস হয়ে গেল এসেছো।" আরও একটা পরের কথা ছিল, কিন্তু সেটা সে চেপে যায়। মুহূর্তের জন্যে তাকে একটু গম্ভীর দেখায়। পণ্ডিচেরী যাবার আগেও নয়ন তার সঙ্গে দেখা করে নি। সে না হয় মানসিক উত্তেজনার দোহাই দিয়ে বলা যায় কিন্তু সেখান থেকে কলকাতা ফিরে গত দেড় মাসের ভেতরে সে সময় করতে পারে নি তার সঙ্গে দেখা করার, এর একমাত্রই মানে— নয়নের জগতে তার নিজের কোন স্থান নেই।

নয়ন বললে, "কতদিন সন্ধের পর তোর রাস্তার সামনে দিয়ে গিয়েছি, দেখেছি তোর ঘরে আলো জ্বলছে। কিন্তু আর যাই নি! শুনলাম তুই চাকরী করছিস।"

গোপাল গম্ভীর হয়ে বললে, "হ্যাঁ চাকরী করছি, কিন্তু তুমি এলে না কেন ?"

নয়ন গোপালের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে। সেও লক্ষ্য করে গোপালের পরিবর্তন। সেই তন্ময় ভাবুক মুখে আরো একটা কীসের ভাব এসেছে, সে ঠিক ধরতে পারে না। শুধু অস্পষ্ট ভাবে মনে হয় গোপাল বড় হয়েছে। চোখ নামিয়ে তার ভেজা পা দুটো মাটিতে ঘষতে ঘষতে বললে, "তোর সামনে আমার খিটিমিটি নিয়ে দাঁড়াতে লজ্জা করে। সারাদিন পর তুই তেতেপুড়ে আসিস। তখন আমি আমার হাজার রকমের সমস্যা নিয়ে আসি কেমন করে ?"

গোপাল প্রসঙ্গটা হাল্কা করে দিয়ে বলে, "মানুষ মাত্রেরই তো সমস্যা আছে।"

নয়ন অস্থির হয়ে বললে, "না না, তুই ওভাবে হাল্কা করে দিসনে কথাটা। মানুষ মাত্রেরই আছে, তা জানি, কিন্তু আমি যে কোন কূল পাই না। সমস্যা ঘেঁটে ঘেঁটেই এতগুলো বছর চলে গেল, কখনই জানতে পারলাম না কি চাই আমি। কি আমার ভাল লাগে।"

"তুমি পণ্ডিচেরী থেকে ফিরলে কেন?"

নয়ন আস্তে আস্তে বললে, "কেন গেলাম তাও তো জানতে পারলাম না।" একটু চুপ করে থেকে বললে, "চারদিকে ছি ছি করছে। জামাইবাবু তো বলছে, আমি নিজের পায়ে কুড়োল মারলাম। ছোটমামা টাকা পাঠাচ্ছিল, খাওয়া পরার কোন কষ্ট ছিল না।"

"তাহলে?"

নয়ন তীব্রকণ্ঠে বললে, "তাহলে আবার কি? মানুষ তো আর কুকুর বেড়াল না যে যত্নআত্তি করলেই সে খুশী থাকবে।"

গোপাল চুপ করে ভাবতে থাকে।

নয়নের ফিরে আসাটা যে তার মেজাজের দিক থেকে কোন অন্যায় হয় নি এটা গোপাল স্পষ্ট বোঝে। কিন্তু অন্তর সঙ্গে শেষ সাক্ষাতে তার ছন্নছাড়া জীবনযাত্রার যে ছবি তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল সে দিক ভেবে সাবধানে বললে, "কিন্তু তুমি দাঁড়াবে কোথায়?"

"রাস্তায়, দরকার হলে রাস্তায় দাঁড়াব গোপাল, কিন্তু যা নই তা আমি সাজতে পারব না," বলার শেষে তার গলা কেঁপে উঠল।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে দৃঢ় গলায় নয়ন বললে, "সবাই ছি ছি করবে, করুক। আমার পণ্ডিচেরী যাওয়া ঠিকই হয়েছে। নিজেকে চিনতেও তো সময় লাগে। আমি যা নই তাই হতে গিয়েছিলাম। এবার থেকে আমি নিজে যা, তাই হবার চেষ্টা করব। তার জন্যে সব কিছু সইতে রাজী।"

গোপাল বললে, "দাঁড়াও দাঁড়াও এখনই যাচ্ছো কেন। আর একটু বোস।"

নয়ন বললে, "না রে বসতে পারব না। নদিদির বাড়িতে রাঁধুনী হয়ে আছি। ভাত চাপিয়ে এসেছি। পুড়ে যাবে। আয় না একদিন তুই। এই তো কালীঘাটে, কাছেই, অবশ্য কাজের ক্ষতি করে এসো না।"

দরজার বাইরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নয়নের গলার স্বর শুনতে অন্য রকম লাগে। ঘরের আলো কাত হয়ে তার মুখে এসে পড়ে। হাওয়ায় তার রুক্ষ চুল ওড়ে ঘোমটা ছাপিয়ে। গোপালের দিকে চোখ তুলে নয়ন আস্তে আস্তে বললে, "উঃ কতদিন পর তোকে দেখলাম।" তারপর গোপালের হাতে আস্তে আস্তে চাপ দিয়ে বললে, "সবাই আমায় খরচের খাতায় তুলে রেখেছে, আমি কিন্তু রাখি নি।" হাল্কা পায়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যায় নয়ন।

বারো

মা বলতেন, "দেখ্ দেখ্ মেয়েটা কেমন থাপন জুড়ে বসেছে।" সত্যিই নয়নের প্রত্যেকটা কাজে এমন এক তন্ময় ভাব ছিল যে গোপাল চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ডাকতে ভুলে যায়। নয়ন বাবু হয়ে বসে পিঠ খাড়া করে একটার পর একটা রুটি বেলে চলেছিল। গোপাল ধীরে ধীরে ডাকলে "মাসী।"

"ওমা তুই এসেছিস্! দাঁড়া, তোকে কোথায় জায়গা দি"—নয়ন তার পুঁটলীর ভিতর থেকে বহুদিনের পুরনো পাড়ের আসন ঝেড়েঝুড়ে বললে, "এখানেই পেড়ে দিই কেমন।"

জানলার ফাঁক দিয়ে গোপাল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার ফ্ল্যাট বাড়ির সিঁড়িতে একেবারে ভিজে কাপড় শুদ্ধ নয়নকে যেদিন

অপেক্ষা করতে দেখেছিল সেদিনের কথা মনে পড়ে তার। সেদিন কালো মেঘে ঢাকা ছিল বর্ষার আকাশ, আর আজ জানলার ফাঁক দিয়ে একরত্তি আকাশখানার দিকে তাকিয়েও বোঝা যায় ঋতু বদলে গেছে। নয়নের সঙ্গে দেখা হবার পর প্রায় তিন চারমাস কেটে গেছে আর এই ক'মাস তারিণীবাবুর বাড়ির চৌকাঠের ধারে আসন পেতে কিম্বা ঘরের এককোণে সিন্দুকের গায়ে হেলান দিয়ে কি করে কাটিয়েছে সে, গোপাল তা ভাববার সময় পায়নি। সে যখন নয়নের সঙ্গে কথা বলে তখন বাঙালী মধ্যবিত্ত প্রসঙ্গে তার যে সব চিন্তা কিম্বা অন্যান্য ভাবনা তারা মাথা ছেড়ে অবশ্য পালিয়ে যায় না। কিন্তু কোথায় যেন তারা মিলিয়ে থাকে। নয়নের সুপুরি কাটা থেকে সুরু করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকানোর মধ্যে সেগুলো একাকার হয়ে যায়। সন্ধে হতেই আজকাল গোপালের মন পড়ে থাকে তারিণীবাবুর বাড়ীর সিঁড়ির নীচে একফালি বারান্দা-টুকুর জন্যে।

গোপাল বললে, "ওদের তোমায় মাসে মাসে পঁচিশ টাকা হাত খরচ দেওয়া উচিত। শুনলাম, তুমি আসতে না আসতেই ঠাকুর ছাড়িয়ে দিয়েছে। আর ঠাকুর তো তোমার মত তাদের হাজার আবদার শুনত না।"

নয়ন প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, "আস্তে আস্তে, কী সাংঘাতিক ছেলে তুই।"

কোমর টান করবার জন্যে সে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। সিঁড়ির নিচে মাত্র তিন হাত জায়গা জুড়ে রান্নাঘর। তার এককোণে দুটো উনুন আর একদিকে মাথায় ঠেকে এমনি হেঁসেলের তাক। সেখান থেকে বারান্দায় উঠবার দু-তিনটে সিঁড়ির মুখেই দু বস্তা কয়লা আর ঘুঁটে। এর মধ্যে নয়ন তার লম্বা সুঠাম চেহারাটা নিয়ে কি ভাবে বারো ব্যান্নন রেঁধে বারো বার দৌড়ে গিয়ে তার নদিদির স্বামী, নাতি এমন কি তাদের জামাই আদর করে, তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। উনুনের

পাশ থেকে একটা পিঁড়ি গোপালের পায়ের নীচে দিয়ে নয়ন বললে "ভাল করে পা ছড়িয়ে বোস।"

বারান্দায় শ্লেষ্মা ঝাড়ার আওয়াজ এলো। নয়ন বললে, "যাচ্ছি তারিণীদা, তুমি একটুখানি বসো। আমি রুটিগুলো একটু সেঁকে নিই।"

গোপাল আগেও লক্ষ্য করেছে নয়ন কী যত্নের সঙ্গে কাজ করে, কোনও জিনিষ, তা কারুর জন্যেই হোক, তার পক্ষে দায়সারা গোছের হবার যো নেই। গোপালের আরও ভাল লাগে এই দেখে যে নয়নের এ যত্ন কোনও বিশেষ বিশেষ লোকের জন্যে নয়। একদিন বিকেলের দিকে এসে সে অবাক হয়েছিল। বাড়ীর কলি ফেরাচ্ছে এমন কয়েক-জন লোককে নদিদি খাবার জলের গেলাস না দিয়ে মাটির খুরি থেকে জল ঢেলে দেওয়ায় নয়ন একেবারে হুলস্থুল বাধিয়েছে। নদিদি সরে গেলে গোপাল আস্তে আস্তে বলেছিল, "দুটো মিস্ত্রির জন্যে কি তুমি এখানকার পাঠ ওঠাবে?" নয়ন তার বড় বড় চোখ দুটো মেলে বলেছিল, "কারুর জন্যে মানে? আমায় ওসব বলিস্‌নে। মা আমায় বলত কি জানিস? আমি নাকি বারোয়ারী। আমি তো কারুর জন্যে করিনি। তোকে এ ভাবে জল দিলেও আমি বলতাম, অন্যকে জল দিলেও বলতাম। আমি সত্যিই বারোয়ারী।"

সকাল হলে অবশ্য কিছুটা বোঝা যায়। শুধু বয়সই না, চোদ্দ বছরে বিয়ে হবার পরদিন থেকেই সুদীর্ঘ সংগ্রামের ছাপ চোখের নীচের স্বল্প কালিতে, মাথার এক জায়গায় চুল উঠে যাওয়ায়, যথেষ্ট সুঠাম শরীর থাকলেও যে বোঝা যায় না তা নয়। কিন্তু এখন সিঁড়ির ওপরের আলো কাত হয়ে নয়নের গালে এসে পড়েছে। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে বড় বড় দুটো চুলের থোলো নেমে এসেছে ঘাড় পর্যন্ত। তার ধারালো কঠিন মুখের ওপর স্পষ্ট দৃঢ় লাইনে আঁকা ঠোঁটের বাহার,

ক্ষীণ মাজা আর লম্বা হাত পায়ের গড়ন দেখে গোপালের কেন যে কোনও মানুষেরই খট্‌কা লাগতে পারে তিরিশ পার হয়নি বলে। বিশেষ করে তার চোখ দুটী। গোপালের মনে হয় সে চোখে আগ্রহ আছে কিন্তু কোনও ব্যাকুলতা নেই। সেই সমাহিত অথচ কৌতূহলী দুটী চোখের দিকে তাকিয়ে গোপাল এই মহিলাটিকে কেবল বন্ধুর মা বলে ভাবতে পারে না। তার সঙ্গে কারুর সম্বন্ধের জের টেনে সম্বন্ধ পাতাতে তার মন চায় না। এ এক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তার নিজস্ব আলোয় আলোকিত হয়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। গোপাল মুগ্ধ দৃষ্টিতে নয়নকে দেখতে থাকে।

নয়ন রুটি বেলা সেরে তার দিকে তাকিয়ে বললে, "কিরে, কী দেখছিস?"

"তুমি চল আমার আছে থাকবে"—গোপালের গলা কেঁপে যায়।

নয়ন হেসে ওঠে। সে হাসিতে মমতার সঙ্গে ব্যঙ্গের যে রেশটুকু ছিল না তা নয়। গোপাল দেখলে কী দারুণ ছেলেমানুষ হতে পারে নয়ন। ঠোঁট দুটো কুঁচকিয়ে আদর কাড়ার ভঙ্গিতে সে বললে "যাক্ বাবা, তবু একটা লোক আমায় এমন কথা বললে।" পর মুহূর্তেই ভুরু তুলে বললে, "তারপর?"

"তারপর আবার কী? এর তো কোনও তারপর নেই।"

নয়ন গম্ভীর হয়ে যায়। গোপালের মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে, "বাঃ তুই যে দেখছি আমারই মত পাগল।"

সাধারণত গোপালের মুখে ভাবের কথা আসে না। কড়া কথা বলায় সে চৌকশ। রঙের কথা কালে ভদ্রে বললেও তাতে চোখ বেঁধা আলোর ছটাই বেশী, মন ভরে না সে কথায়। গোপাল গলা ভারী করে বললে, "এই কষ্টে তুমি কদ্দিন থাকবে?"

"এর চেয়েও অনেক কষ্ট আছে। অভ্যেস হয়ে যাবে।" নয়ন শান্ত গলায় বললে।

গোপালের নতুন করে চমক লাগে। তার মনে হল এই মহিলাটির সামনে কোনো মিথ্যের জাল বোনা চলবে না। কোনো মনোরম ভাঁড়ামি দিয়ে ভরানো যাবে না তার মন। আর ভেবে সে খুব আরাম পায়, যে ছল আর স্তাবকতার বিদ্যা সাধারণত মেয়েদের সঙ্গে আলাপে ব্যবহার করা হয় সে ধরনের আলাপে তার রুচি নেই।

ঘড়ির কাঁটায় দশটা বাজলো। গোপাল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "চললাম"।

"আয়, তুই পাঁচমিনিট এলেও আমার ভাল লাগে"—নয়নের ভরাট আবেগভরা গলা রাস্তায় নেমেও গোপালের কানে বাজতে থাকে। আবার নতুন করে তার কথাটা মনে নাড়া দেয়ঃ নয়ন কেন শুধু তার বন্ধুর মা হবে, কেন সে নিজে তার বন্ধু হবে না? হঠাৎ গোপাল মনে মনে বন্ধু কথাটির ওপর ক্ষেপে উঠলো। মেয়েদের প্রসঙ্গে বন্ধু কথাটি অত্যন্ত অস্পষ্ট। আর একটা নাম মনে পড়ে—মিতা। কী সাংঘাতিক ন্যাকা নাম। গোপাল রাস্তায় দাঁড়িয়ে এবার বৈষ্ণব কাব্য স্মরণ করলে—সখী। মনে মনে তারিফ করে বললে, বেড়ে নাম; কোনও ঢাক ঢাক নেই, বেশ জোরে হেঁকে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। কিন্তু সে যে নয়নকে তার সখী হিসেবে পেতে চায় একথা বললে লোকে তার পেছনে টিন বাজাবে না? আর নয়ন? নয়ন কি কথাটা শুনে বেমালুম এক স্নেহের অসহায় বাণ্ডিল "মাসিমায়" পর্যবসিত হবে না?

ঘুমোবার আগে সে রাত্তির অনেকক্ষণ গোপাল নয়ন আর অন্তর মধ্যে মিল খুঁজবার প্রাণপণ চেষ্টা করলে। কিন্তু মা আর ছেলের কোনও মিল খুঁজে পেলে না।

নয়নের ছোট ভাই বৈকুণ্ঠের সেক্রেটারী। ১৯৫০ সালে একথা

হাস্যকর হলেও কার্যক্ষেত্রে মোটেই তা নয়। বছর বত্রিশেক বয়েস, পোর্ট কমিশনারে কাজ করে নিখিল। পাঁচ বছর হল ঘোর ব্রহ্মচারী। তার এই ব্রহ্মচর্য ও ধর্মচর্চার সবচেয়ে বড় সুযোগ নিয়েছে তাদেরই অফিসের বড়বাবু। বড়বাবু রিটায়ার করে সস্ত্রীক গোবিন্দ বনে গেছেন। তিনি গোবিন্দের মত লীলা করে সম্প্রতি কালীঘাট অঞ্চলে বেশ জাঁকিয়ে বসেছেন। শোনা যায় গণ্যমান্য লোকজনও গোবিন্দের দর্শনপ্রার্থী। এমন কি দুঁদে পুলিশ অফিসারের মস্ত গাড়ী এ অঞ্চলের ভাঙাচোরা কানা গলির পথ আটকে দাঁড়িয়ে থাকে। নিখিল তার মাইনে আর এদিক সেদিক হাতিয়ে বাগিয়ে যা পায় তার বেশীর ভাগই গোবিন্দের চরণে অর্পণ করে বসে আছে।

নিখিল সেদিন নয়নকে এসে বললে, "ছোড়দি, তোমাকে তো শেষ পর্যন্ত গোবিন্দই ডেকে নেবেন। কেন মিছিমিছি সময় নষ্ট করছ।"

নয়ন হেসে বললে "কী করে বুঝলি নিখিল ?"

নিখিল ভগবানকে নিয়ে ঠাট্টা মস্করা পছন্দ করে না। ঝাঁঝিয়ে উঠে বললে, "কী করে বুঝলি মানে কি ? আর কদ্দিন এভাবে থাকবে, এভাবে জামাইবাবুর দ্বারস্থ হয়ে—"

নয়নের মুখ কঠিন হয়ে যায়। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, "দ্বারস্থ হয়ে না হয় আছি, কিন্তু গোবিন্দ না হলে যে আমার চলবে না, এটা তোকে কে বললে ?"

নিখিল তার ডিস্‌পোজ্যাল থেকে খাঁকী মিলিটারী কোটের কলারটা চাপড়াতে চাপড়াতে বললে, "তোমায় প্রায়ই খোঁজ করেন, বলছিলেন, কই একদিন এসে তো আর এলেন না।"

নয়ন ছেলেবেলা থেকেই যেখানে ধর্মচর্চা হয় সেখানে জমতে ভালবাসে। অবশ্য সঠিক কি জন্যে তা বোধ হয় তাকে জিজ্ঞেস করলে বলতে পারবে না। চারপাশের পারিবারিক পাঁক থেকে একটুখানি

নিঃশ্বাস ফেলে যেন বাঁচতে পারে। তাছাড়া নয়নের আর একটা রোগ, সে বড্ড গান পাগল। কাশীতে এক আশ্রমে মীরার ভজন শোনবার জন্যে রাতের পর রাত ঠাণ্ডায় কেঁপেছে। কিন্তু নিখিলের কথায় গোবিন্দের বাড়ী গিয়ে সেদিন তার মুখে ভাত রোচেনি। একটা মোট্‌কা ধুম্‌সো লোক যখন নাড়ুগোপাল হয়ে তার দিকে তেড়ে এলো, তখন কোল পাতা দূরে থাক, তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সমাগত মুগ্ধ ভক্তবৃন্দদের চমকিয়ে সে বেরিয়ে এসেছে। আর এমন জেদী সে যে হাজার অনুনয় বিনয়, অনন্ত নরকের ভয় দেখিয়েও আর একটী বার সে দিকে পা বাড়াবার জন্যে তাকে রাজী করাতে পারে নি নিখিল।

তার শক্ত শরীরটা কোটের বোতাম দিয়ে আঁটতে আঁটতে নিখিল বললে, "তাহলে চলি ছোড়দি।"

"আর একটু বস্‌বি না?"

"না আমার অফিসের দেরী হয়ে যাচ্ছে"—চৌকাঠের কাছে এগিয়েই নিখিল আবার মুখ ফেরালে, নয়নের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, "কিন্তু ছোড়দি কদ্দিন আর এভাবে চলবে?" তারপর নয়নের মেলে থাকা চোখের দিক থেকে চোখ নামিয়ে মাথা নীচু করে বলতে থাকে, "তোমাকে তো আগেই বলেছি, নিজেকে গোবিন্দের চরণে দাও। আমি সব ভার নেব। এখানে আর তোমায় পড়ে থাকতে হবে না। বয়সও তো অনেক হল। এখন আর কি করবে তুমি? ইস্কুল মাস্টারী? সে গুড়েও তো বালি।"

শেষের দিকে নিখিল কথাগুলো বেশ বিঁধিয়েই বললে। তার সব কটি বোনেদের মধ্যে ছোড়দির সঙ্গেই তার ভাব ছিল বেশী। আর সে যখন নিজে এই দুঃখময় জগতে এত বড় একটা কূল পেয়েছে তখন ছোড়দি এত দুর্যোগ মাথায় নিয়েও সে কথাটা একদম গায়ে মাখাচ্ছে না, একথা ভাবতে তার রাগে গা জ্বলে।

নয়নের গা জ্বলছিল অন্য কারণে। ছেলেবেলা থেকেই সে গেছো মেয়ে। ছেলেদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলেছে, পেয়ারা গাছে উঠেছে, আর এই সব গেছোমিতে নিখিল ছিল তার প্রধান সাকৃরেদ। সেই নিখিলের কেবল একটা জিদই সবচেয়ে বড় হল। নয়নের গা জ্বলে সেই ফন্দিবাজ গোবিন্দটির কথা ভেবে যে তার এত প্রিয় লোকটাকে এমনভাবে ছিনিয়ে নিয়েছে। মুখ নীচু করা নিখিলের দিকে একবার তাকিয়ে শান্ত স্বরে নয়ন বলে, "আচ্ছা তুই আজ যা।"

না, ধর্মকে একটা বাঁশের চাঁছের মত ধরে তার মনের জানলা আটকাতে পারবে না কেউ। আগে তার এসব বিষয়ে এত চোখ ছিল না। কিন্তু এখন ক্রমশই এ ধরনের ব্যাপারে তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে। তাদের পাশের বাড়ীর এক ভদ্রমহিলা সম্প্রতি স্বামী হারিয়েছেন। লাল ডগডগে চওড়া পাড় আর সিঁদূরের খোলশ থেকে বেরিয়ে এসে ভদ্রমহিলা শ্বেতবস্ত্রেও যে কতখানি স্বার্থপর হয়ে পড়েছেন তা নয়ন নিজের চোখে দেখেছে। কয়েক হাজার টাকার ব্যাপার, তাই নিয়ে তিনি ছেলেদের বিরুদ্ধে কেস করছেন আব তারিণী বাবুর কাছে রোজ এসে মালা টপটপ করতে করতে নাকী কাঁদেন। ছেলেরা তাঁর সর্বনাশ করবে তাই তাদের সর্বনাশ করবার জন্যে তিনিও "গোবিন্দ গোবিন্দ" বলে উকিলের সঙ্গে শলা পরামর্শ করছেন। তারিণীদা যখন খুনীকে আইনের প্যাঁচ বুঝিয়ে কি ভাবে নিজেকে নির্দোষ খাড়া করবে তাই পাখী পড়ার মত পড়িয়ে "রাধে গোবিন্দ" বলে শামলা এঁটে কোর্টে যান তখন নয়নের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

অথচ সে কী করে বোঝাবে ধর্ম সেও চায়—প্রকাণ্ড ভাবে, প্রচণ্ড ভাবে, মরিয়ার শেষ আশা হিসেবে নয়, ডুবন্ত লোকের খড় কুটোর মত নয়, এই জীবনের প্রতি বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই। আর সম্প্রতি

এটাই তার মনে দৃঢ়ভাবে গাঁথা হচ্ছে যা তার আশ্রমে গিয়েও মনে হয়েছিল—দুঃখ মোচন করেই ধর্ম, দুঃখ এড়িয়ে নয়।

ছোটো মামা একদিন এসে ভগবদ্গীতার সব কটা খণ্ড দিয়ে তাকে বলেছেন, "মনকে তৈরী কর, নিজেকে তৈরী কর।"

কিন্তু রোজ জাম গাছটার মাথায় যখন সকালের রোদ খেলা করে আর পাশের বস্তীর পাগলী মেয়েটা তার বহুদিন আগেকার মৃত সন্তানের জন্যে বিলাপ জুড়ে দেয়, তখন গীতার পাতা খুলে সে তো কোনো শ্মশান বৈরাগ্য খুঁজে পায় না। বরং তার দুঃখের আরও একটা উন্নত স্তর সে আবিষ্কার করতে পারে। মানুষ যুদ্ধ করে, কর্ম করে, যদিও মৃত্যু আসে। কিন্তু এই মাটির জন্যেই তো যুদ্ধ, হিংসা-দ্বেষ-ঘৃণা আবার ভালবাসা, আনন্দ। বিশেষ করে যে পরপারের জগতের সান্ত্বনা নিখিল উঠতে বসতে বলে থাকে, সেই অলৌকিক জগত ছাপিয়ে এই রক্ত মাংসের জগতের কথাই তো বারবার বলা হয়েছে এখানে।

আবার নতুন করে মহাভারত পড়া সুরু করলে নয়ন। আর তার মনে হল মহাভারতের মানুষগুলো ধর্মের কথা বলতে পেরেছে তার কারণ তারা ছিল জীবন্ত, জীবন্মৃত নয়। বিশেষ করে যতবারই সে দ্রৌপদীর ক্রোধ, ক্ষোভের অধ্যায়ে আসে ততবারই সে নিজের মনে আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠে। কীচক বধের অধ্যায়ে সে থাকতে না পেরে নদিদির বাড়ীতে যে কাজ করে সেই যশোদার হাত থেকে আধোয়া বাসন নামিয়ে বললে, "যশোদা যশোদা, শোনো।" তারপর ভারী মৃদু গলায় পড়তে থাকে, "দ্রৌপদী নিজের বাসগৃহে গিয়ে গাত্র ও বস্ত্র ধুয়ে ফেললেন। তিনি দুঃখে কাতর হয়ে স্থির করলেন, ভীম ভিন্ন আর কেউ তাঁর প্রিয় কার্য করতে পারবেন না। রাত্রিকালে তিনি শয্যা থেকে উঠে ভীমের গৃহে গেলেন, এবং দুর্গম বনে সিংহী যেমন

সিংহকে আলিঙ্গন করে সেই রূপ ভীমকে আলিঙ্গন করে বললেন, 'ভীমসেন, ওঠ, ওঠ, মৃতের ন্যায় শুয়ে আছো কেন"···তারপর উৎসাহে অনেকক্ষণ ধরে যশোদাকে সে দ্রৌপদীর সিংহীপনা বোঝাতে লেগে যায়।

ছোটোখাটো, শান্ত স্বভাব, চার বাড়িতে কাজ করে যশোদা, কিন্তু এই পঁয়ষট্টি বছর বয়সেও এক মুহূর্ত ফুরসৎ নেই। কদম ছাঁটু পাকাচুল আর ঝকঝকে স্বাস্থ্যবান তুপাটী দাঁত নিয়ে সে সমস্ত কাজ সেরেও একবার না একবার ছোড়দির কাছে এসে বসবেই। যশোদা বলে, "আর সবাই তো এমন করে বলে না ছোড়দি। তোমাদের বাড়ী রামায়ণ-মহাভারত তো সবাই পড়ে। তুমি মরে যাবার পরে একটা স্থর রেখে যাবে ছোড়দি।"

নয়ন যশোদার কথা শুনে অনেকক্ষণ লুটিয়ে লুটিয়ে হাসলে। তারপর বললে, "যশোদা মরে যাবার পরে কেন গো? এখনই বা না কেন?"

না, ধর্ম তো বরং আরও তাকে ঠেলে দিচ্ছে এই জীবনকেই গ্রহণ করার দিকে, তাকে সমস্ত অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করার পথে। মামুলী শাস্ত্রের চোখ পাকানো সে হেসে উড়িয়ে দিতে পারে, কিন্তু একটা জিনিষ সে কিছুতে উড়িয়ে দিতে পারছে না। সম্প্রতি তাকে তা পেয়ে বসেছে—সেটা তার আত্মগ্লানি।

চারপাশের জগতকে দেখে দেখে তার মাঝে মাঝে খটকা লাগে। সে যেমন সামান্য আত্মমর্যাদা ক্ষুন্ন হলেই একেবারে মর্মে মরে যায়, কী করবে ঠিক করতে পারে না এবং এই আত্মমর্যাদার ভিত্তিতেই তার নিকটতম সম্বন্ধও প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, বেশীর ভাগ মানুষের জীবনে সেই আত্মমর্যাদা কি একটা কথার কথা নয়? তাহলে তার এই তেজ, তার এই রোখালো ভাব কি অন্যায় নয়? গার্হস্থ্য ধর্মের পক্ষে অসঙ্গত নয়? নদিদি কেন সকলেই তো বলে, স্বামীকে যে নাকে দড়ি দিয়ে

ঘোরাতে না পারলে সে আবার বউ কি? তার জন্মে বোকার মত নিজের স্বামীকে ছেড়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনা কি কোনও বুদ্ধিমানে কাজ? তবু স্বামীর ব্যাপারে তার মেজদি, নদি, বড়দি, পৃথিবীশুদ্ধ দিদি দাদা মামার যুক্তি কোনও যুক্তি বলে গ্রাহ্য হয় না। কিন্তু অন্ত? একটা শারীরিক ব্যথায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল নয়ন। অন্ত যখন তাকে বললে, "তোমার আর কিছু ভাবনার নেই। আমি আর বড় হব না। বড় হবার কোন ইচ্ছেও নেই। এমনি ভাবে ধার করব, ধারের জন্মে পাওনাদার এলে তোমায় মিথ্যে বলতে হবে। আর তোমার নিজের জন্মে কোনও চেষ্টা করতে পারবে না। কারুর সঙ্গে দেখাশোনা, পড়াশোনা—এসব বুজরুকী তোমাকে ছাড়তে হবে। তোমাকে থাকতে হবে ঠিক আমাদের মত করে। আমরা কাদায় গড়াচ্ছি, তোমাকেও কাদায় গড়াতে হবে।" এ অবস্থায় নিরানব্বইটি মা-ই কি তার ছেলের গোড়ে গোড় দিয়ে চলত না?

নয়নের কেমন মনে হয় যে ব্যবহারিক জগতের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যেটা খুব দামী হয়ে দাঁড়ায় শেষ পর্যন্ত মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধে, সেটা হল কূটনীতি। স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে কূটনীতি, মা-ছেলের মধ্যে কূটনীতি। ছেলেবেলায় গল্পের উপসংহারে সবসময়ে সে পড়ত— "তাহার পর রাজারাণী পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।" নয়নের ইচ্ছে হয় একটু পালটাতে—"তাহার পর রাজারাণী পরম সুখে কূটনীতি করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।"

দুর্বল মুহূর্তে তার মনে হয় সে সংসারের তাল বুঝতে পারে না। তাই সে কারুর সঙ্গেই ঘর বাঁধতে পারলে না। আত্মগ্লানিতে তার বুক ভরে যায়।

ঠিক এই অসোয়াস্তির মধ্যেই গোপালের আবির্ভাব। আর চৌকাঠে পা দেওয়া মাত্রেই সে টের পায় নয়ন যেন অনেক দূরে চলে

গেছে। একটা ভারী বিষন্ন ভাব নয়নের মুখে, নিস্তেজ অবসন্ন গলা। আর এই অসোয়াস্তি কাঁটার মত গোপালকে বিঁধতে থাকে। গত তিন চার মাস এই মহিলাটির সংস্পর্শ সে এত বেশী পেয়েছে যে তার মনের ভাব বুঝে নিতে তার দেরী হয় না। কিন্তু বুঝে তার হাত কামড়াতে ইচ্ছে করে।

গোপাল এর আগেও নয়নের এই ভাবটী লক্ষ্য করেছে। যখন সে এ ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তখন কেবল নিজেকেই শাস্তি দেয়। খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দেয়, মাথা ধরা বাধিয়ে এ্যাসপিরিন খেয়ে শুয়ে থাকে আর সারা রাত্তির ছটফট করে আত্মগ্লানিতে। গোপাল একটু আহতও হয়। সে কি কখনও এই ভাঙ্গা, ত্যাবড়ানো জগতটার ওপরে উঠতে পারবে না? যখনই সে নতুন অভিজ্ঞতার হাওয়ায় নিজের ডানা মেলেছে তখনই অকস্মাৎ কোন অদৃশ্য নিষ্ঠুর লাটাই টান মেরেছে তার পেছন দিক থেকে, আর সঙ্গে সঙ্গে সে গোঁত্তা খেয়ে লুটিয়েছে মাটিতে। বিশেষ করে তার একটী মাত্র ছুটীর সন্ধ্যায় সে একটু কম ঝামেলা চেয়েছিল। সে তো কোনও পারিবারিক কর্তব্যের মত, কোনও দুঃস্থ বিপদগ্রস্ত অসহায় নারীর প্রতি দয়া দেখাতে এখানে আসেনি। ভাবতেই তো তার সমস্ত মনটা কুঁকড়ে যায়। আর সে সম্বন্ধ তো একটা পরিচ্ছন্ন চেক্ লিখে চুকিয়ে দেবার সম্বন্ধ। সে তো এমনি দিনের পর দিন বয়ে চলে না। গোপাল ভাবলে এ অবস্থার একটা হেস্তনেস্ত করা দরকার। সে তার এই নতুন অসোয়াস্তির কোনও পরিষ্কার সঙ্গত কারণ খুঁজে পায় না। শুধু মনে হয় সে কোনো দামী জিনিষ হারাচ্ছে আর সে তা হারাতে দেবে না।

নয়ন বললে, "সত্যি আমার যে কি অনুশোচনা হচ্ছে তা তোকে কী করে বোঝাব।"

গোপাল ধীর গলায় বললে "কেন অনুশোচনা—"

"অনুশোচনা না ? তুই যে আমায় অবাক করলি, ঘরে ঘরে এত মা দেখেছিস্ কিন্তু আমার মত অদ্ভুত মা কখনও দেখেছিস্ ? নিশ্চয় আমারই দোষ, আমিই পারলাম না। আমি যে কী স্বার্থপরতার কাজ করেছি !"

গোপাল দৃঢ়ভাবে বললে, "দুঃখের মালিকানা তোমাকে তো কেউ একলা বইতে দেয়নি। চারপাশে তো আরও দুঃখ আছে।"

নয়ন অধীর হয়ে বললে, "আমি জানি তুই আমায় বকবি, সব সময় 'আমি আমি' করতে মানা করবি, কিন্তু ঠিক আমার মত—"

"না ঠিক তোমার মতনই। তোমার চেয়ে আরও সাংঘাতিক আরও মর্মান্তিক দুঃখ আছে।"

নয়ন চুপ করে থাকে। তার নৈঃশব্দ যে সম্মতি নয় গোপাল সহজেই টের পায়। তার মনে হয় একটা মস্ত বড় পাথর এসে তার যুক্তি বুদ্ধি বিবেচনা চেপে ধরল। তার সমস্ত অন্তরাত্মা চীৎকার করে ওঠে এই পাথর হটাবার জন্যে। কোনও ভান না করে, কোনও মামুলি আশাবাদের ভড়ং না দেখিয়ে নয়ন ও তার মাঝখানে যে অদৃশ্য পাঁচিলটি তোলা হয়েছে তাকে ভাঙবার জন্যে সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। যখন কথা বলে তখন গলা নামিয়ে প্রায় নিজেকেই সম্ভাষণ করে, "দেখ, মনের ব্যাপার হলে কোনও বক্তৃতার ঢংএ কথা বলতে আমার বড্ড খারাপ লাগে। আমি কখনই বলব না, তুমি ঠিক করেছ আর কেউ ভুল করেছে।" তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "তোমার সঙ্গ কেন আমায় এত টানে জান, তোমার কাছে এসে আমি মিথ্যে বলতে পারি না। তুমি মা, সেখানে আমি কি বলব, কিন্তু একটা কথা আমি নিজেকে প্রায়ই বলি, মা-ছেলে, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন এ সম্বন্ধ কি খালি মা-ছেলে, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন বলেই ? তাহলে মানুষের মনটা যাবে কোথায় ?"

এতক্ষণ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গোপাল আস্তে আস্তে বলতে থাকে, "তুমি হয়তো হাসবে, কিন্তু সত্যি বলছি, আমার দ্বারা হয়তো প্রেম করা হবে না। ওটা যেন মা ছেলের মতই। পরস্পরের দোষ, ত্রুটি, দুর্বলতা এগুলো স্বীকার করে না নিলে যেন কাছে আসা যায় না পরস্পরের। আর আমি যদি আমার বাঁচার অহঙ্কার ত্যাগ না করি তাহলে আমি যেন আর একজনের কাছে দাঁড়াতে পারি না। আমাকে দাঁড়াতে হলে একেবারে নিঃস্ব হয়ে দাঁড়াতে হবে। তা না হলে প্রেমের বাজারে আমার জায়গা নেই।"

মনের ব্যাপারে বক্তৃতা করার অভ্যেস নেই বললেও গোপাল নিজের অজান্তেই একটি নিটোল বক্তৃতা দিয়ে ফেলেছে। নয়নের স্তব্ধ সমাহিত দৃষ্টি তার দু চোখের ওপর, সে দিকে চেয়ে বড্ড অপ্রস্তুতে পড়ে গোপাল। কি কথা থেকে কি কথায় এসে গেছে সে, খেয়াল ছিল না। এমন ভাবে নিজের একান্ত ভাল-লাগা না-লাগার সঙ্গে অপরের অনুভূতির কোনও যোগসূত্র স্থাপন করার জন্যে নিজেকে সে সম্পূর্ণ খুলে ধরেছে কেন?

নয়ন হঠাৎ বললে, "থাক এই সব খিটিমিটির কথা। চল্ আজ কোথাও বেড়িয়ে আসি।"

গোপাল অবাক হয়। নয়ন যেন তার মরণ কাঠি জিয়ন কাঠি শাড়ীর আঁচলের তলায় নিয়ে ঘোরাফেরা করছে। একটা মানুষের মধ্যেই মৃত্যু ও জীবনের এমন দ্বন্দ্ব সে আগে কখনও দেখেনি। খুশীতে গোপাল টগবগ করে উঠে বলে, "কী আশ্চর্য! আমি যা ভাবিনি তাই করলাম। শেষ পর্যন্ত একটা মেয়েমানুষের সামনে বক্তৃতা দিয়ে বসলাম।"

নয়ন হেসে বললে, "উঃ কী সাংঘাতিক তুই! আমি আবার মেয়ে মানুষ হলাম কবে?"

"আচ্ছা তুমি মানুষ, মানুষ", গোপাল চেঁচিয়ে বললে।

যতখানি সাদাসিদে হবে ভাবা গিয়েছিল তা মোটেই নয়। একপশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে কিছুক্ষণ আগে। এই ভিজে রাত্তিরে হঠাৎ বেরুনো আর বেরুনোই বা কিসের জন্যে ? বেড়ানোর জন্যে ? প্রস্তাবটা এমনই অসঙ্গত ও উদ্ভট যে নয়ন হেসে বললে, "দাঁড়া, একটু কূটনীতি করতে হবে।" কালীঘাট মন্দিরের দিকে কোন আত্মীয়ার কাছে কী একটা জিনিষ ফেরৎ দিতে হবে এই অজুহাতে নয়ন গোপালের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল।

কিন্তু বেরিয়ে পড়েই তারা দুজনে একসঙ্গে ভাবলে: এবার কোথায় !

গোপালের মনে টপ করে জবাব এসেছিল—লেকে। সঙ্গে সঙ্গেই সে কুঁকড়িয়ে যায়। সেই বহুঘোষিত লেক, সেখানে খোলামেলা যথেষ্টই আছে কিন্তু নয়নকে নিয়ে যাওয়া তার কাছে প্রায় অসম্ভব ঠেকে। তার ভয় হয় পাছে হাল্‌কা হয়ে যাবে, ঠুনকো হয়ে পড়বে তাদের সম্বন্ধ। সেই যে লেখায় পাওয়া যায় "লেকের সঙ্গে", সেই প্রসঙ্গে নিজেদের বেড়ানোর কথা মনে উঠতেই গোপাল দৃঢভাবে মাথা নাড়ায়। তাহলে খোলামেলা জায়গা-মানেই পার্ক, মানেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। বিশেষ করে শাড়ী, গয়না জড়ানো মহিলা চোখ এড়িয়ে যেতে পারে, কিন্তু এই চোখকে চাবুক মারা একেবারে নিরাড়ম্বর মহিলাটির দৃপ্ত চলন ও চাউনি যে কিছুতেই অদৃশ্য থাকবে না, সেটা তার রাস্তায় পা দিয়েই মনে হল।

নয়ন বললে, "আমার যদি একটা ঘর থাকত যেখানে আমায় আর কেউ বিরক্ত করবে না—"

হঠাৎ কথা থামিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, "না, আর 'যদি' না। সমস্ত জীবনই ভাবতাম, যদি এটা হত, ওটা হত। আর 'যদি' না।"

বর্ষার পরেই বলে বোধ হয় রাস্তায় একটু ভীড় কম। তবু তাদের মনে হল বড্ড বেশী গা ঠেক্‌ছে লোকের গায়ে, যেন সবাই কান পেতে আছে তাদের কথা শোনার জন্যে।

নয়ন বললে, "আমি একটা খুব সুন্দর জায়গা জানি। তবে তুই কি যাবি? মন্দিরে যেতে তো তোর কোনও আপত্তি নেই।"

"না, তা নেই যদি না পাণ্ডা থাকে।"

নয়ন হেসে বললে, "আমি জানতাম।"

বর্ষা থেমে যাবার পর চারদিক পরিষ্কার ঝকঝক করছে। একটু ঠাণ্ডা হাওয়াও দিচ্ছে। আকাশটাকে দেখে আধুনিক কবিদের উপমা মনে পড়ে—নীল রাত। সারা আকাশ জুড়ে হীরের মত তারা জ্বলছে। কেওড়াতলা শ্মশানের পাশ দিয়ে রাস্তা। এদিকটায় নিভু নিভু গ্যাসের আলোয় চারদিকে ক্রমশ অন্ধকার ও নির্জনতা। হাওয়া উঠতেই বড় বড় বটগাছের মাথা থেকে কাকের পাল ডেকে উঠছে। নীচে ভিখিরির দল তাদের দৈনিক বাণিজ্য সাঙ্গ করে উঠবার উপক্রম করছে। নয়ন এগিয়ে চলেছিল, একটা মস্ত বড় লোহার সিক দেওয়া দরজার কাছে এসে থেমে যায়। সামনে কতকগুলো গাছ, অন্ধকার, বাগানের মত লাগে। একটা কুকুর ভৌ ভৌ করে তেড়ে এল। মাথায় কম্ফর্টার বাঁধা দারোয়ান কিম্বা পুজারী একজন বেরিয়ে এসে বললে, "যান ভেতরে, কামড়াবে না।"

বাগানটা অন্ধকার, কিন্তু তার একেবারে ডানদিকে যে ছাউনি দেওয়া লম্বা রাস্তাটা গিয়েছে গঙ্গা পর্যন্ত তাতে আলো আছে। সেই গলিটার আলোয় মন্দিরের সিঁড়ি ঠাওর করে তারা ওপরে উঠলো। গোপাল জুতো মোজা খুলতে যাচ্ছিল। নয়ন বললে "থাকনা, কে দেখতে যাচ্ছে।"

ছোট্ট মন্দির, তার চারদিক জুড়ে চত্বর। দক্ষিণ দিকে বাগানের

পাঁচিল ঘেঁষে এক সমাধি বেশ বাহার করা। চারদিকে জাফরি কাটা হাত রাখার জায়গা, ওপরে কারুকার্য করা ছাদ। গোপালের মনে হল কোন মুঘল রাজপুরুষের গড়গড়া খাবার জায়গা। "এই স্থানে পুণ্যাত্মা মহাপ্রাণ সদানন্দ স্বামী তেরশো—সনে অনন্ত স্বর্গধাম..." শাদা ঠাণ্ডা মার্বেলের ওপর কালো হরফে লেখা স্বল্প আলোয় তারা কিছুদূর অবধি পড়তে পারে।

নয়ন হেসে বললে, "আয়, এখানে বসি।" পাথরের থাম্বায় তার শীর্ণ কাঁধ হেলিয়ে দিয়ে বললে, "কেমন ভাল না? তোর বোধ হয় ঠাণ্ডা লাগছে।"

গোপাল কিছু বলে না। ঠাণ্ডা মার্বেল হাতে ছ্যাঁক করে উঠলেও তার পরণে গরম প্যাণ্ট, মোজা জুতো থাকায় বেশ আরাম লাগে। পা দুটো ছড়িয়ে সেও এককোণে হেলান দিয়ে বসে আর তার চোখ অন্ধকারে নয়নকে খুঁজতে থাকে। মুখ দেখা যায় না তার কিন্তু গালের একপাশ, ঠোঁটের সুদৃঢ় লাইন অন্ধকারের ভেতরেও জেগে থাকে। গোপাল বাগানের দিকে তাকায়। ভিজে মাটীর গন্ধে বুক ভরে আসে তার। হঠাৎ সে কেঁপে উঠলো। এই খোলা আকাশের নীচে অন্ধকারে দু-হাত বাড়িয়ে নয়নকে তার বুকের মাঝখানটায় টেনে নেবার ইচ্ছে হয়। সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে ঝাঁকি দিয়ে ভাবলে তাহলে এই জন্যেই কি সে বাইরে যাবার সুযোগ খুঁজছিল, আর নয়ন বেরুবে শুনেই তার মন নেচে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে?

সমস্ত মন তার বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। শুধু নির্জনতার সুযোগ গ্রহণ করা? তাহলে নয়ন কেন, এত কম বয়সী আদর খাবার জন্যে ব্যাকুল মেয়েরা চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নয়নকে সেভাবে তো ভাবতেই পারে না। তাহলে নয়ন তার কে? বন্ধুর মা হিসেবে মায়ের সমান না। প্রেয়সী কথাটা কানে চড় মারে। তাছাড়া ব্যবধান

শুধু বয়সের নয়, দুই জগতের। কিন্তু এ ব্যবধান সত্ত্বেও নয়ন যেন তার নিজেরই মন। সে আর কোনও ভাবে তাকে দেখতে পারে না।

নয়ন তাকিয়ে থাকে অন্ধকার বাগান পার হয়ে আলোয় ভরা গলিটার দিকে। গোপালের নজরে পড়ে তার ঠোঁট দুটী, ঠিক যেন কোঁকড়ানো কালো গোলাপ একটী। সে একটু অস্থির ভাবে চেঁচিয়ে ওঠে, "আমি তোমার কে?"

নয়ন হাসে শান্ত ভাবে। যেন কী মনে পড়েছে তার। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বললে, "তুই আমার ভগবান।"

গোপাল অতি সম্ভ্রমে সরে আসে নয়নের কাছে। সে যেন যত্ন করে একটা ফুলের গায়ে হাত বুলোচ্ছে এমনি ভাবে তার মুখখানা নয়নের ঘাড়ে চুলে গালের ওপর রাখে। নয়ন চম্‌কালো না। ধীরে ধীরে বললে, "আমার মত একটা বুড়ীকে তুই আদর করছিস্? কী পেলি আমার মধ্যে?"

গোপাল এবার নয়নকে তার বুকের মধ্যে টেনে নেয়। তারপর বেশ অস্থির ভাবে কয়েকবার চুম্বন করে তাকে। নয়ন তার হাত ছাড়িয়ে বললে "অত হাম্‌লিয়ে আদর করিস নে, ওটা টেঁকে না।"

নয়নের গলায় কোনও বিরক্তি নেই, ক্ষোভ নেই। বরং আনন্দের উষ্ণতায় ভরাট। গোপালের হাতটা সে নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললে, "কোনও কোনও ব্যাপার আছে যা লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চুকিয়ে ফেলার না।"

গোপাল আশ্চর্য হয়। এই ভরাট হৃদয়ের মুহূর্তেও নয়নের বুদ্ধির দীপ্তি ঝকমক করে ওঠে। নয়নের বুকে মাথা রেখে সে ভাবলে এটী তারই মনের কথা, নয়ন প্রতিধ্বনি করলে। নিজের ভাল লাগা না লাগাকে সে তো কোনওদিন ছোটখাটো উপসংহারের ডগায় বাঁধতে চেষ্টা করেনি। যে কোনও নাটকীয় সিচ্যুয়েশানের চেয়েও জীবন যে

অনেক বড় তার কাছে। ভাল লাগা কি চুকিয়ে দেবার ফুরিয়ে যাবার ব্যাপার!

গোপালের চুলে হাত বুলোতে বুলোতে নয়ন বলেল, "তুই একটা পাগল। তোর আর কটা এরকম বুড়ী আছে?"

"আর একটীও নেই। সত্যি বলছি ছুঁড়ীও নেই। যাদের সঙ্গে আলাপ আছে তাদের ঠিক তোমার মত করে সব বলা যায় না।"

"তুই আমার মধ্যে এমন কী পেলি যে এত বলছিস্?"

"তোমার মধ্যে—" বলেই গোপাল মাঝখানে থেমে যায়। সে আবার তন্ময় হয়ে নয়নকে দেখতে থাকে। এক সঙ্গে অনেক কথা মনে পড়ে যায়। একটা উপমাও ঠোঁটে আসে। সঙ্গে সঙ্গে তার হাসি পায়। মনে হয় কবিতায় ওগুলো বেশ চালানো যায় কিন্তু আসলে বোধ হয় ওতে কিছুই বলা হয় না। কি করে সে নয়নকে বোঝাবে? চারদিকের হতাশা, ভেঙ্গে পড়া একটানা জীবনবিতৃষ্ণার মধ্যে বারেবারে সে যে মস্ত বড় আনন্দময় এক জীবনের স্বপ্ন দেখেছে, তারই প্রকাণ্ড অংশ হয়ে নয়ন এসেছে তার কাছে। কিন্তু এ ধরনের কিছু বলতে গেলে সে নিশ্চয় ঠাট্টা করবে, হয়তো গম্ভীরভাবে বলবে, "বাজে কথা বলিস নে।"

নয়নের মাথাটা তার বুকের মধ্যে নিয়ে গোপাল তাকে আদর করে। আর তার সমস্ত শরীর মন এক প্রশান্ত উষ্ণতায় ছেয়ে যায়। যেন কোনও উত্তেজনা নেই অথচ ভরাট মনে হয় নিজেকে। সেই অনেকদিন আগে এক ময়দানের মিটিং-এ ঠিক এমনি এক উষ্ণতা তাকে ছেয়ে গিয়েছিল। সে আভায় তার মনে হয়েছে সমস্ত সংশয়ের সমাধান না থাকুক, বিরক্তির পার আছে, যন্ত্রণার গতি আছে, জীবনের লক্ষ্য আছে।

সন্ধের পর বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় এখনও বাগানের জায়গায় জায়গায় জল

দাঁড়িয়ে। গাছের পাতা থেকে হাওয়ার দমকে জলের ছিটে আসে। মন্দিরের ওপরে আকাশ খানা দেখা যায়। সারা আকাশ ভরে তারা জ্বলছে। একফালি চাঁদের নিচ দিয়ে মেঘের সারি ভেসে চলেছে।

গোপাল একবার কিসের শব্দ পায়। নয়ন মৃদু গলায় বললে "কে ?" যেন পাতার ওপর পায়ের শব্দ। গোপাল ঘাড় তুললে। চারদিক নিঃশব্দ। হঠাৎ গলিটা আরও আলো হয়ে ওঠে। সংকীর্তনের আওয়াজ বেড়ে যায়। অন্ধকার পার হয়েই সামনের শ্মশানে ঢুকবার বাঁধানো ছোট গলিটা দিয়ে কারা আসে কার শব নিয়ে। একপাশের পাঁচিলের গা ঘেঁষে সেই মিছিল, মাঝখানে শুধু অন্ধকারটুকুর ব্যবধান। গোপাল আর নয়ন আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে এই পরপার যাত্রার ছবি দেখে। খাটের ওপর এলোচুল ছড়ানো এক কম বয়সী মেয়ের পা মাথা ইলেকট্রিকের ঝলকানো আলোয় দুলে ওঠে। নয়ন গোপালের বুক থেকে মাথা তুলে ধীরে ধীরে বললে, "মাকেও নিয়ে গিয়েছিল এই রাস্তা দিয়ে।"

আবার চারিদিকে নিঃশব্দ। দেয়ালের ওপারেই শ্মশান। খোলের আওয়াজ সেখানে গিয়ে থেমে যায়। গলিটা আবার ঝিমিয়ে পড়ে। গোপাল নয়নের চুলের মধ্যে হাত রেখে একদৃষ্টিতে বাগানের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কতক্ষণ এভাবে ছিল তাদের খেয়াল নেই। হঠাৎ পায়ের শব্দ খুব কাছে হওয়ায় তারা দুজনেই চমকিয়ে ওঠে। নয়নই প্রথমে সরে বসেছিল। মন্দিরের চত্বরের ওপরে সেই কম্ফর্টার মাথায় বাঁধা লোকটী, সঙ্গে প্যাণ্ট আর বুশ শার্ট পরা একটী তরুণ।

ব্যায়াম করা শক্ত চেহারা তরুণটীর। কী মনে করে সে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু নয়নের দিকে তাকিয়েই সে থম্‌কে দাঁড়ায়। এক মুহূর্তে গোপাল বুঝতে পারে। কিছুক্ষণ আগে যে অস্পষ্ট আওয়াজ পাওয়া গিয়েছিল তার কারণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেউ তাদের ওপর চোখ

রেখেছিল, কেউ আড়ি পেতে শুনছিল তাদের কথা। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে দৃশ্যগুলো পর পর—অপমান, চীৎকার, লোক জড় হওয়া, মারামারি, শেষে পুলিশ।

ছেলেটা নতুন রপ্ত করা ইংরেজীতে কর্কশ গলায় বললে, "এটা প্রেম করার জায়গা না।"

প্রেম করা? কেউ যেন মাথায় বাড়ি মারলে গোপালের। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে সে। একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন রাগে সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আর কোনও কথা হলেই হয় তো গোপাল আর চুপ করে থাকতে পারত না। আর ছেলেটার উদ্ধত আচরণ দেখে মনে হল তাকে জোগাড় করাই হয়েছে এই জন্যে। কিন্তু হঠাৎ তার মনে পড়লো, সে একলা নেই। নয়ন কোথায় যাবে যদি একটা কাণ্ড হয়ে যায়। প্রাণপণে নিজেকে শান্ত করে বললে, "বাংলায় বলুন"।

পাশের লোকটা বলে উঠলো, "ভালোয় ভালোয় বেরিয়ে যান। আবার রোয়াব দেখানো হচ্ছে। প্রেম করবেন তা মন্দিরের মধ্যে কেন? লেক ছিল না?"

নয়ন হঠাৎ গোপালের হাতে ঝাঁকি দিয়ে বললে, "গোপাল।" তারপর তাকে ঠেলে সিঁড়ি থেকে নামায়। উত্তেজনায় তার গলা কাঁপছে। পেছন থেকে টিটকিরি শোনা গেল। গোপাল আবার থমকে দাঁড়ায়। নয়ন দৃঢ় গলায় হুকুম করলে, "এক মুহূর্ত দাঁড়াবে না গোপাল"। তার গলার আওয়াজে গোপালের সম্বিত ফিরে আসে। অন্ধকারে লোহার গেটের কাছে আসতেই কুকুরটা আবার ঘেউ ঘেউ করে উঠলো। এবারে তার আওয়াজটা আরও কানে লাগে।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে দুজনে অনেকক্ষণ কথা বলে না। একটা প্রকাণ্ড অসোয়াস্তির হাত থেকে তারা রক্ষা পেয়েছে এজন্যে সোয়াস্তিও যেমন, তেমনি একটা কিসের খোঁচা লেগে থাকে। গোপাল পানের

দোকানে গিয়ে জর্দা দেওয়া এক খিলি পান নয়নের হাতে তুলে দিয়ে বললে, "তুমি আর এই বিচ্ছিরি ব্যাপারটা নিয়ে ভেবো না।"

নয়ন তাকে আশ্বস্ত করলে। যদিও তার বুক কাঁপছিল তখনও কিন্তু তার মনে ভাসছিল তার অসোয়াস্তির আগের মুহূর্তগুলো। দরজার গোড়া থেকে বিদায় নেবার সময় সে যেন গোপালকে আরও নতুন করে দেখে।

ভালবাসার কথা উঠলেই গোপালের সঙ্গে তার আশেপাশের সমবয়সী লোকেদের ঝগড়া বেধে যেত, এখনও যায়। যে লোকটা প্রকৃতিতে একেবারেই বেঁড়ে সে একমাত্র প্রেমের ক্ষেত্রে কী করে বিরাট ঐশ্বর্যশালী পুরুষ হয়ে উঠবে একথা ভাবতেই সে প্রতিবাদে অস্থির হয়ে ওঠে। প্রথম-দাড়ি-কামাবার যুগে একটি জনপ্রিয় প্রেমের কবিতা পড়ে সে বড্ড হোঁচট খেয়েছিল। লেখক তাঁর প্রেমিকাকে সম্বোধন করে বলছেন, যদিও তিনি স্বয়ং নরকের কীট কিন্তু তিনি যদি তাঁর প্রেমিকার কাছ থেকে "একমুঠো প্রেম" লাভ করেন তবে তা পান করে প্রায় দেবদূতের মতন বলবান হয়ে পড়বেন। গোপাল বরং মেয়েদের দেহ নিয়ে একেবারে দা-কাটা কড়া গল্পে যোগ দিতে রাজী, কিন্তু প্রেমের ইলেকট্রিসিটিতে জড়কে সজীব করা যায় ইত্যাদি যে সব চিন্তায় সিনেমা উপন্যাস জমে এবং সমস্ত অর্থহীন যৌবনের প্রকাণ্ড ধিক্কারটা এক অনির্দিষ্ট প্রেমের আবির্ভাবের স্বপ্নে কাটিয়ে দেওয়া যায়, সেই মিথ্যে গল্পের ছলেও ঠাঁই দিতে নারাজ। এজন্য সে নিয়তই প্রেমিক বন্ধুদের কাছ থেকে "সন্ন্যাসী", "সিনিক" কিম্বা অতি চালু ইংরেজী বিশেষণে দাগী হয়েছে। গোপাল কিন্তু তার জন্যে একচুলও পরোয়া করেনি। সে ক্রমশই বুঝতে পারছে যদি তার জীবন সে অর্থপূর্ণ করে তুলতে পারে তাহলেই তার প্রেম দাঁড়ায়। যার জীবনে বাতি নেই, হাওয়া নেই, তার প্রেমও অন্ধকার ডোবা।

সে রাত্তিরে বাড়ি ফিরে গোপাল নয়নের কথা ভাবতে থাকে। নয়ন তার জীবনে আসেনি কোনও আলগা অভিজ্ঞতা হয়ে। এটা সে বারবার অনুভব করে। নয়ন এসেছে তার সমস্ত চিন্তা ভাবনা, তার অস্তিত্বের সূত্র ধরে, আবার তার অস্তিত্বকে ছাপিয়ে। সন্ধে হলে তাই গোপাল ছট্‌ফট করে। আরও তাড়াতাড়ি হাত চালায় কাজ শেষ করার জন্যে। কালীঘাটের দুখানা ঘরের একখানি ঘর তাকে টানতে থাকে।

কয়েকদিন হল বৃষ্টি ধরে গেছে। সন্ধের পর আকাশের রং বদলায়। আরও তারা ওঠে। আরও শাদা হাল্‌কা মেঘ আকাশে ভাসে। সেন-কে আল্‌পিন দিতে দিতে গোপাল অস্থির হয়ে পড়ে। তার ওপর ডেভিডকে কোনও কোনও সন্ধ্যায় "হিউমারে" পেয়ে বসে, রায় নাকী কাঁদে, চক্রবর্তী পারিবারিক দুর্ভোগের ফিরিস্তি দেয়, আর ম্যাক্‌মোহন সাহেব উপদেশ সুরু করে। অফিস থেকে বেরিয়ে গোপাল প্রায় ছুটতে ছুটতে বাস ধরে। বাস থেকে নেমে খেয়াল হয় চুল ভয়ানক উড়ছে।

নয়নের ঘরের দরজা যত এগিয়ে আসে ততই সে অস্থির হয়ে পড়ে। আর এ অস্থিরতা তার কাছে একেবারে নতুন, তার মেজাজের দিক থেকে স্বতন্ত্র। গোপালের মনে হয় সে এক খাড়া পাহাড়ের রাস্তায় চলেছে, দুপাশে যার খাদ। যদি সে নেহাৎ ভদ্র হয়, তার মন শরীর যখন আনন্দে চীৎকার করে ওঠে তখন যদি সে পাথর চাপা দেয় সেই আনন্দের মুখে তাহলে সে হয়ে পড়ে একটি হিসেবী মানুষ, যার ভাল লাগাটাও হিসেব। আর যদি সেই আনন্দের একটা ঝাড়া-ঝাপটা রূপ দিতে চায়, যার জন্যে সে মাঝে মাঝে অস্থিরতা বোধ করে তাহলে তার ভয় হয় নয়ন ছোট হয়ে যাবে। দ্বিতীয় সম্ভাবনাটার দিকে যেন নয়ন অতিমাত্রায় সজাগ।

গোপাল কী ভাবে নিজেকে বোঝাবে অনেকসময় ভেবে পায় না। অথচ কথাটা উঠবেই। মাঝ রাত্তিরের হাওয়া যখন তার ঘরের বই খাতা উড়িয়ে নেয় তখন তো একজনের কথাই তার মনে পড়ে তার রক্তমাংস শুদ্ধ, খুব অপার্থিব ভাবে নয়। সেই যেমন ভাবে বৈষ্ণব কবিরা কথার কারচুপী না করে বলেছিলেন, প্রতি অঙ্গের জন্যে প্রতি অঙ্গ কাঁদে, ঠিক সেই ভাবে। গোপাল কী করে ভুলে থাকবে সেই কথা ?

সেদিন সন্ধেবেলা তারিণীদা ও নদিদি তাদের মেয়ে নাতিদের সঙ্গে সিনেমায় গিয়েছে। এই একটাই আনন্দের খোরাক আছে এ বাড়ীতে। উঠতে বসতে নদিদির যে মেয়েটি তার নিজের সন্তানদের মৃত্যুকামনা ছাড়া কথা বলতে পারে না, সেও সিনেমার নাম শুনলেই পাউডারের পাফ্ এমন অধ্যবসায়ের সঙ্গে গালে রগড়াতে থাকে যে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। নয়ন কাজকর্ম সেরে বসেছিল। গোপাল ঠিক যা চায় নি তাই করে বসলে। তাকে ঠাট্টা হাসিতে নয়ন টেনে আনতে চাইলেও সে· এতক্ষণ গম্ভীর হয়েছিল। হঠাৎ নয়নের হাতটা নিজের মধ্যে নিতে গিয়েই সে বুঝলে ভুল করেছে। নয়নের চোখের পাতা ভারী হয়ে উঠলো। তাকাতেই তার চোখ চকচক করে ওঠে। গলার স্বর একটু বিকৃত শোনাল, "তুই আদর করলে আমার গা পচে যাবে না, কিন্তু আমি যে তোকে আরও বড় দেখতে চাই গোপাল।" তারপর সহজভাবে বললে, "দেখ আমি কোনও বিভীষিকার জন্যে বলছি না। তুই এসেছিস্ একেবারে নতুন হয়ে, এত বছর পর। আমি আবার নতুন হয়ে উঠছি। কোনও দায়সারা গোছের ব্যাপার দিয়ে মন ভোলাতে রাজী নই।" গোপালের হাত দুটো তার নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে নয়ন বললে, "তোর যে বন্ধু আমি, আমার কাছ থেকে এত তাড়াতাড়ি পালিয়ে যেতে চাস্?"

গোপাল চমকে ওঠে। তার মনে হল নয়নকে সে ছোট করেছে। সে প্রায় ছেলেমানুষের মত চীৎকার করে ওঠে, "না, না, আমি তা চাই না, তুমি আমায় ছেড়ে যেও না।"

আরও বলতে চেয়েছিল। ক্ষোভে, লজ্জায় বলতে পারে না। কিন্তু তার তীব্র ব্যাকুলতা নয়নকে স্পর্শ করে। সে তাড়াতাড়ি বলে, "থাক্ থাক্ আর বলতে হবে না।"

তেরো

সে রাত্তিরে নয়নের ঘুম ছিল না। যার উঠতে বসতে সব কথাতেই যত্ন, যে সুপুরী কাটবে তাও ঝিরিঝিরি করে, সে কেন ঘর বাঁধতে পারছে না? নয়ন তো কোনওদিন কিছু উড়িয়ে পুড়িয়ে দিতে চায় নি। সে না হয় টাকার কথাটা ঠিক বোঝে না কিন্তু সামান্য পুরনো জিনিষও তার হাতে ঝক্ঝকে হয়ে ওঠে। অথচ স্বামীর সঙ্গেও তার বন্‌ল না আর ছেলেও বলেছে সে নাকি মায়ের কর্তব্য করে উঠতে পারে নি।

শীত আসছিল। ভেজানো দরজায় ধীরে ধীরে কয়েকটা টোকা পড়ল। নয়ন বললে, "কে"।

একটা ছোট ছেলের মিষ্টি গলার আওয়াজ এল, "আমি বড়বাবু।"

একটি আঁটো সাঁটো গড়নের ডানপিটে পাঁচ-ছ বছরের ছেলে। ওপরের তলায় উকীলবাবুর নাতি। তিনটী ভায়ের ওপরে বলে নয়ন তাকে ডাকে বড়বাবু।

বড়বাবু এসেই গম্ভীর চালে চৌকাঠের গোড়ায় ছেঁড়া ন্যাতায় পা মুছতে থাকে। তারপর বড়মানুষের মত ধীরে ধীরে মাদুরের এক পাশে বসে বলে, "ছোড়দি, তুমিও সেদিন মেয়েমানুষের মত কি কুটুর কুটুর করছিলে।"

নয়ন হেসে গড়িয়ে পড়ে। বলে, "ওমা সেকি কথা, আমি মেয়ে মানুষ ?" বড়বাবুর হাতটা ধরে বলে, "কেন, মেয়েমানুষরা কী করে ?"

বড়বাবু তার মিটমিটে চোখ দুটো এদিক ওদিক মেলে বললে, "ঐ যে দিন রাত্তির বলে আমার ছেলে তোমার ছেলে, খালি ছেলে ছেলে, ডালভাত, খালি কুটুর কুটুর।"

নয়ন বললে "কী সব্বনেশে কথা গো, আমার ছেলে তোমার ছেলে !"

বড়বাবুর আর ভাল লাগে না প্রসঙ্গটা। বললে, "জান ছোড়দি, মরা দেখলাম !"

"কোথায় ?"

"ঐ যে সব দাড়িওয়ালা লোকগুলো একটা ঠেলাগাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে আর খুব পুজো হচ্ছে।"

নয়ন হেসে ফেলে। কাছেই গুরুদ্বারে শিখদের উৎসব চলেছে। সে বলে, "দূর ওটা মরা না, পাঞ্জাবীদের পুজো।"

বড়বাবু চুপ করে থাকে। সে যে ছোট হয়ে গেছে সেটা কী ভাবে এড়াবে ভাবতে না পেরে বলে, "তাই তো একটা নমো করলাম।"

"নমো করলি কেন রে !"

বড়বাবু এবার সত্যিই বিব্রত বোধ করে। কানের মধ্যে একটা আঙুল ভরে দিয়ে নয়নের কোলে এলিয়ে পড়ে। তারপর হঠাৎ নিজেকে ঝাড়া দিয়ে উঠে বলে, "বাঃ অভ্যেস যে।"

নয়ন আবার হাসিতে লুটোয়, বলে, "বাঃ বড়বাবু, খুব ভাল বলেছ।"

বড়বাবু উৎসাহিত হয়ে বললে, "জান আমি একটা গল্প জানি।" তারপর তার রং-চংএ ছোটদের ইংরেজী গল্পমালা থেকে বলতে সুরু করে, "একটা পীটার ছিল, একটা ড্যানি ছিল তারা বনে গেল…

ড্যানি মরে গেল। পীটার বল্লে, ড্যানি আমায় জল দাও। তারপর পীটার খুব রেগে গেল। একটা বাঁশ দিয়ে দড়াম, দড়াম, দড়াম…"

"তুমি আমায় মারছ বড়বাবু।"

বড়বাবু রেহাই পেয়ে বললে, "এবার তুমি একটা গল্প বল ছোড়দি।"

নয়ন তাকে কোলের একপাশে বসিয়ে তার চুলগুলো কপালের ওপরে এলোমেলো করে দেয়। হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় অন্তুর কথা। কুড়ি বছর আগে তার বাঁচার প্রথম বিস্ময় অন্তুর চুল এমনি করে এলোমেলো করে দিতে দিতে সে গল্প বলত। একেবারে জল জল করে মনে পড়ে সে কথা। জানলা দিয়ে বেগুন ক্ষেতের ওপর চাঁদ উঠেছে দেখা যায়। নীচে অনেকক্ষণ হল শ্বাশুড়ী ননদের পারিবারিক চেঁচামেচি জুড়িয়ে এসেছে। খালের নৌকো থেকে গান আসছে ভেসে। নয়ন ঠিক আগেকার মত গল্প বলতে সুরু করলে: একটা হীরামন পাখী ছিল…

গল্প থামলে ন্যাতায় ঠিক আগেকার মত গম্ভীরচালে পা মুছতে মুছতে বেরুবার আগে হঠাৎ বড়বাবু দাঁড়িয়ে পড়ে। নয়নের দিকে তাকিয়ে বলে, "ছোড়দি তুমি কাঁদছ!"

"দূর, পেঁয়াজ লেগেছে চোখে।"

দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে একবার বড়বাবুর মনে হল তার ছোড়দিকে বলবে এত রাত্তিরে সে আবার পেঁয়াজ কখন কাটলো। কিন্তু নয়নের গম্ভীর মুখটা দেখে সে অন্য কথা বলে, "হ্যাঁ ছোড়দি আমারও হয়।"

কোথা থেকে কী হয়ে গেল। একটা বাচ্চা ছেলেকে গল্প বলার ছলে এক হ্যাঁচকায় সমস্ত অতীতটা নয়নের চোখের সামনে উপড়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে সে অন্তুকে দেখতে পায়। তার ছোট ছেলের ছবি অতখানি মনে ভাসে না কিন্তু অন্তুকে সে দেখতে পায় দেয়াল ধরে

দাঁড়াতে চেষ্টা করছে। এক একবার তার মনে হয়, হয়তো অন্তর এই আপাত নিস্তেজ ভাবটা ভেতরের মানুষটাকে চেপে দিয়েছে। কিন্তু কী করে এই অবসাদগ্রস্ত ক্ষীণপ্রাণ অন্তর ভেতর থেকে সে এক গনগনে লোহার ছেলেকে বের করবে!

বরঞ্চ এটাই কি সত্যি নয় যে অস্তু তাকে তার পুরনো জীবনের অপমান থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেও নতুন মান দেবার কথা ভাবে নি? মাকে প্রায় বোঁচকার মত করে মাথায় নিয়েছে সে, তাতে তার নিজেরই কাঁধ ভেঙ্গেছে। কোনওদিন সে তো ভাবেনি মা তার পাশে হেঁটে চলতে পারে। এমন কি এগিয়েও যেতে পারে।

কাল রাত্তিরে দুটো ডালশুদ্ধ গোলাপফুল দিয়ে গেছে গোপাল—দুটো কালচে লাল কুঁড়ি যে রংটা তার ভাল লাগে। কোটের পকেট থেকে আস্তে আস্তে বার করে একটু ইতস্তত করেছিল তারপর নয়নকে বলেছে, "তোমার তো এখানে অনেক ঠাকুর দেবতা আছে তার পাশে রেখে দাও।" নয়ন হেসে একটা বড় কাঁচের গেলাসে তা রেখে দিয়েছে নদিদির এক গুচ্ছের ঠাকুর দেবতার ফটোর ভেতর। আজ সে দুটো কুঁড়ি ফুটেছে। জানলার পাশ থেকে একটা মৃদু গন্ধ উঠছে। নয়ন সেদিকে তাকায় আর তার মন কেমন করে। তার ভাল লাগার দাম কোনওদিন পায়নি সে। আবার নতুন করে সেই ভাল লাগা গুলো জাগিয়ে তোলা কেন?

আজ শুক্রবার, কারুর ছুটীর দিন। কার যেন পায়ের শব্দ পেল নয়ন। উঠে দৌড়ে গিয়ে দেখলে একবার। কেউ না, মনের ভুল। মনে হল কত যুগ দেখেনি সেই ছেলেটীকে—ছেলেটী বল্লেও যার গুরুত্ব কমে যায় অথচ লোকটীকে বল্লে যাকে কিছুতেই প্রকাশ করা যায় না।

এবারে খুব স্পষ্ট আওয়াজ। তেমনি শান্ত ধীর ভারী জুতোর শব্দ। বেশ ঘোষণা করে দিতে দিতে আসে গোপাল।

নয়ন ঘরের ভেতর থেকে চীৎকার করে ওঠে, "জানি কে এসেছে।" গোপাল ঘরে ঢুকলে ধীরে ধীরে বলে, "কত যুগ পরে এলি !"

গোপাল তার ফ্ল্যানেলের প্যাণ্টটা ওপরে উঠিয়ে ঘরের এক কোণে লোহার সিন্দুকটার গায়ে ঠেস দিয়ে বসে। এই সিন্দুকেই ছেলেকে গোল্লায় দেবার জন্যে তারিণীদা টাকা জমাচ্ছেন। পাড়াপড়শীদের সোনার মাকড়ী হার জমে আছে এরই দেরাজে।

নয়ন বল্লে, "একটু সর।" তারপর তার গায়ের আলোয়ানটা ভাঁজ করে গোপালের পিঠের নীচে দিয়ে দেয়। লম্বা খোলা হাতখানা আল্‌তো ভাবে গোপালের গায়ে এসে লাগে। গোপাল সে হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেবার আগেই নয়ন হাত সরিয়ে নেয়। ধীরে গলায় বলে, "আমি ফেল্‌না নই। তারিণীদারা আসবেন আধঘণ্টা পরে—"

গোপাল তার কথা শেষ হতে দেয় না। অস্থিরভাবে বলে ওঠে "আমায় মাপ কর।"

নয়ন হাসে। আর গোপালের মনে হয় সে একটা নিশ্চিত সর্বনাশের হাত থেকে বেঁচে গেছে। সে জানে সুযোগ পেয়ে কোনও রকম একটু ফূর্তি করার ভাব তার আচরণে যদি সামান্য প্রকাশ পায় সঙ্গে সঙ্গে নয়ন পাথর হয়ে পড়ে। নিজের আচরণে প্রায় চোখের কাছে জল আসে গোপালের।

নয়ন কথা পাল্‌টিয়ে বলে, "আজ অন্তু এসেছিল। কী বলছিল জানিস্‌ ?"

"কী ?"

"বলছিল, জীবনটা তো প্রায় পার করেই দিলে মা, এখন আবার কেন ঝামেলা বাড়াচ্ছ।"

"তুমি কী বল্লে ?"

"আমি কী বল্লাম", অস্থির ভাবে এদিক ওদিক তাকায় নয়ন। সে যেন জানলা দরজা দেয়ালের ভেতরে উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারপর স্পষ্টভাবে বল্লে, "আমার মনে হয় কি জানিস, মনে হচ্ছে আমার জীবন সুরুই করিনি। এদ্দিন যেন রিহার্সাল দিচ্ছিলাম।"

গোপাল শান্তভাবে বলে, "আমি ভাবি কেন আমার একটা জন্ম হয়েছিল। একটা জন্ম-তে তো কিছুই জানা যায় না। কতটুকুই বা জানা যায়।"

নয়নের আশ্চর্য লাগে। অন্তু সম্প্রতি একটা কথা ব্যবহার করছে, "মেরে তো দিলাম, আর কটাই বা দিন।" পঁচিশ বছর পার হতে না হতেই তার জীবনের সব ক্ষিদে মিটে গিয়েছে। এখন কোনও রকমে হেঁচড়ে হেঁচড়ে কয়েকটা দিন কোনও ঝামেলা না নিয়ে কাটিয়ে দিতে পারলেই সে বেঁচে যায়। আর গোপালের কী সর্বগ্রাসী ক্ষিদে। একটা জন্মতে তার কোনও মতেই কুলোয় না।

উৎসাহে জ্বলে-ওঠা চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে নয়নের মনে হতে থাকে কোথায় যেন ছেলেটার সঙ্গে বড়বাবুর একটা যোগ আছে। তেমনি ডাঁটো, খোলা মন, পায়ের নীচে যেন পৃথিবী দুলছে। আবার তার গলার স্বর, তার ধৈর্য আর জিজ্ঞাসা যেন হঠাৎ তার বাবার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। তার মনে হল ঠিক বাবার মত গোপালের বুকে মাথা রাখলে তার দুচোখ জুড়িয়ে আসবে।

গোপাল ধীরে ধীরে বলে, "জান এক একটা মানুষের তলই পাওয়া যায় না। তাকে বোঝার জন্যে অনেক ধৈর্যের দরকার, পরিশ্রমের দরকার।"

আজ রাত্তিরে একটু শীত পড়েছে। নদিদি যে রকম হাওয়ায় চীৎকার করে দোর দেয় আর বলে "বড্ড বেয়াড়া হাওয়া, অসুখ বিসুখ করবে", সেই রকম হাওয়া দিচ্ছে বাইরে।

নয়ন বললে, "চমৎকার না ?"

গোপাল বললে, "আমার মনে হয় কি জান মন, বাঁচার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হল আনন্দ। আনন্দ না হলে মানুষ বাঁচে কী করে ? আমরা বেশীর ভাগ লোকই আনন্দ পাইনি বলে অনুযোগ করি। কিন্তু বুকে হাত দিয়ে কি আমরা বলতে পারব, আনন্দ পাওয়ার জন্যে আমরা চেষ্টা করেছি। আমরা ভাবি তা আমাদের দোর গোড়ায় হেঁটে হেঁটে আসবে। আনন্দ পেতে হলে আমাদের আরও বড় হতে হবে, তার জন্যে দায়িত্ব নিতে হবে।"

হঠাৎ অভিভূত হয়ে নয়নের হাত ধরে বলে, "মাঝে মাঝে এমন মন কেমন করে।"

"ওসব কথা অন্যকে শোনাস্।"

"না না আমি বোঝাতে পারলাম না। আগে ভাবতাম···যাক্ সে কথা। ক্রমশঃ মনে হচ্ছে পালিয়ে ছল করে আনন্দ পাওয়া যায় না। নিজেকে খতাচ্ছি, আমি কি আনন্দ পাওয়ার দায়িত্ব নিতে পারি ?"

প্রত্যেকের বুকের মধ্যে ঘুমায় এক সমুদ্র। তা কথা বলে না, তাই মনে হয় নেই। কিন্তু কখনও তা নড়ে ওঠে, দুলে ওঠে। গোপালের কথায় তেমনি এক সমুদ্র নড়ে উঠলো নয়নের বুকের মধ্যে। সে চুপ করে থাকে, ঝিম্ মেরে থাকে। একবার ভাবে, কী হবে এই আলোড়ন তুলে ? যা কিছু ভালবাসতো তা সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে ভুলে গিয়ে নিজেকে ধুয়ে মুছে ফেলবার চেষ্টা কি সে করেনি ? তাহলে আবার কেন জাগা, তাও এত বছর পর ?

নয়ন হঠাৎ বললে, "অন্তু শেষ পর্যন্ত রাজী হয়েছে।"

"কিসে ?"

"আলাদা বাসা করতে। বলছিল এভাবে বাইরে খেয়ে শরীর

টিকছে না। প্রথমে তো সে কিছুতে রাজী হয় নি। এখন একটু ধীরে ধীরে দাঁড়াচ্ছে।"

"বাসা কি পেয়েছে, কোথায়?"

"শুন্‌ছি বালীগঞ্জ ষ্টেশন ছাড়িয়ে, বেশ দূরে। ওর বন্ধু মতি খবর দিতে এসেছে। অন্তু বলছিল, আমাদের মত ঝড়ে পড়া লোক কি কলকাতায় থাকতে পারে আজকাল?"

গোপাল গম্ভীর ভাবে বললে, "হ্যাঁ তুমি যাও, কোনও আফশোষ রেখো না।"

নয়ন চলে যাবে। হয়তো এবার থেকে দেখা সাক্ষাৎ কালেভদ্রে হবে। যে অনুভূতির তীব্রতায় সে দুলেছে গত কয়েকমাস ধরে তা ক্রমশঃ ফিকে হয়ে পড়বে। আবার চারদিকের বেঁড়েমির অত্যাচারে বাঁচার যে বিরাট ঐশ্বর্যের ছবি কেতাব থেকে বেরিয়ে এসে তার কানে কানে কথা বলেছিল তা দৃষ্টি থেকে দূরে অপসৃত হতে হতে মিলিয়ে যাবে। আবার এক বড় অফিসের ছোট সাহেব হবার জন্যে হয়তো সে উঠে পড়ে লাগবে, কিম্বা বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সন্ধেবেলার মজলিশে সংস্কৃতির প্রতি কর্তব্য পালন করবে। গোপাল হঠাৎ লজ্জা পেয়ে যায় মনে মনে। যা সে ব্যঙ্গ করে প্রায় তাই হয়ে পড়েছিল আর একটু হলে! নয়ন থাকলেই পৃথিবী হাসছে, আর নয়ন না হলেই পৃথিবী আঁধার—এ ধারণা সে ন্যাকা বলে ভাবে নি এতদিন?

কিন্তু ন্যাকা পাকা ইত্যাদি চোখা কথা বলেও তো চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। সত্যিই তো নয়নের চেয়ে রূপে বুদ্ধিতে বড় আরও অনেকে আছে। কিন্তু তবু নয়ন তাকে টানে কেন? গোপাল সিন্দুকের গায়ে নিজেকে আরও এলিয়ে দিয়ে ভাবে। কিন্তু কোনও যোগ্য উত্তর খুঁজে পায় না।

নয়ন এতক্ষণ অন্তর তরফ থেকেই বলছিল। গোপালকে এতটা

চুপ করে থাকতে দেখে হঠাৎ ভেঙ্গে পড়লে, "বড্ড দূর হবে। ষ্টেশন ছাড়িয়েও কতদূর, যাতায়াতে এত সময়", গোপালের হাত দুটো সে নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেয়।

উত্তেজনা থেমে গিয়ে গোপালের একটা অদ্ভুত প্রশান্তি নেমে আসে। বলে, "মন, তুমি যাও, কোনও আফশোষ রেখো না।"

তারিণীদারা এসে গেলেন। কী একটা হিন্দি মহব্বতের ছবি দেখে ফিরেছেন। সম্প্রতি তারিণীদার মেজাজ শরীফ। তাঁর প্রিয় পেল্লাই লোকটা আবার "মার্টার" করে এসেছে। স্ত্রীকে বললেন সিনেমার কোনও এক ঘটনা উপলক্ষ্য করে, "যিনি দুঃখ দিয়েছেন তিনিই আনন্দ দেবেন। দুঃখ না হলে আর আনন্দের দাম কী?"

নদিদি ইতিমধ্যে প্রায় লেপের মধ্যে সিঁধিয়ে গেছেন। লেপ গায়ে টানতে টানতে আরামের নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, "আমার ওরকম দুঃখেরও দরকার নেই আনন্দেরও দরকার নেই বাবা। গোপাল, তোমরা যদি বক্ বক্ কর তাহলে মাঝের দরজাটা ভেজিয়ে দাও।"

নয়ন দরজাটা ভেজিয়ে দিল। আর গোপালের উঠি উঠি করেও ওঠা হয় না। একটা সিগারেট শেষ করে আবার সিগারেট ধরায়। গোল গোল ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ওপর নয়নের মুখখানা দুলতে থাকে। আর তার মাথায় ঠিক ওপরে দুটো টক্‌টকে কাল্‌চে লাল গোলাপ, গতকালের চেয়েও খাড়া হয়ে উঠেছে। এ মুহূর্তগুলো যেন চুঁইয়ে চুঁইয়ে গোপালের মনের হ্রদে জমা হতে থাকে। তার মনে হয় কথা বললে—অনেক গভীর করে বলার চেষ্টা করলেও—এ মুহূর্তগুলোর নাগাল পাওয়া যাবে না। সে শুধু তন্ময় হয়ে নয়নকে দেখতে থাকে। তারপর নয়নের খুন্তি আর মেঝেতে ঘসা শক্ত হাতখানা তুলে আঙুলে চুম্বন করে। নয়নও বিভোর হয়ে থাকে। এই শীতের রাত্তিরেও তার মনে হল বাইরে বৃষ্টি নেমেছে।

পরদিন সকালেই যাবার কথা। অন্তুর বন্ধু মতি বাড়ি ঠিক করেছে। সেই নিজে আসবে নিতে। অন্তুর সকালে অফিস, তার আসা সম্ভব হবে না। আর ছোট ছেলের কোনও ঠিক নেই, সে এই নতুন সংসারে আসবে না।

নয়ন তার একটি মাত্র ষ্টীলের ট্রাঙ্ক গোছাচ্ছিল। কয়েকখানা কালো পেড়ে শাড়ী পরিষ্কার করে বাড়ীতে কাচা, মায়ের নাম লেখা একখণ্ড কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, কয়েকটা শাদা জামা, শুকনো ফুল আর খানকয়েক পুরনো চিঠির বাণ্ডিল। নয়ন অন্যমনস্ক ভাবে কাগজগুলো ঘাঁটতে থাকে।

তারিণীদা ঘরে এসে বললেন, "পাঠ তো তুললে, দেখো আবার যেন লোক হাসিও না।"

নয়ন হেসে বলে, "কেন তুমি তো আছ।"

"আমি আর কী করতে পারি? তোমার ছেলেদের তো আর মাথার ঠিক নেই।"

আবার খোঁচা। নয়ন জানে অন্তুর উড়নচণ্ডে ব্যবহার, মান্তার বদ্‌খেয়াল, তাদের হঠাৎ আবির্ভাব হঠাৎ অন্তর্ধান—একে আর কোনও আখ্যা দেওয়া যায় না। সেও কি ভাবছে না নতুন করে চোরাবালিতেই সংসার পাতছে! কিন্তু এটা আর কেউ বললে সে কোথায় তলিয়ে যায়। ফের গোপালের কথা মনে পড়ে। সে কখনও এ প্রসঙ্গ তোলে নি।

মতি এসে গেল। খাকী ফুল প্যাণ্টের ওপর তার ছিটের শার্ট লটপট করছে। নয়নের শ্বশুর বাড়ির মাঠ পেরোলেই মতিদের বাড়ি ছিল। সম্প্রতি কলকাতায় পুলিশে ঢুকে পিলে চম্‌কানো গোঁফ রেখেছে। নয়ন লক্ষ্য করে গাঁয়ের জীবনে তার হাঁটা চলার মধ্যে একটা উদ্দাম ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যে সম্ভ্রম ছিল তা সে একেবারে হারিয়ে ফেলেছে।

মতিকে দেখে তারিণীবাবু মিচকে হেসে বলেন, "কী রকম হচ্ছে আজকাল মতিবাবু। গোঁফ রাখলেই কি হয়, এখন পুলিশে ঢুকেছ, সিল্কের শার্ট ফার্ট বানাও। তোমার গাঁয়ের চাল আর কেন?"

মতি চোখ বড় বড় করে বললে, "সিল্কের শার্ট বানাব? কী বলছেন কাকাবাবু? আর বলবেন না-ই বা কেন। সব শালা চোর। শালা ঘুষ খেয়ে খেয়ে···"

নয়ন চেঁচিয়ে উঠলে, "মতি"।

মতি তার দিকে ঘুরে বললে, "ও আপনি রাগ করছেন গাল দিচ্ছি বলে! এ্যাদ্দিন যে পাগল হয়ে যাইনি তাই রক্ষে। তা ছাড়া কাকিমা চোর বদমায়েসদের নিয়ে কারবার, তাই করে আমাদের দুবেলা চারটি খেতে হয়, মা বাপদের খেতে দিতে হয়। আমরা তো আর ভেলভেটে শুয়ে মানুষ হই নি। আমাদের কথাবার্তা অত ধরলে চলবে কেন?"

কথার খোঁচাটা নয়নকে বিঁধলো। ছেলেবেলায় অম্বর একটা ভেলভেটের জামা বানিয়েছিল নয়ন। এ কথাটা কি না বললেই নয়!

তারিণীদা বললেন, "তোমরা কি টিকটিকি? কাজটা কী তোমাদের?"

"টিকটিকি কি গিরগিটি জানি না কাকাবাবু। চোর ছ্যাচোড় গাঁটকাটা এদের পেছনে ঘুরতে হয়। আবার গাঁটকাটা দিয়ে গাঁটকাটা ধরি। সেদিন এক শালাকে ধরলাম। পকেট মারছিল। সে তো আমায় এই মারে কি সেই মারে। পরে শুনলাম সে আবার বড় সাহেবের লোক।" নয়নের দিকে ফিরে বললে, "কই আপনার গোছানো হল? কী আর এত আছে তার জন্যে আবার গাড়ী করা।"

নয়ন বললে, "আমি যা বলেছিলাম সেটা করেছ?"

মতি হঠাৎ চুপ মেরে যায়। তারপর চেঁচিয়ে ওঠে, "অত সাত তাড়াতাড়ি চুণকাম হয় না। বাড়িওলা বলেছে সে পরে হবেখন।"

"আমি চুণকাম না হলে যাব না।"

মতি ক্ষেপে গিয়ে বললে, "কী আপনি ফ্যাকৃড়া তুলছেন কাকিমা? চুণকাম না করে কি বিশ্বশুদ্ধ লোক থাকৃছে না! আমরা এত চেষ্টা করে মরছি, আর আপনি বাগড়া দেবেন একটা একটা।" তারপর গলা নামিয়ে সহানুভূতি দেখিয়ে বলে, "আর কাকিমা, আমরা তো কাদায় পড়েই আছি। আমাদের আবার চুণকাম পালিশ।"

ঠিক যে জায়গাটা মাড়ালে তার সবচেয়ে লাগে মতি সেই জায়গায় পা দিলে। নয়ন ফুঁসে উঠে বললে, "আমি যা বলেছি তাই হবে। চুণকাম না করা বাড়িতে আমি উঠব না।"

মতি মুখ বিকৃত করে বলে, "এত বড় বড় কথা বলবেন না কাকিমা। থাকত মুরোদ মানাতো। তা না একখানা ঘর আর আধখানা বারান্দা, তার আবার চুণকাম।"

নদিদি এক হাঁড়ি কাপড় চাপিয়েছেন। নয়ন এ বেলা না থাকলে এতগুলো কাপড় একাই কাচতে হবে তাঁর। বললেন, "এত করে বলছে না হয় কালই যাবে। একবার কলি ফিরিয়ে দাওনা ঘরটার।"

মতি রাগে মক্ মক্ করতে করতে বললে, "আচ্ছা, আজ চললাম। বাড়িওয়ালা শালাকে গিয়ে বলি, এক পোঁচড়া লাগাতে। কাল যদি ফিরে এসে দেখি···"

কথা না শেষ করেই মতি গটগট করে বেরিয়ে গেল।

কাপড়গুলো পুড়ছে কিনা তাই দেখবার জন্যে কাঠি দিয়ে সেগুলো ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে নদিদি বললেন, "মতিটা বড্ড বেয়াড়া হয়েছে তো।"

নয়ন অন্যমনস্ক ভাবে বলে, "না ঠিক বেয়াড়া না তবে···"

নদিদি অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "আমি তো আর তোমার মত কথার জাহাজ নই, বেয়াড়া নয় তো কী?"

নয়ন ভাবছিল অন্তু আর মতির কথা একই সঙ্গে। অন্তুর ছিল মিষ্টি স্বভাব। সেই অন্তু আজ নির্জীব, ক্ষীণপ্রাণ, স্তিমিত। আর

মতি ছিল সত্যিই সুন্দর ভাবে উদ্দাম। এমন কি দেশভাগের মুহূর্তে গাঁয়ের হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায় যখন দুই শিবিরে বাস করতে সুরু করেছে তখনও মতি হয়ে থাকলো সকলের বিস্ময়। তার কোনও সম্প্রদায় নেই। সে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রত্যেক রান্নাঘর চড়াও হয়ে প্রায় হাঁড়ি টেনে বার করেছে। তা ছাড়া রাত বেরাতে দূরে যাত্রা ফেরত সোমত্থ মেয়েদের বাড়িতে পাঠানোর বেলায় বৃদ্ধ মুসলমান ভদ্রলোকেরা তাঁদের সম্প্রদায়ের তরুণদের চেয়েও মতিকেই বেশী বিশ্বাস করে এসেছেন। সেই বেপরোয়া স্পষ্ট বক্তা মতি আর এই চোয়াড়ে লোকটির ভেতর একটা মিল খোঁজার চেষ্টা করে নয়ন। যে প্রশ্ন সে অন্তর বেলায় ভেবেছে তাই ফের জেগে ওঠে—মানুষ এত তাড়াতাড়ি হেলে বেঁকে কাত হয়ে পড়ে কেন?

আবার রাত। নয়নের ঘুরে ফিরে মনে পড়ে সিনেমার সেই বিজ্ঞাপন—অদ্য শেষ রজনী। শেষ রজনী তাতে দুঃখ কী? এই তো ভাল। এই ছন্নছাড়াভাবে অন্যের বাড়ি থাকার গ্লানি আর থাকবে না। নয়নের তো মস্ত বড় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা উচিত। এই দীর্ঘ কয়েক মাসের গ্লানি আজ রাত্তিরে শেষ হবে। এই রাত্তিরের জন্যেই তো সে এতদিন তাকিয়েছিল!

ঘরখানার চারদিকে একবার চোখ বুলোয় সে। একদিকে ছড়-করা ট্রাঙ্ক, বাসন কোসন, প্রায় মাথা ঘেঁসে ঝুলছে লেপের র‍্যাক, ফাটা কাঁচশুদ্ধ আলমারী, এককোণে দালদা, লক্ষ্মী ঘি-এর অসংখ্য টিন, তাকের ওপর ষ্টোভ, ভগবানদের ফটো, তাদের মাথার ওপর কাঁচের গেলাশে দুটো শুকনো গোলাপ, রঙের জৌলুস এখনও যায়নি।

সিঁড়িতে আবার চেনা পায়ের আওয়াজ আসে। ঘরে ঢুকেই গোপালের মুখ চোখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। চেঁচিয়ে বলে, "মন, তুমি যাওনি।"

গোপালকে দেখে মনে হল সে যেন উড়ছে। চোখ নাচছে চশমার ভেতর থেকে। ঠোঁটের পাশ দিয়ে গালের রেখায় রেখায় আনন্দের ছাপ।

নয়ন তার গায়ের আলোয়ান মাদুরের ওপর পেতে দিয়ে বললে, "বোস, আবার কদ্দিন পর দেখা হবে। হয়তো আর দেখাই হবে না।"

নয়নের গলায় চাপা বিষাদ। এ ধরনের কথাবার্তা গোপালের বরদাস্ত হয় না। কিন্তু নয়নের গম্ভীর দৃঢ় গলায় সে চমকালো। ভাবলে, এটা কি নয়নের আত্মসমর্পণ নয় ভদ্রতার কাছে। যে কানুন শেখায় মনের তীব্রতা জলো ফিকে করে দিতে নয়ন কি শেষ পর্যন্ত সেই কানুনই মেনে নেবে?

গোপালের সম্প্রতি একটা বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। তার প্রেমের কবিতা পড়তে প্রচণ্ড অসোয়াস্তি হয়। নিজেকে ধন্যবাদ দেয় কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছে বলে। সে অনুভব করে, কথার জাল দিয়ে মানুষের অন্তরের তীব্রতম কথার নাগাল পাওয়া যায় না। বেশীর ভাগই প্রেমের কবিতা তার কাছে প্যানপেনে লাগে। তাতে নদী পাহাড় ঝরণা যতই থাকুক, "আকুলতা", "আততি", "থরথর" শব্দের ছড়াছড়ি থাক, এ বিরাট রহস্যের ওপর আলোকপাত করতে তা বড়ই অসম্পূর্ণ। আর এই প্যানপেনেমির উল্টো দিক যা তার চেনা শোনা কিছু লোকজনের মধ্যে একটু বেশী রকম প্রকট—অর্থাৎ কিনা একটু আদিম হওয়া—তা তার কাছে আরও বিরক্তিকর।

সিন্দুকে হেলান দিয়ে নয়নের চোখ, তার মুখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে একসঙ্গে ঝড়ের মত কথাগুলো তার মনে তোলপাড় করে।

নয়ন মাথা নামিয়ে বললে, "আমাদের সেই দিনের জন্যে তৈরী হতে হবে যেদিন রোজ দেখা না হলেও ..."

নয়ন কথা শেষ করতে পারে না। সে নিজের হাত শক্ত করে মুঠি বেঁধে বসে থাকে।

এ প্রসঙ্গ কেন তুলছে নয়ন? আর বেছে বেছে ঠিক সেই মুহূর্তে যখন গোপালের সমস্ত মন ভরে উঠেছে, তার মনে হচ্ছে ক্রমশই সে বাঁচার দৈনন্দিন বিরক্তি থেকে আরও অনেক ওপরে উঠতে পারবে! অস্থির হয়ে সে বলে, "কেন তুমি বারবার বিচ্ছেদের খড়্গ নাচাচ্ছ! তুমি কি পরখ করতে চাও? বল, একমাস দুমাস না হয় আসব না, দেখা করব না। কিন্তু এটা হতে পারে আর পাঁচজনের মন রাখার জন্যে। কিন্তু আমার তোমার দুজনের মধ্যে কোনও দেয়াল তুলোনা, মন।"

কি ভাবে তার মনের কথাকে ভাষা দেবে গোপাল বুঝে উঠতে পারে না। নয়নের মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে কাতর হয়ে বলে, "এতে কী তোমার লাভ হবে বল? শুধুমাত্র বিচ্ছেদে? কত কষ্ট করে, সাধনা করে একটা মানুষের কাছে মানুষ আসে। এর জন্যে লজ্জা কী, অনুতাপ কী? আর সমাজ না হয় তোমায় আমার বউ হতে দেবে না, না হয় আমি তোমার পেটের ছেলে নই, তুমি আমার মেয়ে নও। কোনও সম্বন্ধই নেই। কিন্তু তা বাদ দিয়েও একটা মনের সম্বন্ধ আছে। সেটা আমরা করে নেবই।"

নয়ন মাথা নীচু করে বললে, "সেই জন্যেই তো আমি রাশ টানি। তুই তো বুঝিস্ না, অস্থির হয়ে পড়িস্। আরও পাঁচ-ছ বছর পর হয়তো বুঝতে পারবি। আমি না রাশ টানলে আমরা কোথায় ভেসে যেতাম।"

গোপাল বললে, "বুঝি বুঝি মন, কিন্তু…"

"কী"

"আজকে আমার যা গর্ব, পাঁচ বছর পর তা আমার লজ্জা না।"

নয়ন বললে, "লজ্জা না, তবে তোর জগত তোর বন্ধু বান্ধব···"

"কোনও পরিবর্তনই তোমায় না করে দিতে পারে না।"

ভালবাসার যন্ত্র অনেকে বাজায় চারপাশে। নয়ন তা শুনেছে আর শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু গোপালের যন্ত্র ধরার কায়দা আলাদা, তার মীড় যেন আলাদা মীড়, বৈশিষ্ট একেবারে নিজস্ব। এ ধরনে বাজনার কথা নয়ন শুধু আগে ভেবেছে। হেসে বলে, "তোর অহঙ্কারের জন্যেই আমার এত ভাল লাগে তোকে। কিন্তু এত অহঙ্কার করিস নে।"

উঁচু গলায় নদিদিকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, "তুমি কিছু ভেবোনা রুটির জন্যে। আমি গোপাল গেলেই জোর জোর হাতের কাজ সেরে নেব।"

লেপের ভেতর থেকে নদিদির চাপা গলার আওয়াজ এলো, "এই শীতের রাত্তিরেও এতক্ষণ বকর বকর করতে পারিস।"

নয়ন আস্তে আস্তে বললে, "পাঁচবছর পর আমার চুল সব পেকে যাবে। আমি এমন স্বার্থপর হতে যাব কেন যে তোকে বেঁধে রাখব আমার সঙ্গে ?"

"তুমি তো আমায় বাঁধনি। তুমি তো রাস্তা খুলে রেখে দিয়েছ। সেই জন্যেই তো বার বার আসি।" খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ফের বললে, "দেখ আজ আমায় বড্ড কথায় পেয়েছে।"

নয়ন বললে, "বল না, তুই যা ভাবিস তা অনেকখানি তুলে ধরতে পারিস, আমি একদম পারি না।"

গোপাল অধীর হয়ে বললে, "না না আমিও পারি না একদম। খালি ভয় হয়, কথার তোড়ে মিথ্যে কথা বলে ফেল্‌ব। দেখ, তুমি প্রায়ই আমার জগতের কথা বল। আমার জগতটা কী, তোমার একটু বলি। আমাদের অফিসের একটা লোকের সঙ্গে কথা বলতে বেশ

লাগে। লোকটা তিরিশ সালের একজন আধুনিক কবি। বেশ ধার আছে ব্যঙ্গতে, চোখা কথায় আমাদের অনেক গ্লানির কথা বলেছেন। কিন্তু যাদের তিনি ব্যঙ্গ করেন তিনিও তাদের একজন। ক্বচিৎ কোনও বড় লেখকের লেখা পড়লে কিম্বা ভাল গান শুনলে এখনও চোখ মুখ জ্বলে ওঠে। কিন্তু ব্যস। তুমি লেগে থাক লোকটার সঙ্গে, ভাবছ এইবার বোধ হয় জ্বলে উঠবে, কথা বলবে। কিন্তু না, একেবারে ঠাণ্ডা মেরে গেছে। আর এক ধরনের লোকও আছে যা কাগজের অফিসে বিস্তর। তাদের দেখলে আমার গা রি রি করে। তারা হল ভাল ভাল কথার জাহাজ। গলগল করে কথা বলছে—আর্ট, সাহিত্য, ভালবাসা। ভীষণ জাঁক বাইরে, আসলে নেংটি ইঁদুর। এই একদিকে প্রকাণ্ড ঘ্যানর ঘ্যানর আর একদিকে নেহাত মরে শাদা হয়ে যাওয়া, এই দুই নরকের মাঝখানে—”

নয়ন মনে মনে ভাবছিল, একদিকে চোয়াড়ে গতি আর একদিকে মুমূর্ষু অস্ত…

গোপাল কথা শেষ করলে, “এর মাঝখানে তুমি।”

নয়ন উঁচু গলায় হেসে বললে “কী পাগল ছেলে, এর মধ্যে আমি কোথা থেকে এলাম! তোর আর্ট, সাহিত্য, এর মাঝখানে আমি একটা পুঁটিমাছ! আমায় নিয়ে কেন টানাটানি!”

“এর মধ্যে তুমি। তোমার কাছে এলে আমি ঘ্যানর-ঘ্যানরের জগত থেকে বেঁচে যাই। মনে হয় নতুন করে বাঁচার কথা, যা শুধু হাত পা ছুঁড়লেই হবে না। আবার তোমার দিকে তাকিয়ে হাল-ফ্যাসানের ‘সিনিক’ হতেও মন সরে না। নিজের কলঙ্ক দিয়ে অন্যের গায়ে কালি দিতে লজ্জা লাগে।”

নয়নের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ফিরে আসে। চোখ কুঁচকিয়ে বলে, “তুই কি এইসব যা তা বলে আমায় প্রেম নিবেদন করছিস্?”

গোপাল হেসে ফেলে। বলে, "দেখ, কী কারবার। নিশ্চয় আড়ালে এতক্ষণ কেউ থাকলে তাই ভাবতো।"

"তা নয়তো কী?"

গোপাল আস্তে আস্তে বললে, "হয়তো তাই। তোমার কাছে এলে আমি নিজেকে জানতে পারি।"

চোদ্দ

শেষ পর্যন্ত ছোটমামা এলেন। ঝড় ঝাপ্টার খবর পেলেই তিনি আসেন, নয়নের তিনি প্রায় সমবয়সী, একসঙ্গে খেলাধূলো করেছেন। বেশ কিছু বিষয় সম্পত্তির মালিক, তাঁর উকিল তারিণীদা। মামলার সূত্রে মাঝে মাঝে এসে ভাগ্নীদের জ্ঞান দিয়ে যান।

মায়ের শেলাই ও গান শেখার প্রসঙ্গে অন্তুর অমনোনীয় মনোভাব তিনি আগে শুনেছিলেন। বললেন, "যে বলছে গোবর জলের ছড়া দিলেই পরিচ্ছন্ন থাকা যায় আর যে পরিচ্ছন্ন থেকে পরিচ্ছন্নতা আনা যায় বলছে, তাদের দুজনকে যদি বলো এটা ঠিক আর এটা ঠিক না তাহলে দুজনেই লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবে, দুজনের দিক থেকে দুটোই ঠিক। অন্তুও ঠিক তুমিও ঠিক। ঠিক বেঠিকের চুলচেরা হিসেব করবার মালিক তুমি কে?"

বিরাট লম্বা চওড়া চেহারার মানুষ ছোটমামা, এত বেশী চেঁচিয়ে কথা বলছিলেন যে তারিণীদা বৈঠকখানার দরজা বন্ধ করে দিলেন। নয়নের আগেও মনে হয়েছিল, এখনও মনে হোল, জ্ঞানের কথা যেন চেঁচিয়ে ফাটিয়ে বলার নয়। তা আস্তে আস্তে তারিয়ে তারিয়ে বলতে হয়, শুনতে হয়।

সে ধীরে ধীরে বলে, "কিন্তু ছোটমামা একটা তো সাধারণ বিচার বুদ্ধি আছে, কোন্ ভাবে চললে খানিকটা বাঁচা যায়, কিসে আরো

খোঁড়া আরো নড়বড়ে হয়ে যেতে হয়, এটা তো মানুষে বিচার করবে।"

ছোটমামা চেঁচিয়ে বললেন, "তুমি নিজের মত কাজ করে যাও সব ঠিক হয়ে যাবে।"

নয়ন আর ঘাঁটায় না। বুঝলে ছোটমামার এই কথা বলার উৎসাহে বাধা দিলে চটবেন। এক দারুণ দুর্ভাগ্যের মুহূর্তে নয়ন তো এ লোকটার কথাই মেনে নিয়েছিল। পণ্ডিচেরীতে তার মন টিঁকল না এতো পণ্ডিচেরীর দোষ নয়, তারই দোষ। সে কেন নিজের মনকে চিনতে পারে নি? তাছাড়া কটেজে বাবুর্চি রেখে অধ্যাত্মসাধনা তাকে পীড়া দিলেও আশ্রমে অসংখ্য কমবয়সী ছেলেমেয়ের সাহচর্য তো তাকে অনেকখানি টেনেছে। তবে ছোটমামার নিরুদ্বেগ প্রশান্ত চালে কথাবার্তায় সে হঠাৎ ভেতরে এত উল্টোপাল্টা হয়ে যায় কেন? কেন তার চীৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে, জ্ঞানের কথা পৃথিবীতে এত আছে যে কয়েকটি কথাই ঘুরে ফিরে বগল বাজিয়ে বলা যায় না।

ছোটমামা খাটের ওপর বাবু হয়ে বসে বললেন, "তুমি যে ভাবে যাচ্ছো তাতে হয়তো তোমায় একদিন ফুটপাথেই যেতে হবে, কিন্তু তাতে বিচলিত হও না। কত লোক তো রাস্তায় কাটাচ্ছে।"

নয়ন কথা বলে না, মাথা নীচু করে নখ খুঁটতে থাকে।

ছোটমামা আবার বললেন, "তাছাড়া এই বা মন্দ কি? এই দেখো তোমার নদিদি নাতিপুতি, জামাই নিয়ে সংসার করছেন, খালি খাওয়া দাওয়া আর শয্যা। আর তুমি কত কিছু দেখছো, বুঝছো, কত খেলা খেলছো?"

শেষ কথাটা নয়নের লাগে। বলে, "খেলাই বটে।"

"খেলা নয়ত কী? সবই তাঁর খেলা। তিনি যে ভাবে খেলাচ্ছেন খেলছো।" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "আমি দিনরাত ডাকছি আমায় নাও। কিন্তু কৈ আত্মসমর্পণ তো সম্পূর্ণ হয় নি। এখনও যে ভোগ

বিলাসের ইচ্ছে আছে।" তারপর নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন, "হবে হবে, আজ না হোক একশো বছর পরে হবে।"

ছোটমামার মোক্ষলাভের এক থিওরি আছে। নয়ন তা আগে থেকেই জানতো, তাই অবাক হয় না। ছোটমামা মনে করেন এ জন্মের অধ্যাত্মচর্চার ফলে আত্মা বর্তমান আধার ছাড়লেও পরবর্তী আধারে সঞ্চারিত হয়ে এক পুর্ণতর মানবত্ব লাভ করে। নয়নের কাছে কথাটা অস্পষ্ট হলেও খারাপ লাগে না। মৃত্যু মানেই একেবারে লয়, একথা ভাবতে তার মন কেমন করে। আর মৃত্যুর পর আরও বড় মানুষ হবার জন্যে তাকে আসতে হবে পৃথিবীতে, এ কথার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে তার যথেষ্ট প্রশ্ন থাকলেও ভাল লাগে।

হঠাৎ সে প্রায় কেঁপে উঠলো। ঠিক এই প্রসঙ্গই গোপাল তুলেছিল না? অবশ্য এভাবে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে জ্ঞান দেবার ভঙ্গিতে নয়। গোপাল বলেছিল, "মন, মরে যাবার পর কী হয় এর বাগ-বিতণ্ডায় লাভ কী, কেউ কি সঠিক করে বলতে পেরেছে? কিন্তু সঠিক ভাবে ঝকমক করছে আমার সামনেই জীবন। আর এই জীবনেই মৃত্যু, এই জীবনেই পুনর্জন্ম।" নয়ন মাথা নীচু করে মনে মনে আবৃত্তি করে, "এই জীবনেই মৃত্যু, এই জীবনেই পুনর্জন্ম।"

ছোটমামা বললেন, "তোমার মধ্যে আমি পরিবর্তন লক্ষ্য করছি নয়ন। আশ্রম তুমি ছেড়েছ কিন্তু আশ্রম তোমায় ছাড়েনি।"

নয়ন অবাক হয়ে বললে, "কি রকম?"

"এই যেমন শুনলাম তুমি আজকাল ট্রামে বাসে একলা চলছো ফিরছো, মুখে চোখেও একটা তেজের ভাব এসেছে।"

নয়ন হেসে বললে, "কোথায় আর সে ভাব দেখালাম! সারা জীবন শুধু সেই তেজের কথাই ভেবে এসেছি। মাথা তুলেই আবার সামলে নিয়েছি।"

ছোটমামা বললেন, "হবে হবে, যখন ডাক আসবে আপনিই হবে। তুমি পালঙ্কে শুয়েই থাক তার ফুটপাথে শুয়েই থাক ডাক আসবেই আসবে।"

আবার মনটা ওলোটপালোট হয়ে যায় নয়নের। ছোটমামা "রূপান্তর" "অনির্বাণ" "উপলব্ধি"—বললেন অনেকক্ষণ ধরে। কিন্তু নয়ন আর শুনতে পারছিল না। যেন তার মনে হচ্ছিল এখনই চীৎকার করে উঠবে। সে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বসে থাকে।

ছোটমামা হঠাৎ চোখ খুলে বললেন, "কাল রাত্তিরে এক ভয়ানক কাণ্ড!"

নয়ন অবাক হয়। ছোটমামার অবিচলিত ভাব এতই বেশী যে "ভয়ানক" ব্যাপার তাঁর সামনে বিশেষ কিছু ঘটে না। অবাক হয়ে বললে, "কী ছোটমামা, কী হয়েছিল?"

ছোটমামা পায়ের চেটোতে হাত বুলোতে বুলোতে গল্প স্থরু করেন, "আমাদের বাড়িতে যে মেয়েটা কাজ করে তাকে নিয়ে যা সাংঘাতিক বিপদে পড়েছিলাম কদিন। তার স্বামীর নাকি কী এক ভয়ানক ব্যামো! হাঁসপাতালেও নেয়নি। এই ঠাণ্ডা শীতের রাত্তিরে হাঁসপাতালের রোয়াক থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আবার যে বস্তিতে তারা থাকে সেই বস্তিওয়ালা ওই সাংঘাতিক ব্যামোর কথা শুনে তাদের দরজায় তালা মেরে দিয়েছে। বোঝো একবার।"

ছোটমামার চোখ দুটো বিষাদ মাখা। নয়ন লক্ষ্য করলে তাঁর চোখ ছলছল করছে। বললেন, "আমি জীবনে কখনও এত বিচলিত হই নি নয়ন, আমার নিকট আত্মীয় মারা গেলেও না। ভেবে দেখো, এই ঠাণ্ডা, নিজে লেপের ওপর কম্বল চাপিয়ে শুয়েছি। ভাবলাম কিছু সাহায্য করব কিনা। মনটা এমনি অস্থির হয়ে উঠলো...শেষ পর্যন্ত বসলাম।"

নয়নের উৎসাহ এক ফুৎকারে নিভে যায়। ধ্যানে বসে তিনি কী আদেশ পাবেন তা যেন আঁচ করতে পারে সে। ছোটমামা বললেন, "পনেরো মিনিট যাবার পর আদেশ পেলাম। মা বললেন তুই করবি করবি করছিস, করবার মালিক কি তুই ? যিনি করবার তিনি করবেন। তুই মিছিমিছি অস্থির হোসনে। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

ছোটমামা চুপ করে থাকেন। নয়নের মুখে চোখে কোনও আগ্রহ জেগেছে কিনা খুব তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করতে থাকেন। কিন্তু সে মাথা নীচু করে থাকায় তার মুখের কোনও হাব ভাব টের পান না। বলেন, "ভগবানের কী অসীম করুণা। সেদিন রাস্তায় স্বামী কোলে নিয়ে মেয়েটাকে কাঁদতে দেখে পাড়ারই কয়েকটা ছোকরা এসে ব্যাপারটার হিল্লে করে দেয়। তারা বস্তির দরজায় তালা ভাঙ্গে, তারপর নিজেরা লোকটাকে বয়ে নিয়ে গিয়ে সেখানে রেখে দিয়ে আসে। এখন বেচারী নির্বিঘ্নে মরতে পারবে।"

কথা শেষ করে ছোটমামা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "এমনই খেলা, বুঝলে না। তাঁকে ডেকে চলো, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

আধবোঁজা চোখ খুলে দেখলেন নয়ন বেরিয়ে গেছে।

না, বাহাদুরী দেখানো আর না। স্বামীর কাছে না হয় বাহাদুরী দেখিয়েছিল। অন্তু জন্মাবার কয়েক বছর পরের থেকেই নয়ন যখন বুঝলে তার বাপের টাকা ছাড়া তার সম্বন্ধে আর কোনও উৎসাহই স্বামীর পক্ষ থেকে নেই, তখন ভাবলে আরো বেশী টাকা দিয়ে, আরো আত্মত্যাগ করে, শ্বশুর বাড়ীর উঠোন থেকে ঘরের আনাচ কানাচ পর্যন্ত তিনবার ঝাঁট দিয়ে কী ভাবে তার মুখ বন্ধ করা করা যায়। মুখ বন্ধ হয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে মনও। কিন্তু ছেলের বেলায় সমস্ত মন ঢেলেই সে ঘর বাঁধবে।

তাছাড়া, সে মেনে নেবে এবার। চল্লিশ বছর ধরে যে সমুদ্র বুকের

মধ্যে কথা বলেনি, আজ তাকে জাগিয়ে কী লাভ? গোপালের প্রশ্ন সে নিজেকে করলে: সেই জাগার আনন্দের যে বিরাট দায়িত্ব, যে কষ্ট, তা কি মাথায় করে নিতে পারবে? তার চেয়ে কোনও রকমে, অন্তর কথামত কাদায় না গড়িয়ে, অথচ কিছুটা তার ভাল লাগার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আর বাকী কয়েকটা দিন কাটিয়ে দেওয়া ঠিক না? আর সব জিনিষ এত আচ্ছন্ন হয়ে ভাবলে চলবে কেন? গোপাল তার হাঁটুর বয়সী, তার জগত তার রাস্তা আলাদা। আর সে নিজে একজন মাঝবয়সী মহিলা সেই দেশের যেখানে কুড়ি পেরোলেই বুড়ি হয়ে মাসিমা, কাকিমা ইত্যাদি কারুর জের টেনে নিজের সম্বন্ধ তৈরী করে নিতে হয়, যেখানে স্ত্রীলোকদের আর যাই হোক মহাভারতের নায়িকা হিসেবে কল্পনা করা দুরূহ।

মতি পাড়ার একটি ছেলেকে ঠ্যালাগাড়িতে চাপিয়ে নয়নকে নিয়ে বালীগঞ্জ স্টেশনে এসে পৌছালো পরদিন। মাত্র এক রেলওয়ে ওভার ব্রীজ—বিশ গজের ব্যবধান, তার একদিকে নতুন উঠতি বাঙালী মধ্যবিত্তের পরিচ্ছন্ন আবাস ভূমি, কোথাও এক চিল্‌তে বাগানের পাশে গ্যারাজ থেকে নতুন মডেলের গাড়ি উঁকি দিচ্ছে, কোনও কাপ্তেনবাবু বিলিতি কায়দায় ড্রেসিং গাউন পরে ব্যালকনি থেকে প্রাতঃকাল উপভোগ করছেন, রেডিওতে পঙ্কজ মল্লিকের "টলমল টলমল যৌবন সরসী নীরের" সঙ্গে জনৈক মেয়েলী গলা সঙ্গত করছে। আর ওদিকে খোলা ড্রেন, কসাইএর দোকানে ঝোলানো মাংসের নীচেই রাস্তার জড়ো করা পাঁক, উত্তরে হাওয়ায় আর ধূলোয় রাস্তার ওপরে ফুলুরীর আড্ডা, দাদের মলমের সঙ, টিউবওয়েলে বস্তির লোকের ভীড় আর এক ফোঁটা জল দেখা যায় না এমনি পানায় ঠাসা অসংখ্য পুকুর।

মতি "চ"-টাকে তার দেশজ প্রথায় "স" উচ্চারণ করে বললে, "ওই যে আপনি রুসি ফুসি বলেন না, ওগুলো সব কাকিমা বড়লোকদের

জন্যে। এই যে ধূলো দেখছেন এ ধূলোয় মানুষ বাস করে না? আর ধূলো কি. একটু বর্ষার জল পড়ুক না, সব জায়গা পাঁকে গন্ধে…”

“চুপ কর চুপ কর”, নয়ন চেঁচিয়ে বললে।

“তবে মানুষের সাড় নেই কাকিমা। আশ্চর্য লাগত আগে, এখন একদম লাগে না। এই সারা বর্ষাকাল দেখতাম রোজ লোকগুলো আছাড় খেতো রাস্তায়। একেবারে সাইকেল শুদ্ধ পাশের ড্রেনে গিয়ে পড়তো। আবার সেই কাদা মেখেই চলতো। মানুষের সাড় মরে গেছে কাকিমা।”

বাড়ির কাছে এসেই নয়নের মুখ আঁধার হয়ে যায়। তিনহাত লম্বা একটা অন্ধকার জমি, তার মাঝখানে ড্রেন। ড্রেনের দুপাশে শুকনো এঁঠেল মাটি আর খোয়া। নয়ন আঁচ করতে পারে এমন নীচু জমিতে একফোঁটা বৃষ্টি হলেই ড্রেন আর দুপাশের এক বিঘত জমি একাকার হয়ে যাবে। নয়ন মাথা নাড়িয়ে বললে, “এ বাড়িতে আমি ঢুকব না।”

মতি এতক্ষণ কোনও রকমে তার মেজাজ সামলে ছিল। তার আবার কিছুক্ষণ পরেই ডিউটি। প্রায় চীৎকার করে ওঠে সে, “আপনি কাকিমা ঝঞ্ঝাট বাধাবেনই। অতই যদি রুচিজ্ঞান তবে বড়লোক বোনের বাড়িই থাকলে পারতেন।”

নয়ন একবার তার মুখের দিকে তাকালে। তারপর মাথা নামিয়ে বল্লে, “আচ্ছা চল।”

মতি জিনিষপত্রগুলো ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে, দু বালতি জল তুলে দিয়ে চলে গেল। নয়ন তার ছোট্ট ষ্টীলের ট্রাঙ্কের ওপর স্থাণুর মত বসে থাকে। কতক্ষণ বসেছিল খেয়াল নেই। খালি বারান্দাটা পার হয়েই একখানা ছোটঘর। সেখান থেকে একটি কমবয়সী বৌ এসে কখন তার সিঁথির দিকে নজর দিচ্ছে তার খেয়াল নেই।

চমক ভাঙলো বউটীর গলায়, "আপনার সঙ্গে ভাই আর কেউ নেই ?"

নয়ন তাড়াতাড়ি মাথার কাপড়টা সামনের দিকে টেনে বললে, "না আমার ছেলে অফিস গেছে, বিকেলে ফিরবে।"

বৌটির এতক্ষণে হাতের নোয়া নজরে পড়ে। জিব কেটে বলে, "আমি ভাবছিলাম কি…", তারপর চুপ করে থেকে নয়নের সরু কালো পেড়ে সাদা শাড়ী, তেলহীন রুক্ষ চুল আর তার উদাসীন চোখ মুখ দেখে কী মনে করে বললে, "কিছু মনে করবেন না ভাই, আপনি কি খৃষ্টান ?"

নয়ন হেসে বললে, "আমি মানুষ, অত কথা কেন ভাই।"

বৌটি লজ্জা পেয়ে যায়। দেখা গেল, পড়শী মেয়েদের মত নিজেদের হাঁড়ি-হেসেল আর স্বামিটি-ছেলেটির গল্প গলগল করে বলার মত ঢং তার নেই। নয়নের চেহারার গাম্ভীর্য তাকে মুহূর্তের জন্যে চমকিয়ে-ছিল। নইলে সে খুব মেয়েলী নয়, বরং নিজেই জিনিষপত্রগুলো টেনে-টুনে সাজিয়ে দিয়ে এখানে থাকার সুবিধে অসুবিধের কথা জানিয়ে বিদায় নিল। নয়নও বেঁচে যায়।

কলি একবার ফেরানো হয়েছে বটে, কিন্তু পানের পিক, ঠেস দিয়ে বসার দরুণ মাথার তেল চুণের ভেতর থেকে দাঁত বের করে আছে। নয়ন তার পুঁটলি, ট্রাঙ্ক আর সামান্য ঘটি বাটির দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়। যেখানে একখানা এ্যালুমিনিয়ামের কেটলীর জন্যে তার দুমাস বসে থাকতে হয়, ছমাস সাধ্যসাধনার পর ডিস-পোজাল থেকে মশারী আসে, সেখানে নয়ন একটি একটি করে সমস্তই জোগাড় করেছিল অন্তর একশো দশ টাকা মাইনে আর ট্যুইশানি বাবদ কুড়ি টাকা নিয়ে একশো তিরিশ টাকার সংসারের জন্যে। অন্তু অবশ্য রেগে গেলে দুনিয়াটাই অনিত্য মনে করে। মা পণ্ডিচেরী চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই গত বছর সে সব জিনিষই রাস্তায় ফেলে

দিয়েছে। লেপ মশারী যা ছিল পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে আসার সময় মেসেই তা পড়ে আছে। ফিরিয়ে আনতে গেলে সেখানকার প্রায় আড়াই শো টাকার ঝামেলা পোয়াতে হবে।

নয়ন ভাবলে, না এবার আর কোনো চেঁচামেচির কথা নয়। কাদায় না হোক ধূলোতেই যদি গড়াতে হয় তবু সে পিছ্‌পা হবে না।

অফিস করে, বস্‌-এর সাত বছরের মেয়েকে পড়িয়ে অন্তু ফিরলো রাত্তির আটটার পর। ঘরে ঢুকেই বললে, "পুষি, ভেবেছিলাম আর সংসার পাতব না, তবে তুই যখন ছাড়বি না তখন তোকে আর কষ্ট দেব না। দেখ্‌ আমি অন্যের ছেলেদের চেয়েও তোকে যত্ন করতে পারি।"

অন্তুর মেজাজ ভাল থাকলে মাকে তার ছেলেবেলার ডাকে আহ্বান করে, তুমি থেকে তুই-তে নামে। তার ময়লা আলোয়ানের ভেতর থেকে একটা সন্দেশের ঠোঙা বার করে নয়নের হাতে রাখলে।

নয়ন বললে, "একটু দাঁড়িয়ে নে অন্তু, তারপর না হয় সন্দেশ-টন্দেশ আনিস।"

অন্তু কাপড় ছাড়ছিলো। হঠাৎ ক্ষেপে উঠে বলে, "তুমি কি মনে কর সন্দেশ খাওয়ানোর সামর্থ্য আমাদের নেই?"

"না আমি তা বলছি না, কিন্তু চারদিকে এত দেনা…"

অন্তু চেঁচিয়ে উঠলো, "মা, তুমি এখন থেকেই কান ঝালাপালা করে দিও না—দেনা দেনা।" গলা নামিয়ে বলে, "কই তোমার স্বামীর কথা আমি কখনও তোমার কাছে তুলি? কত হিন্দু ঘরের বৌ আছে, টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেল্লেও তারা স্বামীকে ছাড়ে না। তুমি ছাড়লে কেন? কতলোক দেনা শোধ করে, আমি করি না। এতে আশ্চর্য হবার কী আছে? তুমি স্বামী ছাড়লে আশ্চর্য ব্যাপার হয় না, আর আমি দেনা না শুধলেই সেটা আশ্চর্য ব্যাপার হবে।"

নয়ন ভাবছিলো দু-তিন বছর আগের কথা, তখন অন্তু বাইরে চাকরী করছে। সামান্য পাঁচ টাকা ধার করেছিল পাশের বাড়ীর এক ভদ্র মহিলার কাছে। এক বছর ঘুরে যাবার পর মহিলাটি এসে নয়নকে বলেছিলো, "চারপয়সা করে ফেলে রাখলেও তো ক মাসে শোধ করা যেত টাকাটা। এই সামান্য ক-টা টাকা মেরে দিয়ে আপনাদের কী হল ?" টাকা নেব কোনও চিন্তা না করে, তারপর বিশ্বসংসারের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াব, একথা ভাবতেই নয়নের মন আবার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। বলে, "আমার বড্ড বেঁধে, কাঁটার মত বেঁধে।"

"কই, বাবার কথা তো তোমার একবারও কাঁটার মত বেঁধে না ?"

"না, সত্যিই বলছি বেঁধে না। তার সম্বন্ধে আমার আর কোনও সাড় নেই।"

"এ ভাবে তুমি আগে কখনও কথা বলতে না মা। এসব নতুন বুলি কে তোমার মাথায় ঢোকালে ?"

নয়ন বললে, "নতুন না, আগেও ছিল। তবে আগে এভাবে বলতে পারতাম না।"

অন্তু হাত মুখ ধুতে যাবার সময় বলতে বলতে চললে, "যার জন্যে এত উন্নতি তাকে নিয়ে থাকলেই পারতে !"

আবার মাথাটা ঘুরে গেল নয়নের। আগে তো এরকম হত না। এখন বোধ হয় শরীর পড়ে যাচ্ছে বলেই এরকম হচ্ছে। সেদিন ছোট মামার কথা শুনে যেরকম লেগেছিল ঠিক সেই রকম চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করে। সে আঁচল দিয়ে তার ঠোঁট দুটো ঘসতে থাকে, মাথার বেদনা বাড়ে। একবার ভাবলে সারিডন এনেছে কিনা। আজ প্রথম রাত্তিরেই সারিডন খেয়ে না শুলে ঘুম হবে না।

অন্তু নীচ থেকে হাত মুখ ধুয়ে উঠে এলো। শ্রান্ত, বিষণ্ন, শোচনীয় চেহারা। চোখ দুটো বুড়িয়ে গিয়েছে আর মুখ কুঁচকালেই ঠোঁটের

পাশ দিয়ে অসংখ্য অপরিচিত নতুন খাঁজ পড়েছে। এক একটি খাঁজ যেন এক একভাবে ধিক্কার দিচ্ছে মুখখানাকে। এই তার জলজ্বলে ছেলে অন্তু, যে পুলের ওপর থেকে লাফ দিয়ে খালের জলে পড়তো, লাঠি নিয়ে সারারাত জেগে থাকতো ডাকাত তাড়ানো পার্টিতে আর প্রাইজের দিন একতাড়া বই মেডেল নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়তো নয়নের গলায়।

শান্ত ভাবে নয়ন বললে, "খেতে বোস।"

অন্তুর মেজাজ শান্ত হয়নি। বোঝা গেল সে আরও দু-তিনবার প্রসঙ্গ পেড়ে নিজেকে আরও তাতিয়ে আজ রাত্তিরেই আবার একটা হেস্ত নেস্ত করে নিতে চায়। নয়ন কিন্তু ঠোঁট কামড়ে রইল।

লাইট পুড়লে খরচ বাড়বে তাই খাবার পর শোওয়া। ঠাণ্ডায় নীচে ওপরে পাতবার মত কিছুই নেই বলতে গেলে। একটা সতরঞ্চি বিছিয়ে তার ওপরে নয়ন দুখানা শাড়ী পর পর পেতে শোবার ব্যবস্থা করেছে। অন্তু বললে, "আমার ব্যবস্থা আমি করছি।" ছাত্রের কাছ থেকে আনা একখানা পুরোনো হোল্ড-অল অন্ধকারেই খুলে পাতলে। একটা চাদর আর আলোয়ান মুড়ি দিয়ে দুজনে দুমুখ হয়ে শোয়।

মশা, প্রচণ্ড মশা, আর গরম। ছোট ঘরখানার দরজা জানলা বন্ধ করে দেওয়ায় নয়নের মনে হল দম আটকে আসবে। খড়খড়ি তুলে দেয় সে তারপর এপাশ ওপাশ করতে করতে বলে, "অন্তু একটা ফ্লিট আনিস কাল, যা মশা হয়েছে।"

অন্তু বললে, "মশা কামড়ালে তো আর মানুষ মরে যাচ্ছে না।"

নয়ন উঠে পড়ে। তার মুখ চোখ ফুলে গিয়েছে। লাইট জ্বেলে মশা তাড়াতে থাকে। পাশের বাড়ি থেকে গান ভেসে আসছে। একটি কেরাণী পরিবার, ছ-সাতটি ছেলেমেয়ে, বেশ মিলেমিশে থাকে। তবে এই এগারোটা রাত্তিরে তারস্বরে গান জুড়ে দিয়েছে: "হও ধরমেতে ধীর,

হও করমেতে বীর।" নয়ন বললে, "মাগো এরা কি ঘুমোয় না রাত্তিরে?"

অন্তু বললে, "আলো নিভিয়ে দাও, মুখ ঢেকে শোও, মশা কামড়াবে না।"

"মুখ ঢেকে শুলে আমার দম বন্ধ হয়ে যায়।"

অন্তু বললে, "গোপাল একদিন আমায় একটা কথা বলেছিল তখন মানিনি। এখন বুঝছি সেই পরামর্শ নিলেই হত।"

নয়নের বুক ধড়াস করে উঠলো। সে বেশ অনুভব করে অন্তু লক্ষ্য করছে তাকে। অল্প পাওয়ারের আলোতেও বোঝা যায় তার মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে, ফাঁসির আসামীর মত সে শুধু প্রতীক্ষা করছে। তার চার পাশের লোকজন তার সম্বন্ধে রায় দিয়ে দিয়েছে অনেকদিন হল। এবারে গোপাল···

অন্তু বললে, "গোপাল বলছিল—সে অবশ্য বেশ কিছুদিন আগের কথা, এখন জানিনা কি বলবে—বলছিল, তোর মাকে নিয়ে তোর অত ভাবনা কেন? আগে নিজের কথা ভাব, তারপর না হয় মার কথা ভাবিস।"

নয়নের গলা দিয়ে অচেনা আওয়াজ বেরুলো, "গোপাল বলেছিল?"

"তুমি কি ভাব আজকাল আমি মিথ্যে কথা বলছি?"

নয়নের মাথা এবার ভয়ানক ঘুরতে থাকে। পাশের বাড়ির "হও ধরমেতে ধীর" তার মাথার তালুতে হাতুড়ির মত পড়তে থাকে। কোনও রকমে আলো নিভিয়ে সে টলতে টলতে শুয়ে পড়ে। না, সে আর চীৎকার করবে না, কোনও রকম ওজর দেখাবে না। গড়াবে, কাদাতেই গড়াবে।

অন্ধকারে অন্তুর গলা ভেসে আসে, "বৃষ্টি জল রোদ, এই আমাদের

ভাল। রামধনু দেখতে ভাল লাগে কিন্তু ক্বচিৎ ওঠে, আবার মিলিয়ে যায়।”

নয়ন আর মশা তাড়ায় না। তার মুখ চোখ মশায় খেয়ে যাচ্ছে। গরম লাগতে সুরু করে। খড়খড়ি দিয়ে যে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল এতক্ষণ তাও যেন থেমে গিয়েছে মনে হয়। গোপাল তা হলে তার জীবনে রামধনুই মাত্র। হ্যাঁ, রামধনু ছাড়া আর কী? তার চার-পাশের লোকজন যে সারাক্ষণ মিথ্যেই বলবে, তার কী মানে আছে? গোপালের হয়তো উদ্ভট কিছু ভাল লাগে, তাই আসে তার কাছে। নইলে সত্যিই কী আছে তার দেবার? একেবারে রিক্ত, শূন্য, ঝরে পড়া লোক, শুধু স্বপ্নই দেখেছে চল্লিশ বছর ধরে। তারপর যখন জেগে উঠলো আর সেই জেগে ওঠার আভায় সমস্ত পৃথিবী দুলে উঠলো তখনই দেখলে সে অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। একবারই মাত্র সে দেখতে পেয়েছিল, শুধু তার নয়, মানুষেরই কী অসম্ভব সম্ভাবনা, তারপর সে কাদার দলা হয়ে পড়েছে। গোপালের কী দরকার এই কাদার দলাকে? এই ধরনের কাদার দলা কলকাতায়, গাঁয়ে সমস্ত দেশে ছড়িয়ে আছে। গোপালের কী দায় পড়েছে এই কাদার দলা ঘাঁটবার? নয়নের মনে হয়, একটা অন্ধ লোককে হঠাৎ আলোর সামনে এনেই তার চোখ কানা করে দেওয়া হল। তার বুক ঠেলে কান্না ওঠে। না, ঠিক কান্না না। একটা চীৎকার—একটা চীৎকার যাকে সে চিরকাল ঘুম পাড়িয়ে এসেছে তার বুকের মাঝখানটায়। সেই একটা চীৎকার যার কোনও ভাষা নেই, যা কোনও ভাষা দিয়েই নিজেকে প্রকাশ করতে পারবে না।

অন্ধকারে দুটো লোকের নিঃশ্বাস পড়তে থাকে। দুজনেই এপাশ ওপাশ করে খানিক্ষণ ঘুমোবার ভান করে। পাছে মনে হয় জেগে আছে এজন্যে খুব সন্তর্পণে পাশ ফেরে। তবু দুজনেই জানে, অন্যে জেগে আছে।

ভোরের হাওয়ায় তারা ঘুমিয়ে পড়ে। নয়ন জেগে উঠে দেখলে জানলা দিয়ে রোদ এসেছে, ঘরে অন্তু নেই। রাস্তা পার হয়ে ইটের পাঁজা, তার পাশেই একটা গাছে কতকগুলো শাদা ফুলের কুঁড়ি এসেছে।

গত রাত্তিরের অসোয়াস্তির জের পরদিন সকালেও থাকে। নয়ন কি জানে না, এমন কী করেছে সে যে আশা করবে এক বিরাট ঐশ্বর্যময় জীবনের দরজা তার সামনে খুলে যাবে! গোপাল তাকে বলত, "মন, শুধু ভাবা নয় করা। তুমি যদি একশোটা কথা ভাব আর একটা জিনিষও করবার চেষ্টা কর, তাহলে তোমার সেই একটা চেষ্টা তোমার একশো ভাবনার চেয়ে ভারী হবে।" নয়নের মনে পড়ল সেদিনের কথা যেদিন সে সিঁদুর মুছে লম্বা বিনুনী করে দৌড়োতে দৌড়োতে তার অফিস ফেরত বাপের কাছে গিয়ে বলেছিল, "বাবা, আমায় আবার ইস্কুলে ভর্তি করে দাও।" আর বাবা তার সিঁথির দিকে তাকিয়ে আর্তনাদ করেছিলেন, "শীগগীর সিঁদুর পরে এসো মা" এমনি কয়েক-বার মরিয়ার চেষ্টা যে না করেছিল তা নয় কিন্তু মোটমাট লেগে থেকে সে কি কিছু করতে পেরেছে তার জন্যে?

অন্তু খবরের কাগজ কিনে নিয়ে এসে এদিক সেদিক ওলটালে। নয়ন রান্না করছিল। কাগজের তিনের পাতাখানা হাতে নিয়ে নীচের দিকে দেখিয়ে অন্তু বললে, "পড়ে দেখো, এমনি একদিন হতে হবে আমায়"। নয়ন একবার আড়চোখে দেখে—আত্মহত্যার খবর। এ ধরনের খবর আজকাল বেরোচ্ছে প্রচুর। তারিণীদার ওখানে থাকতে নয়ন রোজ পড়তো। বিশেষ করে উদ্বাস্তুদের মধ্যে এ প্রথা খুবই চালু হয়েছে। দু-তিনজন অনূঢ়া কন্যা আত্মীয়ের বাড়ি গলগ্রহ হয়ে আছে বলে একই সঙ্গে গলায় দড়ি দিয়েছে, ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে উদ্বাস্তু যুবক, এগুলো সে আগেই পড়েছে। অবশ্য আজকের খবরে

একটু কাব্যও ছিল। ট্রামের তলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে মরেছে এক উদ্বাস্তু যুবক, পকেটের চিঠিতে লিখে রেখেছে, তার কলম বিক্রি করে যেন সৎকারের টাকা জোগাড় করা হয়।

অস্তু চলে গেল। নয়ন বারান্দার আল্‌সেতে গা দিয়ে দাঁড়ায়। বাড়ির লাগা পানা ভর্তি পুকুর। নয়ন মনে মনে মাথা নাড়ায়। না, এ ধরনের আত্মবিলোপ তার কাছে কোনওদিনই প্রিয় নয়, কেমন যেন এড়িয়ে যাওয়া মনে হয়। নইলে সে কি পারে না? এখনই পারে, আর একটু ঝুঁকলেই তো সে আল্‌সে গড়িয়ে নীচের জলে পড়বে। উঠতে পারার মত কসরতও তার জানা নেই। অস্তু অনেকবার বলেছে এসব কথা। আগে শুনলে দৌড়ে গিয়ে অস্তুর মুখে হাত চাপা দিয়েছে। এখন কিছু বলে না। মরে গিয়ে সব কিছু চুকিয়ে বুকিয়ে দেওয়া তার মনে কোনও দিন ধরেনি আজও ধরে না। কিন্তু বাঁচার গ্লানি তাকে কাল রাত্তিরে যেভাবে পীড়া দিয়েছে আজ যদি তারই পুনরাবৃত্তি ঘটে সে কথা ভাবতেই সে শিউরে ওঠে। আবার সে নিরেট পানা ভর্তি জলের দিকে তাকায়। মেঘ তাতে একটুও দাগ কাটতে পারে নি। নয়নের হঠাৎ মনে পড়লো কলমবেচার কথা। হাসি পেলো। মরে যাবার পরও শরীরের জন্যে এত মায়া। সে যদি এখন জলে পড়ে তাহলে দু-তিন দিন পর ফুলে ঢোল হয়ে তার শরীর ভেসে উঠবে। কিন্তু তার মন? না, সে পারবে না, অন্তত তার মনের জন্যে সে পারবে না। সেখানে তো চিড় ধরেনি।

হঠাৎ পাশের ঘরের বৌটি ডাক দিল, "দিদি, কী পুড়ছে তোমার উনুনে।"

নয়ন আল্‌সের পাশ থেকে আস্তে আস্তে সরে আসে। মনে মনে হেসে বললে, "আপাতত মুলতুবি থাক ব্যাপারটা।"

অফিস থেকে ফিরে অস্তু অবাক হয়ে যায়। ঘরে ধুনোর গন্ধ।

এককোণে মশা তাড়াবার জন্যে জিলিপির কাঠি জ্বলছে। বললে, "এসব আনলে কে?"

"কেন আমি।"

"তুমি একলা একলা বাজারে গিয়েছিলে? কী এমন মশা, মশায় লোক থাকছে না। এ টাকা তোমায় কে দিলে?"

তারিণীদার কয়েকখানা উকিলনামা নকল করে দেওয়ার জন্যে কয়েকটা টাকা পেয়েছিল নয়ন। তাই থেকে এসব কিনেছে। কিন্তু সেদিক দিয়ে না গিয়ে বললে, "আমি বাপু সাধু নই, সন্ন্যাসীও নই। আমার মশা লাগে, শীত লাগে। একটা কম্বল দেখে এলাম বাজারে। খুব ধোকড় মার্কা কিন্তু নীচে পাততে বেশ।"

অন্তু কয়েকবার 'বিলাসিতার' জন্যে তাকে খোঁটা দিল। কিন্তু নয়ন প্রতিজ্ঞা করেছে, আজ রাত্তিরে অন্তত সে সারিডন না খেয়েই কাটাবে।

পাশের বাড়ির ছেলেমেয়েগুলো আজও সন্ধ্যার পরে সমস্বরে গান জুড়েছে। দু-একটা থাকলেও কালকের মত মশা নেই। তাছাড়া ধূনোর গন্ধ হয়েছে বেশ। হোল্ড-অলটায় শুতে অন্তুর বেড়ে আরাম লাগলো। বললে, "আমার বিছানাটা রোদ্দুরে দিয়েছিলে না কি?"

"হ্যাঁ"

"আমার অত বিলাসিতায় দরকার নেই।"

নয়ন চুপ করে থাকে। বিলাসিতার ঠোক্কর দিয়ে তাকে কাত করা যাবে না।

নয়নের মনে পড়লো মার সঙ্গে তার কুম্ভমেলা যাবার কথা—সঙ্গমে বালির চরে ঝুপড়ি বেঁধে থাকা, উলঙ্গ সন্ন্যাসীদের শোভাযাত্রা, ম্যাজিক, সিনেমা, রাজকুমারী আর ধনী কন্যাদের জলকেলি আর অসংখ্য খোঁড়া ভিখিরিদের জমজমাট আড্ডা। সেই অগণিত বিক্ষিপ্ত ছবির মধ্যে এক

ভোর বেলাকার কথা মনে আছে তার। যেখানে হোম হচ্ছে সেখানে মার সঙ্গে গিয়েছিল সে। প্রায় দেড় মানুষ সমান উঁচু ঘি-এর পাহাড়, ধান, গম, যব—পঞ্চশস্যের বিরাট স্তূপ। কন্দর্পকান্তি তরুণ সন্ন্যাসীরা যখন সামগান গাইতে গাইতে শস্য আর ঘি আগুনে ঢালছে আর চারদিকের লোকেরা মুগ্ধ হয়ে গান শুনছে সেই বিহ্বল অবস্থাতেও নয়ন ভীড়ের মধ্যে থেকে চীৎকার করে উঠেছিল, "মা, এখানে এত জিনিষ নষ্ট হচ্ছে, আর ওদিকে···"

নয়ন বলতে যাচ্ছিলো ওদিকে কলকাতায় রাস্তায় লোক মারা যাচ্ছে। সেটা যুদ্ধের সময়। বাংলা দেশের বিশাল এলাকা জুড়ে দুর্ভিক্ষ চলেছে।

নয়নের মা চেঁচিয়ে উঠেছিল, "চুপ কর, চুপ কর, তোকে নিয়ে কোথাও শান্তি নেই আমার।"

না, যখন সে মুগ্ধ হয়েছে তখনও বিলাসিতায় তার মোহ ভঙ্গ হয় নি। মা অবশ্য শাস্ত্র থেকে অনেক কথা বলে তাকে বুঝিয়েছিলেন কিন্তু সে আর বেশীক্ষণ সেখানে দাঁড়াতে দেয় নি মাকে। বিলাসিতার ঠোক্কর দিয়ে তাকে কাত করা যাবে না।

নয়ন সে রাত্তিরে ঘুমায় সারিডন না খেয়েই।

পনেরো

সেদিন নাইট ডিউটি। মুখার্জি নামে যে লোকটি তার অফিসে টেলিফোন করে তাকে গোপাল আগে থেকেই চিনতো। তাদের পাড়ার গাঙ্গুলী ডাক্তারের আত্মীয়। ছুটির দিন ভবানীপুর থেকে এসে গাঙ্গুলী ফার্মেসীতে আড্ডা দেয়। মুখার্জি টেলিফোন করছে টেবিলের উল্টো দিকে বসে আর নিদারুণ গাল দিচ্ছে টেলিফোনের মেয়েদের। রিসিভার না নামিয়ে এমন খটখট শব্দ আরম্ভ করে দিলে

যে গোপাল তার কপি থেকে মুখ না তুলে পারে না। বলে, "কী হচ্ছে মুখার্জি।"

রাত্তির দশটা পার হলেই আর লাইন পাওয়া না গেলেই মুখার্জির চোখ মুখ লাল হয়ে যায়। এত বেশী ঘন ঘন নস্যি নিতে সুরু করে যে রিসিভারের কোণায় কোণায় নস্যি জমে। পরদিন সকালে সাফ করে নিতে হয়। মুখার্জি মাতালের মত ইংরেজিতে গালাগালি দেয়, ভীষণ ভারিক্কি চালে বলতে থাকে কেমন ভাবে রিপোর্ট করে মেয়েটির চাকরী খাবে।

গোপালের কপি টাইপ করা হয়ে যায়। কতকগুলো ঠ্যাং খোঁড়া জমিদার আর সওদাগর অফিসের দু-তিনটে দিশী বড়সাহেব (যাঁরা রিটায়ার করার পর সমাজসেবী হতে চান) সেদিন সন্ধেবেলা ক্যালকাটা ক্লাবে একটা পার্টি খুলেছেন। জনসাধারণের অর্থনৈতিক কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে তাদের এক "উন্নততর সাংস্কৃতিক পর্যায়ে পৌঁছে দেবার সর্বতোমুখী প্রচেষ্টা" করতে হবে ইত্যাদি। দু-এক লাইন না দিলে কাল আবার টেলিফোন করে চেঁচামেচি করবে।

পাশের ঘরের টেবিলে কপিটা দিয়ে আসবার সময় একবার আড়-চোখে বাঁদিকের শেষ চেয়ারটার দিকে তাকালে গোপাল। - মিঃ বসু— একেবারে পাখীর মত ছোট্ট লোকটা, চেয়ারের ভেতর প্রায় মাথা ঢুকেছে। পাশ দিয়ে আসতে আসতে হাল্কা ভাবে গোপাল বললে, "ক-টায় যাচ্ছেন ?"

"এই…" এমন আস্তে বললেন বোঝা গেল না।

তাদের ঘরে মুখার্জি একবার শেষপ্রস্থ গালাগালি করে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে উঠল।

গোপাল জিজ্ঞেস করলে, "কলেরা ?"

"এই শীতে কলেরা! আছে দুটো।"

"ষ্ট্যাবিং ?"

"মাত্র একটা, লিখে নাও।"

লেখা হলে গলা নামিয়ে মুখার্জি বললে, "মাইরি, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

"টাকা বাদ দিয়ে বল।"

মুখার্জি চীৎকার করে উঠলো, "জানি বাবা, তোমরা বড়লোক, সাধারণ লোকজনের কথা তো পাত্তাই দেবে না।"

গোপাল বললে, "চেঁচামেচি করো না। তুমি আবার সাধারণ হতে গেলে কবে থেকে ? ছেলেকে সাহেবদের স্কুলে পড়াচ্ছো, বৌ-এর জন্যে ইণ্ডিয়ান সিল্ক-হাউসে যাতায়াত কর।"

মুখার্জি তার বিরাট শরীরটা দুলিয়ে বললে, "মাইরি গোপাল, রাগ করিস না। ছেলেকে ফিরিঙ্গিদের স্কুলে দিয়ে যা মুশকিলে পড়েছি। সেই জন্যেই তো ধার চাইছি মাইরি।"

গোপাল রেগে উঠে বললে, "তোমার লজ্জা করে না মুখার্জি। তুমি যা পার না তা কেন ঘাড়ে নিচ্ছ।"

মুখার্জির অহমিকায় লাগে। পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে তারও ভাগে ভবানীপুরের একখানা বাড়ির এক তৃতীয়াংশ পড়েছে। সাংবাদিক বলে পাড়ার ক্লাবে জাঁক দেখায়। একটু আহত হয়ে বললে, "একবার ধার চাইছি বলে এত কথা শোনাচ্ছ।"

টেলিফোনের ওপর হাত রেখে আস্তে আস্তে বলে মুখার্জি, "তাছাড়া দেখ, যখন নিজেদের দিকে তাকাই তখন ভাবি আমরা না হয় এই ভাবেই শেষ হলাম কিন্তু আমাদের ছেলেরা যেন…"

গোপাল জুড়ে দিলে, "সাহেবদের স্কুলে পড়ে…"

মুখার্জি উত্তেজিত হয়ে বলে, "হ্যাঁ, ঠিকই তো। এই যে সব বড় বড় স্কুল দেখছিস, এগুলো তো একেবারে গোয়াল! এখানে কি

ছেলেদের শিক্ষা হয়! নিজেদের দিকে তাকিয়ে ভাবি আমরাও তো কতকিছু হতে চেয়েছিলাম।"

"কী হতে চেয়েছিলে?"

মুখার্জিকে একটু দিশেহারা দেখায়। সত্যিই সে কী হতে চেয়েছিল—দিগ্বিজয়ী ব্যারিষ্টার, ডাক্তার···? রুখে বলে, "তুই কি বলতে চাস গোপাল, ভাল শিক্ষাদীক্ষা পেলে এখন যা আছি তাই থাকতাম?"

"আমি তো তা বলছি না মুখার্জি।"

মুখার্জি উদাসভাবে বলে, "কত কী হতে পারতাম!"

হঠাৎ মুখ ভেংচিয়ে গোপাল বলে, "হতে পারতাম, হতে পারতাম! তোমাদের কথা শুনলে গা জ্বলে মুখার্জি। বিশ-তিরিশটা বছর তাস দাবা পিটে আড্ডা মেরে কাটিয়ে দিলে আর বাকী জীবন কী হতাম কী হতাম করে নাকী কাঁদা!"

মুখার্জি উঠে পড়লো। আহত গলায় বললে, "তোকে আমি একটুও বুঝি না গোপাল। সেদিন ঝগড়া করলি আমার হয়ে মিঃ সেনের সঙ্গে। আর আজ যা-তা বলছিস্।"

ভারী শরীরটা টানতে টানতে মুখার্জি বেরিয়ে গেলেন।

গুম্ হয়ে বসে থাকে গোপাল। শীতের আকাশে খুব নীচু হয়ে একটা এরোপ্লেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। গোপাল জানলার ধারে আসে। দুটো নীল আলো চৌরঙ্গীর ওপর ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটু কুয়াশাও হয়েছে। তাদের অফিসের পাশের গলিটা চাঁদনীতে ঝক ঝক করছে। নির্জন রাস্তায় বাবুদের নৈশ অভিযানের আশায় কতকগুলো ফিটন দাঁড়িয়ে, তাদের গাড়োয়ানরা মাথায় মুড়ি দিয়ে ঘোরাফেরা করছে।

গোপাল আড়ষ্ট ভাবে বসে থাকে। কয়েকটা টেলিফোন করে এদিক সেদিক। কিন্তু দেখা গেল নতুন করে কেউ ছুরিকাহত হয়নি,

জাহাজগুলো ডকে বেশ বহাল তবিয়তেই আছে, আর শহরের নড়বড়ে প্রায় ধ্বসে পড়া বাড়িগুলো আরও একটা দিনের জন্যে তাদের অস্তিত্ব সগর্বে ঘোষণা করে যাবে।

গোপাল উঠে ফের জানলার ধারে আসে। মাঝ রাত্তিরের কনকনে হাওয়া আসছে। গোপাল মুখটা বাড়িয়ে দেয় বাইরে। ঠাণ্ডা হাওয়া ঘাড়ে পিঠে লেপে কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়। ঘরের ভেতর জুতোর আওয়াজ এলো। পেছন থেকে মিঃ বসু বললেন "কী মশাই, প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছেন?"

"বসুন, বসুন, একলা একলা ঘুম ধরে যাচ্ছিলো," গোপাল চেয়ার টেনে দিয়ে বললে।

মিঃ বসু বললেন, "বেড়ে ওয়েদার। আজকে আবার 'ড্রাই' বানিয়েছে শালারা" চেয়ারে বসে সিগারেট টানতে টানতে বললেন, "গত সপ্তাহে একটু বেড়িয়ে এলাম।

"কোথায়?"

"জায়গাটা মেদিনীপুরের মধ্যে। সমুদ্র আছে। কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে গিয়েছিলাম। এমনি যে খুব ভাল তা নয় তবে সেখানে একটা জিনিষ আছে যার জন্য আবার যাব ভাবছি।"

"কী রকম?"

"বেশ ভাল। দিশী, একটু টোকো ঘোলের মত, তবে নেশাটা চমৎকার। বেশ ফ্রেঞ্চ, টেণ্ডার।"

গোপাল চুপ করে মিঃ বসুর দিকে তাকিয়ে থাকে। এক বিষয় ভদ্রলোক মন্দ না—কোনও সাহিত্যিক ঢং নেই তাঁর। মদের কথা ছাড়া তিনি কোনও জিনিষের ওপর 'সিরিয়াস্‌লী' কথা বলেন না। এক একবার মনে হয় এইবার বুঝি কথা বলবেন। কিন্তু মামুলী কতকগুলো বিরক্তি বা অসন্তোষ ছাড়া তার মুখ থেকে আর অন্য কথা বেরোয় না।

গোপাল হেসে বললে, "এবার আমাকেও নিয়ে যাবেন। একটু ঘোলের সরবত খেয়ে আসব।"

মিঃ বসু হঠাৎ বললেন, "আচ্ছা আপনি 'ডক্টর ফস্টাস' পড়েছেন ?"

গোপাল একটু চমকায়। লোকটা মদ বাদ দিয়েও কথা বলছে। আর টোকো ঘোলের পরেই টমাস মান--বাহাদুরী আছে বটে।

গোপাল বললে, "পড়েছি। ইউরোপীয়ান মিউজিক তো বিশেষ বুঝি না। তাই বুঝতে অসুবিধে হয়। তবে শেষ অংশটা খুব ভাল লেগেছে। ভাবতেই আশ্চর্য লাগে মানুষ কী করে এত বড় হয় এত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে!"

মিঃ বসু ভুরু কুঁচকালেন। মনে হল শেষের কথাটা তিনি উড়িয়ে দিতে পারছেন না আবার সম্পূর্ণ মানবারও ইচ্ছে নেই তাঁর। বললেন, "গ্যেটে-শীলারের দেশ, এত বড় বড় কলকারখানার দেশ জার্মানী। হিটলার মারতে চেষ্টা করলেও তো সে দেশ মরে না। তবে জার্মান সভ্যতা আর বাঙালী মধ্যবিত্তের এই কালচার! কোথায় মেলাবেন আপনি ?"

এত কথা মিঃ বসুকে বলতে কোনওদিন শোনেনি গোপাল। ধীরে ধীরে বললে, "বাঙালী মধ্যবিত্তের পেছনেও তো আছে ভারতবর্ষ।"

মিঃ বসু এড়িয়ে গেলেন মনে হল। হাল্কাভাবে বললেন, "বক্তৃতা করছেন ?"

গোপাল চুপ করে থাকে। কিন্তু অন্য সময় মধ্যবিত্তের প্রসঙ্গে তাকে যেমন অসহায় দেখায় আজ তেমন মনে হয় না। সত্যিই বাঙালী মধ্যবিত্তের অকারণ ঢক্কানিনাদ (যা পঁচিশ পেরিয়েই চুপ হয়ে যায়) তাকে এতদিন পীড়া দিয়ে এসেছে। আর তাছাড়া চারদিকে এত বেশী বেঁড়েমি যে সেখানে একটা খুব বড় আদর্শবাদ প্রতিষ্ঠিত করার প্রশ্নটা তার কাছে প্রায় অসম্ভব ঠেকেছে। চিন্তার

দিক থেকে তাই মিঃ বসুর মত কয়েকজন লেখক যখন মধ্যবিত্ত জীবনের গ্লানির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তাদের লেখায় তখন সে তাদের বাস্তববাদী বলে মনে মনে ধন্যবাদ জানিয়েছে। কিন্তু বয়স ও অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ক্রমশ ধারণা হচ্ছে এ চিন্তাধারার একটা দিক খুব তীব্র ভাবে সত্য হলেও আর একটা দিক তেমনি তীব্র ভাবে অসত্য। কথাটা খুব সহজ ঠেকলেও তার কাছে অন্তত একটা স্পষ্ট রূপ ধারণ করেছে। বাঙালী মধ্যবিত্ত তার সামাজিক খাঁচায় আটকা পড়েছে বলেই তার মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলবে কী করে? মানুষ আগেও তার সীমানা অতিক্রম করেছে, আজও করবে। কথাটা ঠিক মেঠো বক্তৃতা না তার কাছে।

উল্টো দিকের দেয়ালে ফরফর করে একটা ক্যালেণ্ডার উড়ছিল এতক্ষণ। হাওয়া লেগে উল্টে যায় হঠাৎ। গোপাল উঠে গিয়ে সোজা করে দিতেই ছবিটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। কোনারকের ঘোড়ার ছবি। আশ্চর্য লাগে গোপালের, যেন সে প্রথম দেখলে ছবিটা। অনেকগুলো মড়া ঠেলে একটা মানুষের ধড় ঘোড়ার লাগাম খিঁচে চলেছে। ঠিক এভাবে সে ছবিটাকে এতদিন দেখেনি। তার মনে পড়ে, গত বছরে দেখা কোনারকের সূর্যমন্দিরের কথা। অসংখ্য হাতি মানুষ রথের সারি ছাপিয়ে যে ছবি তার মন জুড়ে আছে সে কয়েকটা নটীর মূর্তি। মৃদঙ্গ করতাল বাজিয়ে তারা লাফ দিতে দিতে বেরিয়ে আসছে মন্দিরের মাথার উপর থেকে।

গোপাল ধীরে ধীরে বলে, "গত বছর যখন বেকার ছিলাম তখন একবার গিয়েছিলাম কোনারকে। তখন থেকেই ভাবছি কথাটা। ভাবছি তাদের কথা যারা পাথর ছেনে মূর্তি বানিয়েছে। সেটা তো মধ্যযুগ। আর মন্দিরের ইতিহাস ঘাঁটলেই দেখা যায় অনেক সময় চাবুক হাতে অনিচ্ছুক লোকজনকে বাধ্য করানো হয়েছে মূর্তি গড়তে।

সেই যুগে যখন রাজা জমিদার ইচ্ছে করলে মানুষের প্রাণ রাখতে পারতো নিতে পারতো সেই যুগেও এ লোকগুলো ত্যাড়াব্যাঁকা ভাবে দায়সারা গোছের মূর্তি বানালে না কেন? তাদের কী দায় পড়েছিল অত অমানুষিক যত্ন নিয়ে মূর্তি বানাবার? কাউকে তো নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়নি। আর শুধু কোনারক কেন সারা দেশ জুড়ে যে পাথরের ওপর মানুষ তাদের প্রাণ ঢেলেছে তাকে ব্যাখ্যা করেন কী করে? জীবিকার কথা বলা হয় লেখায়, সমাজের কথা বলা হয়, শ্রেণীব কথা বলা হয়, কিন্তু সব জুড়ে মানুষের কথা বলা হয় না কেন? মানুষ তো অন্ধকারেও বাঁচে আলোতেও বাঁচে—এ কথাটা বলতে ভয় কি?"

শেষের দিকে গোপাল প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিল। একবার সে তাকিয়ে দেখে পাশের ঘর থেকে কেউ শুনেছে কিনা তার কথা। মিঃ বসুর চোখ মিটমিট করে। ছাই রং-এর ওপর শাদা ডোরা কাটা সার্জের পোষাক পরা লোকটা একবার ঘাড় এদিক ওদিক করে। মনে হয় ছাই রংএর একটা পাখী চেয়ারে এসে বসেছে। আরও দু-একবার ঘাড় এদিক ওদিক করে মিঃ বসু হেসে বললেন, "আপনিও টেনেছেন নাকি?"

গোপাল বুঝলে ভদ্রলোক একটু বেরিয়ে এসেই আবার ঢুকে পড়েছেন তাঁর গর্তে। আর খোঁচালেও বেরোবেন না। আর খুঁচিয়েই বা লাভ কি? অসোয়াস্তি চেপে গিয়ে শান্ত গলায় সে বললে, "না মশাই হাতে পয়সা কোথায়?"

মিঃ বসু বললেন, "কেউ কেউ টেনে গুম্ হয়ে যায়, কেউ আবার বড্ড বেশী বকে।......ইস্, সাড়ে বারোটা বেজে গেছে। এখনও কতগুলো কপি জমে আছে টেবিলে। যাই, নইলে আবার চেঁচামেচি করবে বেটারা।"

গোপাল একলা ঘরে কোনারকের ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

মিঃ বসু একদিন বলছিলেন গোপালকে, "আপনার বয়স কত হল? পঁচিশ পার হয়েছেন? আরও পাঁচটা বছর যাক, বুঝতে পারবেন। জানিনা, বোধ হয় আপনারা যাকে কাব্য করে বলেন নদীমাতৃক দেশ, তারই জন্যে। মানে, জলো সোঁদা ভাবখানা হাওয়ায় বড্ড বেশী। তাড়াতাড়ি ফুলে তাড়াতাড়ি চুপসে যায় এখানে সব।"

মিঃ বসু আজকাল কথা বলছেন। বোধ হয় গোপালের অপরিসীম ধৈর্যের কাছে তিনি হার মেনেছেন। গোপাল নিজে মদ খেয়ে পাঁড় হতে ভালবাসে না তবুও ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিছক পাঁড় হবার গল্প শুনেও বিরক্ত হয় না বলেই বোধ হয় তিনি মুখ খুলেছেন। কিন্তু গোপালের মনে হল কথা না বললেই ভাল ছিল। একদিকে উচ্ছ্বাস আর বাচালতার রোগ আর একদিকে এক ঠাণ্ডা মানসিক ধ্বজভঙ্গতা —এই দুই পাঁক ঠেলে কি বাঙালী মধ্যবিত্ত উঠতে পারবে না?!

গোপালের আজকাল কী হয়েছে বোঝা মুস্কিল। অফিসে বসে থাকতে থাকতে তার মনে হয় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। বিকেলে গিয়ে মুখ ধুয়ে আসে মাঝে মাঝে।

মিঃ বসু বলছিলেন, "দেখুন কিছু করবেন এ ধরনের কথা বলবেন না আমায়। এ ধরনের বাকতাল্লা এত শুনেছি যে গা ঘিনঘিন করে। সাহিত্যের আসরগুলো আসলে সার্কাস। সেখানে একদল বলছে, রবীন্দ্রনাথ কিছু করতে পারেনি, আর একদল বলছে, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের আদি এবং শেষ কবি। দু দলই কিন্তু সাহিত্যের কোনো দায়িত্ব নেবে না কোনওদিন। কয়েকটা কলেজের ছোঁড়া যাদের হাতে কিছু উদ্বৃত্ত সময় আছে আর কয়েকটা সাহিত্যিক দাদা যাদের যেখানেই দাঁড় করিয়ে দাও হাউ হাউ করে খানিকটা চেঁচাবে—এরি জন্যে এত হট্টগোল কেন বাবা?"

এ কথাগুলো যদি মিঃ বসু উত্তেজিত ভাবে বলতেন তা হলেও

মানে ছিল। মনে হতে পারতো সত্যিই লোকটার গা জ্বালা করছে চারদিক দেখে। কিন্তু না, গা জ্বালা করার কোনও কথাই আসে না তাঁর আলাপের মধ্যে। ডোরাকাটা কোটের মধ্যে ঘাড়টাকে ডুবিয়ে চোখ পিটপিট করে এমন প্রশান্ত ভাবে কথাগুলো বলেন যে এর বিরুদ্ধে যেন কোনও আপীল করা যায় না।

তিনচার বছর আগে গোপাল নিশ্চয় ভাবতো, লোকটা নিজে একেবারে দেউলিয়া হয়ে গিয়ে তার চারপাশে কাদা ছিটিয়ে বাঁচবার সান্ত্বনা খুঁজছে। কিন্তু এ ভাবে দেখা একটু সহজীকরণ ঠেকে আজ-কাল। এটা যদি একটা দুটো লোকের ব্যাপাব হত তাহলেও বা মানে ছিল। কিন্তু যারই গায়ে হাত দিতে যায় তারই গলা দিয়ে এমন বেয়াড়া আওয়াজ বেরোয় কেন?

অথচ মানুষ হিসেবে লোকগুলো খারাপ কি? কেউ বেশী পড়া-শুনা করেছে, কেউ করেনি; কেউ একটু নিজের বেশী স্বার্থ দেখে, কেউ কাছাখোলা; কারুর সিনেমা দেখতে ভাল লাগে, কারুর সমস্ত ফুটবলসিজন মাঠে না চেঁচালে ঘুম হয় না; কেউ বলে নেহেরু দেবতা, কেউ বলে নেহেরু শয়তান—এ মানুষ প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক কালেই ছিল। এমন কি যখন তার কৈশোর কালে সে নিছক স্বপ্ন দেখতে ভালবাসতো, ভালবাসতো ভাবতে ঊনবিংশ শতাব্দীর ফ্রান্সে জন্মিয়েছে ডাচেসদের সঙ্গে রাজনৈতিক আলাপের সঙ্গে প্রেম নিবেদন করছে, সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর ফ্রান্সেও তো গিস্‌গিস্‌ করছিল এই মানুষ। তাহলে তার এ অস্থিরতা কিসের জন্যে? কেন মনে হয়, আর একটু হলেই সে চেঁচিয়ে উঠবে সকলের সামনে?

অবশ্য একটা কথা আছে। সেটা কী তা খুব স্পষ্ট করে ফরমূলা বেঁধে যদি কেউ দেয় তাহলে হয়তো তার আপত্তি হবে, যা হ'ত তার কোন বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলবার সময়। কিন্তু একটা কথা যে

আছে আর তা বেশ বড় কথা তা আজ সে প্রত্যেক কাজে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। সেই একটা কথা নিশ্চয় এই লোকগুলোর ব্যক্তিগত ভাল লাগা না-লাগার ওপরেও একটা কথা। সেটাকে দেশ বললে গোপালের কাছে তা পরমব্রহ্মের মত দুর্জ্ঞেয় লাগে। কিন্তু যদি বলা যায় একটা সমবেত সামাজিক অস্তিত্ব তাহলে বোধ হয় কিছুটা নাগাল পাওয়া যেতে পারে।

সেই সমবেত সামাজিক অস্তিত্ব একেবারে চোখে পড়ে না গোপালের। ট্রামে, বাসে, অফিসে পারিবারিক আড্ডায় সে তো সব সময়ই চোখ খুলে থাকতে চেষ্টা করেছে। এই না দেখাটা একমাত্র তার নিজের চোখের দোষ এটা ভাবে কী করে? আর এই অস্তিত্বটা তার কাছে এতই গুরুতর যে সেটা যেখানে নেই সেখানে দাঁড়িয়ে শেকসপীয়র পড়া যায় না, যে লোকটা তার নিকটতম তাকে আদর করে মন ভরে না। নিজের তীব্রতম ও গভীরতম অনুভূতি হয়ে দাঁড়ায় সমাজনিরপেক্ষ এক একটা নীড়, এক একটা কুঞ্জবন। সেটা বন্ধুত্বের কুঞ্জবন কিম্বা প্রেমের কুঞ্জবন, এমনকি পড়াশোনার কুঞ্জবন অথবা রাজনৈতিক কুঞ্জবনে দাঁড়িয়ে যায়। তাই যেন পালিয়ে, চুরি করে আনন্দ পেতে হয় পাছে চারপাশের লোকের বিরাট নিরানন্দ অস্তিত্বে কোনও অহেতুক সাড়া পড়ে।

গোপালের একটা কেমন বিদঘুটে ধারণা আছে এই অস্তিত্বের ভাবটা জাগাবার বিষয়। তার মনে হয় যদি কখনও সবাই মিলে কোনও প্রকাণ্ড ঝুঁকির সামনে না দাঁড়ানো যায়, যেখানে প্রায় সমস্ত কিছু বিপন্ন, তাহলে কখনই সমবেতভাবে বিরাট আনন্দের দাবী করা যায় না। হয়তো তার এ প্রসঙ্গে চিন্তাধারাটা বোকামি কিন্তু তার মনে হয়েছিল উনিশ্‌শো বিয়াল্লিশ সালে যদি জাপানীরা বাংলা দেশে ঢুকে পড়তো তাহলে বোধ হয় এর একটা সুরাহা হতে পারত।

তাহলে "কিছুতেই কিছু এসে যায় না" এই কথাটা একমাত্র সত্যি কিম্বা "যা পারেন করে নিন দাদা," এই নেহাৎ একান্ত স্বার্থপর কূপমণ্ডুকতা যা অন্তত বাঙালী মধ্যবিত্তকে একেবারে পাঁকে গেড়ে রেখেছে তার হাত থেকে বাঁচা যেত। কলকাতার উপকণ্ঠে গোপাল দেব আর শেখ শাহজাদ আলী, নগেন খাঁড়া আর গীতশ্রী নমিতা চাটুয্যে একই সঙ্গে বুলেটবিদ্ধ হয়ে মরে অন্তত এ কথাটা দেশবাশীকে জানাতে পারত, আরও একটা কথা আছে। এই ঐতিহাসিক পবিত্র রক্তপাতের প্রয়োজন ছিল। তাহলে বোধ হয় দেশভাগের মত একটা কুশ্রী নোংরা অধ্যায় এদেশে সম্ভব হত না।

অনেকে আশ্চর্য হয়ে বলতে পারেন, এ ধরণের অসহিষ্ণুতা নিয়ে গোপাল "প্রেম করছে" কী করে? আর তাও আবার চল্লিশ বছরের এক মহিলার সঙ্গে! গোপাল নিজেই অবাক হয়ে যায়। নয়নের কাছে যখন সে যায় তখন চারদিকে এই সামাজিক অস্তিত্বের অভাবের যে পীড়া তা মাথায় করেই যায়। বারবার নিজেকে প্রশ্ন করে, সে কি শেষ পর্যন্ত তার নিজের মত করে কুঞ্জবন তৈরী করলে! কিন্তু যেখানে দুজনের সম্বন্ধ কাল কী দাঁড়াবে তার কোন স্থিরতা নেই সেখানে কুঞ্জবনের কোন কথাই ওঠে না। তাছাড়া কোন্‌টা কুঞ্জবন কোন্‌টা নয় এই চুলচেরা বিচার তার কাছে অনেক সময় এক রকম অসুস্থতা বলে মনে হয়। অন্তত নয়নের কাছে গেলে তাই লাগে। যে লোকটা সারাজীবন মানুষের কাছ থেকে অশ্রদ্ধা কুড়িয়েছে সে যখন মানুষকে শ্রদ্ধা জানায় তখন গোপালের ভয় হয়। ভয় হয়, কোথাও তার একটা ভুল হচ্ছে। আরও এক ধরণের সামাজিক অস্তিত্ব কোথাও আছে যেটা তার বিরক্তিতে চাপা পড়ে যাচ্ছে, যাকে বোধ হয় ঠিক সম্মান দেওয়া হচ্ছে না।

নয়ন যেন তাকে ডেকে বলে, "দেখ, আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, যা

ভাবি তাও হয়তো গুছিয়ে বলতে পারি না, তুই কেমন বলতে পারিস্। (যার জন্যে গোপালের মনে হত সে বানিয়ে বানিয়ে কথা বলছে) আমার বোধ হয় এটা বড্ড দোষ গোপাল, মানুষের ওপর রাগ করতে পারলাম না।"

যে মধ্যবিত্ততার গ্লানি গোপালকে অহরহ পীড়া দেয় নয়নের কাছে এলে তা যেন চাপা পড়ে যায়। সে একটা মানুষ এই পর্যন্ত তার খেয়াল থাকে। মাঝে মাঝে ভয় হয় হারিয়ে ফেলবে তার এই সম্পদ। চার-পাশের বিরক্তির আবহাওয়ায় কী ভাবে বাঁচিয়ে রাখবে এই শিখাটিকে ভাবতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। মনে মনে ধন্যবাদ জানায় নয়নকে, তাদের সম্বন্ধের কোনও একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত পরিণতির দিকে সে তাকে টানেনি বলে। গোপাল ভাবে, ইচ্ছে করলেই সে অতি সহজে তাদের সম্বন্ধটাকে ভেঙে দিতে পারে। আর ভাবলেই ভয় হয়।

রাত্তির দশটার সময় টাইপরাইটারে বসে নয়নের মুখখানা বারবার ভেসে ওঠে গোপালের সামনে। টাইপে ভুল হয়। মুখার্জি ফোন করার ফাঁকে তার একনিবিষ্ট অন্যমনস্কতায় কৌতূহল প্রকাশ করলে, "কী বাবা গোপাল, প্রেম করছো নাকি?" একটু স্নেহের সঙ্গে বললে, "তা তো করবেই, তোমাদের তো এখন রক্ত ফুটছে। তবে কি জান, কুড়ির ওদিক হলে আর করো না মাইরি। ও ভাই তোমরা আজকাল যাই বল, আমাদের শাস্ত্রকারেরা যা বলেছেন, আসল চীজই থাকে না।"

গোপাল হঠাৎ মুখ লাল করে চেঁচিয়ে উঠলো, "মুখার্জি, আই ওয়ার্ণ ইউ।"

মুখার্জি ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়। গোপাল টেবিল ছেড়ে লাফিয়ে উঠেছে, মুখ থমথম করছে। মুখার্জি উদ্বিগ্ন হয়ে বললে, "কী ব্যাপার? তোর অসুখ বিসুখ করেনি তো গোপাল?"

মুখার্জির গলার স্বরে আন্তরিকতা ছিল। অনেক সময় নিজের যা নেই তাই অন্যের মধ্যে দেখলে আকৃষ্ট হয় মানুষ। একান্ত ভাবে শান্তিপ্রিয়, সদ্‌ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকটি বোধ হয় এই কারণেই আকৃষ্ট হত গোপালের একরোখামির প্রতি।

মুখার্জির কথায় লজ্জা পায় গোপাল। তার উত্তেজনা সে যেন ডেকে ডেকে দেখাচ্ছে সবাইকে। চুপ করে টাইপ করতে থাকে সে।

মুখার্জি এবার একটিপ নস্যি নিয়ে জ্ঞান দিতে থাকে, "তোর মাইরি একটা বড্ড দোষ, মাঝে মাঝে এমন লাফালাফি করিস্। তোর ভালোর জন্যেই তো বলি। এখন অন্যদিকে মন টন দিস্‌নে। টাকা পয়সা জমিয়ে কোন রকমে তিরিশটা বছর পার করে দে। বুঝলি ও সব.........," বেশী নস্যি ছিটিয়েছে বলে রুমাল দিয়ে টেলিফোনের রিসিভার পরিষ্কার করতে থাকে।

গোপাল কথা বলে না। মুখার্জির কথা তার কানে যাচ্ছে কিনা বোঝা গেল না। তার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসে মুখার্জি। বলে, "পঁচিশ বছরের রোয়াব। ও রকম একটু আধটু হয়েই থাকে। তবে একটু সামলে ভাই। তা ছাড়া এখন তো বুঝবি না। আসলে মেয়ে মানুষ মানেই নরক, স্রেফ নরক।"

গোপাল কৌতূহলী হয়ে তাকায় মুখার্জির দিকে। লোকটা বাইরে থেকে বেশ শান্তিপ্রিয় ভাল মানুষটি, কিন্তু কোথায় যেন চাপা অশ্লীলতা লুকিয়ে আছে তার আচরণে। মাঝে মাঝে ফুটে ওঠে কথাবার্তায়। গোপাল হঠাৎ বললে, "মুখার্জি, তুমি বেশ্যাবাড়ি যাও নাকি?"

মুখার্জি চমকে যায়। বলে, "এই দেখ আবার পাগলামী সুরু করলে," তারপর বেশ স্বাভাবিক ভাবেই বললে, "তাই যদি বললি তবে বলব সব এক—সব, সব। তুই যাদের কথা বললি তারা বরং ভাল, অত আবদার নেই ঐটুকুর জন্যে।" একটু সংযত হয়ে বললে, "যাঃ

সময় কাটছে না বলে মাইরি এসব বলছি। নইলে চার ছেলের বাবা হয়ে.........।"

"ওগুলো তোমার ছেলে?"

মুখার্জি অবাক হয়ে বললে, "আমার না তবে কার?"

অনেকক্ষণ টাইপ করে চোখ টাটাচ্ছিল গোপালের। হাই উঠছিল। পা টান করতে করতে বললে "তুমি জান না মুখার্জি, তুমি যখন তাস খেলতে বার হও

তেড়ে খিস্তি স্বরু করে দিলে গোপাল।

ষোলো

নয়নের নতুন বাসায় যাবার পর সাতদিন কেটে গেছে। গোপালের যাওয়া সম্ভব হয় নি। প্রথমত সে ছুটি পায় নি এ সপ্তাহে। চক্রবর্তী সস্ত্রীক সাঁওতাল পরগণায় বছরের একটি মাস ছুটি কাটাতে গিয়েছেন, মুখার্জির আবার ছেলে হবে সেও দিন দুয়েক ছুটি নিয়েছে। আর রায় তার পরিবার নিয়ে কী একটা ইংরেজী ছবি দেখবার জন্যে টিকিট কিনেছে। যার কোনও ঝামেলা নেই অর্থাৎ গোপাল তারই ওপরে রোববারে আত্মত্যাগ করার কর্তব্য এসে পড়েছিল। সোমবার ভেবেছিল সকাল সকাল বাড়ি ফিরতে পারবে। কিন্তু তাও পণ্ড হয়ে যায় এক প্রেস কনফারেন্সের দরুণ।

যিনি কনফারেন্সে বললেন তাঁর বয়স বছর পঞ্চাশ কি তারও বেশী। উনিশশো সাতচল্লিশ সালে কংগ্রেস ক্ষমতা পেলে তিনি একজন মন্ত্রী ছিলেন পশ্চিম বাংলার। তারপর কেন যে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে নিজেই এক পার্টি খুলে বসলেন তা তিনিই ভাল জানেন। গোপাল লক্ষ্য করলে ভদ্রলোক "সংগ্রাম করতে হবে" ইত্যাদি বলার সময় খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। টেবিলের ওপর হাত মুঠো করে চোখ বুঁজে

ফেলেন। ভদ্রলোকের মোদ্দাকথা: দেশে দুর্ভিক্ষ, রেফিউজি সমস্যা, বেকারী—সরকার কোনও সমাধান করতে পারছে না তাই "গণ আন্দোলন" করতে হবে। সে আন্দোলন শহরে শহরে, গাঁয়ে গাঁয়ে ইত্যাদি।

ভদ্রলোকের কথা শেষ হয়ে যাবার পরও প্রেসের লোকজন কেউ মুখ খোলে না। তাদের কয়েকজন আবার উঠি উঠি করেন। সেদিন রাজভবনে কী একটা ব্যাপার ছিল—বাস্তুহারা ত্রাণ সমিতির কোনও অনুষ্ঠান অথবা গবাদি পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণী সভার কোনও নাচ গানের আসর। কেউ কেউ ঘড়ি দেখতে সুরু করলেন। তাদের এই সম্মিলিত নীরবতা ভদ্রলোককে খুব পীড়া দিচ্ছিল বলে বোধ হল না। ঠোঁটের ফাঁকে স্বল্প একটু হাসির আভাস ফুটিয়ে তুলে বললেন, "আর এক কাপ চা হোক কেমন?" তারপর উচ্চৈঃস্বরে তাঁর এক সাকরেদকে ডেকে বললেন, "কৈ হে, একটু চা-টা ভাল করে কর।"

কর্মসূচীর বিবরণীখানা নাড়াচাড়া করতে করতে গোপাল হঠাৎ বললে, "আচ্ছা মিঃ ব্যানার্জি, এই যে বলছেন গাঁয়ে গাঁয়ে সর্বত্র আন্দোলন ছড়িয়ে দেবেন, এটা কী করে করবেন, চাষীদের ডাক দিলেই তো তারা এসে দাঁড়াবে না।" মনে মনে বললে, "আপনি তো গায়ে সামান্য আঁচড়টুকু না লাগিয়ে জেলে গিয়ে বসবেন, আর ছেলেগুলোর খুলি ফাটবে।" সে যে উত্তেজিত হয়েছে বোঝা যায়।

প্রেসের অন্যান্য লোকজন বিরক্ত হন। প্রথমত প্রশ্নটা একেবারে নিষ্প্রয়োজন। ডাক দিলে তো আসবেই না, এ তো জানা কথা। রাজনীতি করতে গেলে এ সব কথা তো বলতেই হবে। গোপাল সাধারণত কোনও প্রশ্ন করে না এসব ক্ষেত্রে। সে কেন হঠাৎ এরকম বোকার মত উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করলে, ভেবে কেউ কেউ চটে যান তার ওপর।

ভদ্রলোক মৃদু হেসে অন্যান্য সকলের দিকে তাকালেন। একবার কয়েক জনের মুখের বিরক্তিতে নিজের সমর্থন পেয়ে বললেন, "গাঁয়ে গাঁয়ে বলছি বলেই কি আর……," বাকিটা হেসে দিলেন ভদ্রলোক। কথা শেষ করার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

গোপাল দৃঢ়ভাবে বললে, "তাহলে বলছেন কেন ? যা অন্যকে করতে বলছেন তা যখন নিজেই বিশ্বাস করেন না তখন কেন বলছেন ?" তার গলার স্বর আবার কেঁপে যায়। প্রশ্ন করার সময় সাংবাদিকরা এক ধরনের নৈর্ব্যক্তিক উদাসীন আওয়াজ বার করেন গলা থেকে, ঠিক সে ধরনের আওয়াজ নেই তার গলায়।

এবার আর উড়িয়ে দিলেন না তার কথা ভদ্রলোক। বললেন, "না না, তা নয়, তা নয়। প্রথমত আন্দোলন এগোবে ধীরে ধীরে। তার জন্য শহরে আমাদের মিটিং করতে হবে, মিছিল করতে হবে। তার পর সারা দেশময় তা ছড়িয়ে পড়বে আস্তে আস্তে।"

ভদ্রলোক আবার চোখ বুঁজতে সুরু করেছিলেন। গোপাল এবার স্পষ্ট ব্যঙ্গ করলে, "আপনি কলকাতায় মিটিং করে চাষীদের ডাক দেবেন। কোথায় তাদের মধ্যে কাজ করেছেন ? ওয়ার্কারদের কথা বললেন ? কোথায় আপনাদের ইউনিয়ন ?"

চারদিকের অসন্তোষ এবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত গোপালই বক্তৃতা দিচ্ছে ভেবে বক্তৃতায় ক্লান্ত লোকগুলো ক্ষেপে যায়। অন্য কাগজের একজন প্রতিনিধি এক ছিমছাম যুবক চেঁচিয়ে বললে, "ইউ আর এ লিমিট গোপাল।" কেউ কেউ যাঁরা মনে করেন প্রশ্ন করা তাঁদের জন্মগত অধিকার তাঁরাও তাঁদের অধিকার খর্ব হচ্ছে বলে বিরূপ মন্তব্য করতে থাকেন। বয়োজ্যেষ্ঠ রবিবাবু গোপালের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, "খামাখা ক্যান্ গণ্ডগোল বাধাও দেখি। আরে চাষী মজুর চাষী মজুর তো কইতেই লাগবো। ন্যাতা হবার লগে তুমি কইবানা ?"

গোপাল বললে, "না কইব না।"

রবিবাবু হাত দুখানা নিরুপায়ের ভঙ্গীতে তুলে বললেন, "এই দেখ, তুমি আবার মহাপুরুষদের কথা কইতে লাগছ। রাজনীতিতে আবার মহাপুরুষদের টান দাও ক্যান?"

গোপাল চুপ করে যায়। সত্যিই সে তো চাকরী করতে এসেছে এখানে। তার তো আলাদা করে ভাববার দরকার নেই। যেমন ভাবে জ্বলে উঠেছিল ঠিক তেমনি ভাবে সে নিভে যায়। আর উৎসাহ থাকে না কথাবার্তায়। ভদ্রলোক বলতে থাকেন, এতদিন পর সত্যিকারের বিপ্লব স্থরু হবে। কলকাতার রাস্তায় ইতিহাস তৈরী হবে আন্দোলনের। আর সেই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়বে স্কুল কলেজে, কলকারখানায়, গাঁয়ে গাঁয়ে। গোপাল হাতের কাগজখানা পাকাতে থাকে।

দুতিন দিন পর দুপুর গড়িয়ে এলে একটি মিছিল গর্জন করতে করতে এসে থামলো লাটসাহেবের বাড়ির গেটের সামনে। একশো চুয়াল্লিশ ধারা রয়েছে একটু এগোলেই। সবার আগে মিঃ ব্যানার্জি। লাল ফেস্টুনের নীচে তাঁর ঘিয়ে রঙের পাঞ্জাবী উড়ছে।

গোপাল আজকে একটু বেশী করে সাজ করেছে। ভাল করে গোঁফ ছেঁটেছে। চুল সাবান দিয়ে পরিষ্কার করেছে। পরিধানে তার পেয়ারের নীল স্যুটটি। একদিন এই স্যুট পরে বিকেলের কোনও অনুষ্ঠানে যাবার সময় তাদের গাড়ির ড্রাইভার হঠাৎ বলেছিল, "আপনি কেন এলেন এ লাইনে? আপনাকে ঠিক মানায় না।" কিসে মানায় গোপাল জিজ্ঞাসা করায় সে তার আপাদমস্তক একনজরে দেখে বলেছিল, "এই যেমন পুলিশের একজন বড় সাহেব বিকেলে জিপ হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছে।"

আট দশটা স্টেশন-ওয়াগনে গিস্‌গিস্ করছে আর্মড পুলিশ, সামনে

তিন সারি পুলিশের কর্ডন, পেছনে মাউণ্টেড পুলিশের সারি। শ্লোগানের চীৎকারে, চারপাশে উত্তেজিত জনতার কোলাহলে ঘোড়াগুলো অসহিষ্ণু হয়ে লাগামে টান দিচ্ছে।

গোপাল ঘড়িতে দেখলে চারটে বাজে। হঠাৎ সে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। সুপ্রিয় না? পাতলা ছিপছিপে ছেলেটি, মুখটা একটু ঘোড়ার মত, তবে মাথায় টুপী আর হাল্কা বাদামী গরম কাপড়ের ইউনিফর্মে তার চেহারার বিসদৃশ ভাবখানা অনেকটা কেটে গিয়েছে। কাঁধের পাশে আঁটা রয়েছে পিতলের তিনটি চকচকে অক্ষর, আই, পি, এস্।

সুপ্রিয় এগিয়ে আসে তারই দিকে। তার নীল টাইএর মুখটা আল্‌গা করে দিয়ে হাত বাড়িয়ে বললে, "উই মীট আণ্ডার স্ট্রেঞ্জ সারকামস্ট্যানসেস্।"

গোপাল বললে, "তুমি কি ইন-চার্জ এখানকার?"

"আরও একজন আছে," সুপ্রিয় ইংরেজিতে বললে।

সিগারেট ধরাতে ধরাতে গোপাল লক্ষ্য করলে ইংরেজী বলার ঢং-টাও পাল্‌টে ফেলেছে সুপ্রিয়।

প্রথম দিকের থমথমে ভাবখানা অনেকটা কেটে গেছে। এখন শ্লোগানের চীৎকারও নির্জীব। পুলিশের সামনের সারিটা লাঠি হাতে খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে, তবু পেছনের সারিতে একটু আধটু আলাপ যে চলছে না নিজেদের মধ্যে এমন নয়। অফিসের লোকজন যারা পার্কের রেলিং ধরে এতক্ষণ শোভাযাত্রীদের উৎসাহ দিচ্ছিল তারাও একটু ঝিম্ মেরে গিয়েছে। মিছিলের দুতিনজন নেতা সরকারী দপ্তরে গেলেন প্রধানমন্ত্রীর সামনে তাঁদের দাবী পেশ করার জন্যে।

সুপ্রিয় কথা পাল্‌টে নিলে, "তোমাদের অফিসের মিঃ উইলিয়ম, সেদিন আলাপ হচ্ছিল, বেড়ে লোক।" হঠাৎ মাই-ডিয়ার ভাব করে

গোপালকে কনুই দিয়ে ঠেলে বললে, "তারপর, বিয়ে টিয়ে করেছ?"

"না।"

"দ্যাটস্ ফাইন, আমিও করিনি।"

গোপাল আগে অবাক হ'ত, এখন আর হয় না। তবে বিরক্ত হয়। মানুষ রাতারাতি বদলে যায়, এই ভেল্‌কী দেখে দেখে তার বিতৃষ্ণা নিশ্চয় জন্মায়নি, তবে এটা তার স্থির বিশ্বাস, বাংলা দেশে তিরিশ বছর পার না হলে কারুর কথাবার্তা "সিরিয়াসলী" নেওয়া উচিত না। এ ব্যাপারে অন্তত তার সহকর্মী মিঃ বসুর সঙ্গে তার মতবিরোধ কমে আসছে। বেশ কিছুদিন আগে এক উৎসব উপলক্ষে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি গিয়েছিল সে। সেখানে চাদর ঝুলিয়ে কোনও এক সভার উদ্যোক্তাদের একজন হয়ে সুপ্রিয় এসেছিল। মেজাজে, কথাবার্তায় সে চিরকাল পরম বৈষ্ণব। গোপালের মনে আছে কোনও এক প্রফেসরের বিদায়বেলায় সিল্কের রুমালে এক কবিতা এমব্রয়ডারি করে সে ভদ্রলোকের মহিমা কীর্তন করায় ছেলেদের কী ঠাট্টা! সেই ছেলে মাউণ্ট আবু-তে ট্রেনিং নিয়ে ফিরে কাঁধ ঝাঁকানো ছাড়া (কাঁধ বড় সড়িঙ্গে সুপ্রিয়র) আর সমস্ত কায়দাই আয়ত্ত করে ফেলেছে।

"তোমরা তো আবার—যা-তা-মা-তা লিখবে," সুপ্রিয় সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললে।

"যাতা মানে?"

সুপ্রিয় টাইএর গেরো আবার ঠিক করে বললে, "এই যেমন পুলিশের নিষ্ঠুরতা, জনসাধারণের প্রতিরোধ এ্যাণ্ড হোয়াট নট। এ দেশে তো আর কাগজ বলে কিছু নেই।"

পরিষ্কার আত্মতৃপ্তির গলা, যাকে বলে অফিসারের গলা। গোপাল এবার স্পষ্ট অনুভব করে, এ সুপ্রিয় তার পরিচিত সুপ্রিয় নয়, যাকে ঠাট্টা করলে রাগে তোতলামিতে জবাব দিতে পারত না। একবার

সরে আসবে কিনা গোপাল ভাবলে। কী ছুতোয় বিদায় নেবে বুঝে উঠতে পারলে না।

সুপ্রিয় হঠাৎ বললে, "তোমার যে কতকগুলো পাগলামো ছিল, সেগুলো গিয়েছে তো?"

গোপাল অবাক হয়ে বললে, "পাগলামো!"

"আরে কী সব ছাই ভস্ম লিখতে না তুমি! তখনই বলতাম কিছু হচ্ছে না। যাই কর রবীন্দ্রনাথ তো আর হতে পারবে না। অবশ্য কম বয়সে একটু আধটু পাগলামো থাকা দরকার। আমারও কি আর ছিল না?"

ফেস্টুনের মাথাগুলো চঞ্চল হয়ে উঠেছে। গুঞ্জন উঠছে সামনের দিক থেকে। গোপাল বললে, "নেতারা ফিরে এল নাকি?"

সুপ্রিয় একবার সেদিকে তাকিয়ে বললে, "হ্যাঁ তাইতো মনে হচ্ছে।" পিঠটান করে দাঁড়িয়ে বললে, "আচ্ছা চলি। তামাসা জমবে মনে হচ্ছে।"

শ্লোগানের আওয়াজ আরও জোরালো হয়ে ওঠে। নেতারা মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। কিন্তু কোনও ফল হয়নি।

সামনের দিকে চাপ বাড়তে থাকে। মিঃ ব্যানার্জি ডান হাতখানা শূন্যে তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন, "আমরা এগিয়ে যাব, আমরা এগিয়ে যাব।" গোপাল লক্ষ্য করলে, তিনি চোখ বুঁজে ফেলেছেন উত্তেজনায়।

ক্রমশঃ গোলমাল বাড়তে থাকে। কার্জন পার্কের রেলিং ধরে অফিস ফেরতা বিস্তর লোক দাঁড়িয়ে যায় এবং চীৎকার করে শোভাযাত্রীদের উৎসাহ দিতে থাকে। শোভাযাত্রীদের ঠিক সামনের চাঙড়টা একেবারে আছড়ে পড়ে পুলিশ কর্ডনের ওপর। স্টীল হেলমেট পরে যে দুসারি পুলিশ লাঠি কাত করে আটক করেছিল রাস্তা, তারা এ চাপ সহ্য করতে না পেরে হটতে থাকে। মনে হয় মুহূর্তে কর্ডন ভেঙে

যাবে। সিপাই আর সার্জেন্টদের বুটের ফাঁক দিয়ে মিছিলের কেউ কেউ মাথা বাড়িয়ে দেয়। তাদের চোখ জ্বলছে, মুখ লাল হয়ে গিয়েছে পরিশ্রমে, গলার শিরা ফুলে উঠেছে চীৎকারে।

দু-তিন জন পুলিশ অফিসার কর্ডনের একটু তফাতে নিজেদের মধ্যে কী পরামর্শ করে। তারপর কয়েকজন সার্জেন্ট নিয়ে এগিয়ে গিয়ে একটা ছোট্ট ব্যূহ রচনা করে নেতাদের কেন্দ্র করে। ক্রমশঃ তাদের আলাদা করে ফেলে। গোপাল লক্ষ্য করলে নেতারা বিশেষ প্রতিরোধ করলেন না। মিঃ ব্যানার্জির মটকার চাদরে এক জনের হাত পড়েছিল। তিনি তা ছিনিয়ে নিয়ে নিজেই অদূরে দাঁড়ানো প্রিজন-ভ্যানের দিকে অগ্রসর হলেন। নেতাদের তুলে নিতেই প্রিজন-ভ্যান স্টার্ট দিল।

এবার উত্তাল হয়ে উঠলো গোলমাল। কর্ডন ভাঙ্গার জন্যে ধ্বস্তা-ধ্বস্তি চলতে থাকে। হুইসিলের তীব্র আওয়াজ পাওয়া গেল। একটা গাড়ীতে বসানো মাইক্রোফোন থেকে পুলিশের আদেশ এল মিছিল হটাবার জন্যে। মিনিট দু-এক পরেই গাড়ীর পাশ থেকে গ্যাস শেল ছুঁড়তে আরম্ভ করলে গুর্খা পুলিশ। লাঠি চার্জ সুরু হল।

প্রকাণ্ড হুলস্থুল, ধোঁয়া, চীৎকার, আক্রমণ করার সময় সিপাইদের অশ্রাব্য খিস্তি। সামনের বিশগজ প্রায় ফাঁকা হয়ে যায়। গোপালের চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে। বাতাস উল্টো দিকে থাকায় টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়া পেছনের দিকে ঘুরে আসে। গোপাল এক নজরে দেখলে চার পাঁচটা ছেলে এদিক ওদিকে পড়ে আছে মুখ থুবড়ে। তার মধ্যে থেকে হঠাৎ একটি ছেলে টলতে টলতে দাঁড়িয়ে ওঠে। প্রায় বিভৎস দৃশ্য। রক্তে ছেলেটির মুখচোখ ভিজে গিয়েছে। পুলিশের পায়ের চাপে তার ধুতির অর্ধেকের বেশী রাস্তায় গড়াচ্ছে। ছেলেটি এক হাত দিয়ে মাথা চেপে আর এক হাতে কাপড়ের এক কোনা ধরে

লজ্জা নিবারণ করার বৃথা চেষ্টা করে আছড়ে পড়লো রাস্তার এক কোনায়। সেখানে আবার তাকে পিটানো হতে থাকে।

স্থপ্রিয়কে দেখা যায়। মাঝে মাঝে হাতে তালি দিয়ে অর্ডার দিচ্ছে আবার চকিতে মিলিয়ে যাচ্ছে। জলে ভেজা রুমাল চোখে ঘষতে ঘষতে গোপাল আর সকলের সঙ্গে পেছনে হটে আসে। গ্যাসের প্রথম শেলটা এত আচম্বিতে তার কাছে এসে পড়েছিল যে প্রায় অনেকখানি নিঃশ্বাসের সঙ্গে তার ভেতরে গিয়েছে, মাথা ধরে উঠেছে বেশ। চোখ টকটকে লাল।

সঙ্গীদের নিয়ে গোপাল একটু ঘুরে চৌরঙ্গীতে এসে পড়ে। তার একটু চা খাওয়া দরকার। কিন্তু চৌরঙ্গীতেও ছত্রাকার ব্যাপার। যে প্রতীক্ষমাণ জনতা পার্কের ভেতরে ছিল তাদের সঙ্গে ঘোড়সওয়ারদের প্রায় খণ্ডযুদ্ধ চলছে। লোক ছুটছে ট্রাম বাসের স্টপেজ থেকে। মাঝে মাঝে লক্ষ্যভ্রষ্ট ঢিল এদিক ওদিক ছুটছে। দু-রাউণ্ড ফায়ারিংএর আওয়াজ শোনা গেল।

একটা সিনেমা হলের পাশের গলি ধরে ঘোড়সওয়াররা তাড়া করেছে জনতাকে। রেস্তোরাঁয় চায়ের কাপে মুখ লাগিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে আসছে কেউ। ইউনিফর্ম আর শাদা পোষাকের পুলিশ এবং একটু দূরেই দাঁড়ানো জনতায় থৈ থৈ করছে চৌরঙ্গী।

সন্ধের এসপ্ল্যানেডে অকস্মাৎ একটি অচেনা আলোয় গোপাল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। পুলিশের মোটর বাইক পুড়ছে। পেট্রোল-ট্যাঙ্ক ফাটবার শব্দ হল। ধোঁয়া উড়তে থাকে ফুলে ফুলে।

একটী উৎসাহী ভাবপ্রবণ কমবয়সী রিপোর্টার একটু চেঁচিয়ে বললে, "দেখুন, একেবারে রেভ্যুলিউশানের মত মনে হচ্ছে। ঠিক ফ্রেঞ্চ রেভ্যুলিউশানে প্যারিসের রাস্তা।"

"তাহলে মারি আন্তনিয়েৎ কোনটা? এইটা নাকি," গোপাল

চমকিয়ে পাশ ফিরে তাকালো। সুপ্রিয় দু-তিনজন সার্জেণ্ট নিয়ে একেবারে তাদের পাশে নাক কুঁচকিয়ে হাসতে হাসতে তার ছোট লাঠি দিয়ে ফুটপাথের একপাশে এক ভিখারিণীকে দেখাচ্ছে।

গোপাল ভিড় ঠেলে রেস্তোরাঁয় ঢুকলো। কমবয়সী রিপোর্টারটি রেভ্যুলিউশান রেভ্যুলিউশান করে চেঁচাতে থাকে। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে, "উঃ কী মারটাই না দিলে। কী অমানুষিকভাবে······"

গোপালের আর একদিকে বসেছিল ছিম্‌ছাম্ তরুণটি। সে বললে, "অমানুষিক টমানুষিক বলছেন কেন? একশো চুয়াল্লিশ ভাঙবে, আইন অমান্য করবে তার কোনও ফল পাবে না? কী আবদার!"

আর একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন, যিনি নিজে একদা ইংরেজ শাসনের আমলে আইন অমান্য করার দরুণ জেল খেটেছিলেন, "এ এক ছেলেমানুষী আরম্ভ হয়েছে। আজ রেফিউজি, কাল দুর্ভিক্ষ। একটা না একটা গোলমাল বাধবেই।"

গোপাল কোনও কথা বলেনা। তার সঙ্গীরা ক্রমে ক্রমে দেশের ভবিষ্যৎ, নেহেরু ইত্যাদি আলোচনা সুরু করে দিলে। কেউ উত্তেজিত-ভাবে কেউ বা ব্যঙ্গ করে, কেউ প্রমাণ করতে থাকে সে যে ভাবে দেশের কথা ভাবছে তা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনও পথ নেই।

গোপাল জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকে। পশ্চিমদিকে গঙ্গার ধার লাল হয়ে আছে। কার্জন পার্কের মাঝখানে অন্ধকার, ধোঁয়া, কোথাও পথিকদের চীৎকার। গোপাল একবার মাথা তুলে তার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে ভাবলে এখানে যখন আবার স্বাভাবিক জীবন যাত্রা সুরু হবে, সন্ধে হতেই সিনেমা হলের আলোর মালার নীচে লোকের ভীড় জমবে, কেনাকাটা সুরু হবে দোকানে, তখন কজনা এ পথে হাঁটতে হাঁটতে আজকের ভাবনার জের টেনে চলবে?

একটা থমথমে ভাব নিয়ে গোপাল অফিসে ঢোকে। ঠাণ্ডা

ছোটোখাটো একটা রিপোর্ট পেশ করে সে। এমন কি ম্যাকমোহনও বললে "করেছ কী? আর সমস্ত কাগজ কালকে......"

গোপাল নির্লিপ্ত ভাবে বললে, "করুক"।

না, একটা জ্বালাময়ী কিছু লিখলে সব উলটে পাল্‌টে যাবে একথা তার মনে একেবারেই সাড়া দেয় না।

পরদিন সন্ধেবেলা এসপ্ল্যানেড দিয়ে হাঁটছিল সে। আবার সেই রঙ, আলো। একটা নেড়ীকুত্তার বাচ্চা নিয়ে একজন এগিয়ে এল, "খাস বিলাতি স্থর, নিয়ে যান।" ভিড় ঠেলে এগোতে থাকে গোপাল।

কার্জন পার্কে লোক কম। ফুলগাছের তলায় একফালি আলোর নীচে কয়েকটা লোক গভীর মনযোগ দিয়ে চটি কয়েকখানা বইএর পাতা ওলটাচ্ছে। গোপাল আড়চোখে দেখলে—রেসের টিপ। যে জায়গাটা ঘুগনিদানা আর কাটা ফলের আড্ডা সেখানে লোকের ভিড় একটু বেশী বলে মনে হল। গোপাল থম্‌কে দাঁড়ায়। একটা কিম্ভূত-কিমাকার মানুষ, গা খালি এই শীতেও, একটা ফেট্টি কোমরে জড়ানো। রাস্তার মোড়ে ইলেকট্রিক বক্সের মাথায় সে উঠেছে। বোধ হয় পাগল। এক হাতে খঞ্জনী বাজাচ্ছে আর গাইছে। গান ঠিক না, গালাগাল। লোকটা ভগবানকে গাল দিচ্ছে, থুথু ছিটোচ্ছে আকাশের দিকে, কর্কশ গলায় গাল দিচ্ছে নেতাদের যারা দেশকে ভাগ করেছে। গোপাল চারদিক চেয়ে দেখলে, দারোয়ান, গাড়োয়ান, আইসক্রীম ভেণ্ডার, প্লাম্বার সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে শুন্‌ছে তার কথা। লোকটার চোখের মণি ঠিক্‌রে বেরিয়ে আস্‌ছে। আকাশে থুতু ছিটিয়ে ভগবানকে চ্যালেঞ্জ করছে সে।

কলকাতায় মাঘে শীত পড়ে যায়। একেবারে না পড়লেও হাওয়ায় যে বেঁধা ভাবটা ছিল কদিন হল তা নেই। যে জায়গায় কাল লাঠিচার্জ

হয়েছিল, চাপ চাপ কালো রক্ত জমেছিল, আজ সেখানে জুতো পালিশ হচ্ছে।

গোপাল কী মনে করে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়লো। তার জুতোয় বুরুশ ঘষতে ঘষতে ছেলেটা তার দিকে এক নজরে দেখে বললে "পেট্রোল দেব? তাহলে দু আনা।"

"তাই দে"।

জুতো পালিশ হলে গোপাল ধর্মতলা ষ্ট্রীট দিয়ে হাঁটতে থাকে। কয়েকদিনের একটানা ছুটোছুটির পর আজ সন্ধেটা একলা হাঁটতে বেশ লাগে। দেশ স্বাধীন হবার পর এদেশের সাহেবি দোকানগুলো তাদের ভোল পালটেছে। কাঁচের ভেতর দিকে সেলুলয়েডের মহিলারা টিস্যু আর জর্জেটের শাড়ী পরে পথচারীদের হাতছানি দিচ্ছে। অবশ্য বেশীর ভাগ যে যে জিনিষপত্র দিয়ে এইসব মহিলারা তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা পালন করেন, যেমন জুতো, ক্রীম, টি-পট, তার একটিও এদেশী নয়। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে বিদেশী জিনিষের চলন আরও বেড়ে গেছে। ইংরেজ নেই, তাই স্বদেশী জিনিষ কেনার মাথাব্যথাও কারুর নেই।

হঠাৎ গোপাল থমকে দাঁড়ায় দোকানের একটা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে। সাড়ে সাতটা বাজে ঘড়ির কাঁটায়। প্যাণ্টের পকেট থেকে একটা হল্‌দে চিরকুট বার করে সে পড়বার চেষ্টা করে। তারপর দৌড়ে গিয়ে দক্ষিণ দিকে যাবার এক চলন্ত বাসে উঠে পড়ে।

সতেরো

নয়ন লক্ষ্য করলে অন্তু ঝুঁকে পড়ে সারা সকালদুপুর কী লিখছে। বারবার অভিধান ঘাঁটছে আর জানালার বাইরে আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। সেদিন অফিসে না গিয়ে এই করেই কাটালে।

বিকেল হলে একতাড়া ক্রশওয়ার্ড পাজ্‌লের কুপন, কয়েকখানা লম্বা লম্বা খাম নিয়ে পোস্টঅফিসের দিকে গেল বলে মনে হল। কিছুক্ষণ পর ঘর ঝাড়তে গিয়ে একটু অবাক হল নয়ন। বোধ হয় তারই ভুল হয়েছে ভাবলে। নইলে দেয়ালের এককোনে অন্তুর বইয়ের বাণ্ডিলটা গেল কোথায়? নয়ন আতিপাতি করেও খুঁজে পেলে না বইগুলো। অন্তুর কলেজের বই। মেজাজ ভাল থাকলে সে প্রায়ই বলতো, "তুমি অত ভাবছ কেন মা, একটু সামলে নিই তারপর পরীক্ষাটা দিয়ে দেব।" ইদানিং অবশ্য সে কোন কথা তোলেনি। কিন্তু পরীক্ষা দিক বা না দিক এই ন্যাকড়া আর কাগজে শোয়া ঘরখানায় নয়নের এতদিনকার সান্ত্বনা ছিল বই কখানা। সে ইংরেজী ভাল বুঝত না। কিন্তু দিনে দুবার করে ঝেড়ে পরিপাটি করে রাখতো বইগুলো।

অন্তু ফিরতেই নয়ন বললে, "হ্যাঁরে অন্তু, বইগুলো কোথায় গেল?"

অন্তু চম্‌কে ওঠে। এদিক ওদিক তাকিয়ে বললে, "কোথাও আছে নিশ্চয়?"

"কাউকে দিয়েছিস্?"

অন্তুর মুখের চেহারা পালটে যায়। বিদ্রূপ করে বলে, "কেন, তুমি পড়বে নাকি? বইগুলো রেখে কী লাভ! আবর্জনা হয়েছিল বিক্রি করে দিয়েছি।"

নয়ন চেঁচিয়ে উঠলো, "বিক্রি করে দিলি? শেষ পর্যন্ত বিক্রি করে দিলি বইগুলো?"

"কী করব, পুজো করব? তার চেয়ে যদি ওটা সৎকাজে লাগে তারই তো ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে।"

নয়ন ভাবলে অন্তু কি শেষ পর্যন্ত এতবড় পাগল হবে যে তার পরীক্ষার বইগুলো বিক্রি করবে ক্রশওয়ার্ড পাজ্‌লের টাকার জন্যে?

অন্তু তার মার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে অকপটে বললে, "তুমি

যা ভাবছ তাই ঠিক মা। বইগুলো বিক্রি করে পঞ্চাশ টাকা পেলাম। আরও পঞ্চাশ টাকা ধার করেছি কুপন কেনার জন্যে।"

নয়নের আবার সব ওলোটপালোট হয়ে যায়। কীভাবে ধীর স্থির হয়ে কথা বলবে ভেবে ছটফট করে। আবার ধীর হয়ে থেকে এরকম চরম পাগলামির কাছে আত্মসমর্পণ করবে কী করে? ছেলে বলে? একটা পঙ্গু দুর্বল মানুষের দুর্বলতা মেনে নেবে মাত্র এই কারণে, যে সেই মানুষটাকে তার পেটে ধরেছে?

অন্তু বললে, "তুমি বুঝবেনা মা। কোনও দিন চেননি টাকা কাকে বলে। আজও চেননা। তা না হয় তুমি না-ই চিনলে। কিন্তু টাকা ছাড়া মানুষের সুখ আনন্দ বল, কিছুই নেই। এই যেমন তুমি, তুমি তো আমায় ভালবাস না। তার কারণ তোমায় অন্য মায়েদের মত রাখতে পারিনা বলে।"

অন্তুর বাবা একথাই বলেছিল। প্রায় এক ভাষা, "তোমায় যদি শাড়ী দিতে পারতাম, গয়না দিতে পারতাম, তাহলে তোমার ভাব হত অন্য রকম", তারপর থেকে গয়না কেন রঙীন শাড়ী পরাও ছেড়ে দিয়েছিল সে।

অন্তু বেরুবার জন্যে গায়ে শার্ট চড়াতে চড়াতে নরম ভাবে বললে, "এতগুলো পাঠিয়েছি, একটা না একটা লাগবেই। একটা ভুল হলেও হাজার দু-তিনেক টাকা। তখন আর সব মায়েদের মত পায়ের ওপর পা দিয়ে······"

নয়ন আর শুনতে পারছিল না। উনুনের পাশে গিয়ে মাথা নীচু করে বললে, "তুই কখন ফিরবি?"

"তুমি খেয়ে নিও, আমি ওপাড়া যাব, রাত হবে ফিরতে," অন্তু চৌকাঠ থেকে চেঁচিয়ে বলে গেল।

নয়ন অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। তার প্রিয় বৈষ্ণব কবিতার

মতই তার জীবনের অবস্থা—সাগরে ঝাঁপ দিলে সাগরও শুকায়। একবার ভাবলে সব চুকিয়ে বুকিয়ে দিয়ে আশ্রমে পড়ে থাকলেই হ'ত। আবার নতুন করে তিলে তিলে গড়ার চেষ্টা কেন? কিসের প্রয়োজন যত্নের এই প্রকাণ্ড অযত্নের রাজ্যে?

মতি এসে পড়লো। নয়ন প্রত্যেক দিনের মত আজও বললে, "পা মুছে এসো," আর মতিও প্রত্যেক বারের মত হাসতে হাসতে বলে, "কাকিমার যা রুচি। মরতে বসেও সেটি ছাড়ছেন না।"

ঘরে পা দিয়েই সে সুরু করে দিলে বাপ মা ভাইয়ের কেচ্ছা। ভায়ের চাকরি নেই কিন্তু আবার পাশের বাড়ীর মেয়ের সঙ্গে "পেরেম" করে বিয়ে করে ছেলের বাপ হয়েছে। এদিকে টাকা রোজগারের নামটি নেই।

নয়ন বলে, "রোজই তো বল মতি, আজ না হয় অন্য কথা বল।"

মতি অপ্রস্তুত হয়ে বললে, "কী বলব কাকিমা, কী আর বলবার আছে? শালাদের জন্যে পড়েছি দেনার দায়ে। নইলে কাকিমা কবে এই পোড়ার সংসার ছেড়ে দিতাম। আপনি আবার ফিরে এলেন কেন?"

নয়ন হেসে বললে, "আমি? তোমাদের জন্যে।"

মতি তার আড়ষ্ট ভাব কাটিয়ে বললে, "আমরা হলাম গিয়ে কাদা কাকিমা, আমাদের জন্যে ফিরে আসবেন কেন? এই দেখুন ভাইটা, কত কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করে বিয়ে করলে, আর বছর না ঘুরতেই বউকে কিল, চড়, ঘুসি। জন্তু, সব জন্তু।"

নয়নের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মাথা নীচু করে বলে, "আমার এক এক সময় মনে হয় কাকিমা, আপনার একটা কিছু বড় হবার ইচ্ছে ছিল বোধ হয়। আমি বুঝি, মুখ্যু হলেও বুঝি।"

নয়ন অপ্রস্তুত হয়ে বললে, "দূর বোকা।"

"আচ্ছা গোপালদা আর আসেনি, না ?"

"কদিন আসেনি।"

"আপনি এখানে আসার পর থেকে বোধ হয় আসেনি ?"

"না।"

মতি ইতস্তত করে বললে, "একটা কথা বলি কাকিমা, কিছু মনে করবেন না। অন্তু যা বলে তাই ঠিক। বড়লোকদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে আমাদের কী লাভ ? আমরা কাদার লোক, কাদাতেই থাকি।"

নয়ন বললে, "আজ সন্ধেটা অন্তত তুই কারুর সম্বন্ধে ভাল কথা বল মতি। তুই যাদের ছোটলোক বলছিস্ তাদের ভেতর থেকেই একজনের কথা বল যাকে তুই ভালবাসিস্।"

শান্ত ভাবে বললেও নয়নের কথায় ধার ছিল। সে লক্ষ্য করেছে মতি অন্তুর কাছে বড়লোক কথাটা অছিলা। নইলে বড়লোক, গরীব-লোক, সবলোক বাদ দিয়ে শুধু নিজের লোকে, নিজের নিজের চোরা কুঠুরিতে বাস করা, এটাই শেষ পর্যন্ত তাদের একমাত্র কথায় দাঁড়ায়।

মতি রেগে উঠে বললে, "ভালবাসিনা, তবে কি মিথ্যে কথা বলব ?"

অনেকক্ষণ সে চলে গেছে। পাশের বাড়ীর গান সুরু হয়নি। তবে কাছেপিঠে কোনও দোকানে রেডিওতে সেতার বাজছে। ঠিক অন্তুর মতই গোপালকে বড়লোকদের দলে ফেলে খারিজ করে দিতে চায় মতি। ভবানীপুরে যখন নয়নের বাপের বাড়ী ছিল তখন নিশ্চয় মতি অন্তুর ভাষায় তারা বড়লোকদের দলে পড়তো। তারপর বাড়ী বিক্রি হয়ে যাবার পর থেকে নিশ্চয় তারা সাধারণ লোকদের পর্যায়ে এসে পড়েছে। নয়নের কিন্তু এই দুটো জীবনের মধ্যে একটাই পার্থক্য নজরে পড়ে—এখন তাদের দৈনিক রেশনের কথা ভাবতে হয়, আগে ভাবতে

হত না। কিন্তু এ পার্থক্য কি এতই আশমান-জমীন যে এক সম্প্রদায় থেকে আর এক সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে ফেলা যায়?

নয়ন এতখানি জোর দিয়ে কথাটা ভাবছিল আর কোনও কারণে নয়, গোপালের প্রসঙ্গে কথাটা উঠেছে বলেই। গোপাল সম্বন্ধে কি আর কিছু দেখবার নেই, বিচার করবার নেই, যেহেতু তাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অতএব তার চিন্তার কোনও দায়িত্ব থাকবে না, তার মানুষের প্রতি আকর্ষণ দাঁড়াবে খেয়ালের পর্যায়ে?

তবে কথাটা কী একেবারেই মিথ্যে? নয়ন নিজেই চমকে যায় নিজের প্রশ্নে। কৈ গোপাল তো একবারও দেখা করল না এসে। লোকে কি সব সময় হিসেব করে চলবে, এমন কি গোপালও? যেহেতু তার কাছে আসতে গেলে আরও সময়ের দরকার সেজন্যে আর পাঁচটা জিনিষের মত তাকে ছেঁটে বাদ দিয়ে ফেলবে গোপাল?

সারা বিকেল মাথা ঝিমঝিম করে তার। সন্ধের পরও তা কমে না। একবার ভাবলে সে তো নিজে কিছু বোঝে না অফিসের কাজের ব্যাপার। হয়তো বেশী চাপ পড়েছে, আসতে পারছে না। কিন্তু সায় দেয় না মন। যে একশো পাঁচ ডিগ্রি রোদে পুড়তে পুড়তে এসে তার দরজায় টোকা মেরেছে সে মাত্র কাজের চাপে পিছিয়ে যাবে ভাবতে নিশ্চয় মন সায় দেয় না। তাহলে হয়তো গোপালের এটা খেয়াল। ঠিক অন্তু মতি যা বলে সেই বড়মানুষী খেয়াল না, কিন্তু যাকে বলা যেতে পারে এক ধরনের বৈচিত্র্য-প্রীতি। গোপালের সামনে সারা জগৎ দাঁড়িয়ে। সে তো আর জেগে ওঠেনি চল্লিশ বছর বয়সে।

একবার ভাবলে অভিমান করবে। অন্তত বছর দশেক আগে স্বাভাবিক ভাবেই অভিমান আসতো। কী দরকার ছিল এই একবার জেগে উঠে আবার অসাড় হয়ে পড়ার? কিন্তু এ ধরনের চিন্তা এখন সস্তা মনে হয় তার। তা ছাড়া গোপাল তো তাকে কোনও দাসখৎ

লিখে দেয়নি যে আজীবন তার সঙ্গে থাকবে। রান্নাঘর থেকে উঠে গিয়ে মুখে চোখে জল দিলে নয়ন। এতক্ষণ ধোঁয়া ছিল চারপাশটা, এমন কি বাড়ির বাইরে অনেক দূর পর্যন্ত। এখন আকাশ বেশ পরিষ্কার। অন্ধকারে সিঁড়ির হাতলে মাথা রেখে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

কোথায় একটা গাড়ী থামার শব্দ হল। কাছেই কোথাও ব্রেক কষেছে। পাড়ার কতকগুলো ছেলেদের গলার আওয়াজ ভেসে আসে।

হঠাৎ কাছে পায়ের শব্দ আসে। "কি ভাবছ মন"? কার গলার আওয়াজ আর উষ্ণ নিঃশ্বাস তার ঘাড়ে এসে পড়লো। পাশ ফিরতেই নয়ন গোপালকে দেখতে পায়। তার চুল উড়ছে, চোখ উজ্জ্বল, হাত বাড়িয়ে আছে তার দিকে। নয়নের মুখ দিয়ে কথা সরে না। এতদিন সে গোপালের সামনে অস্থিরতার নিন্দে করেছে। গোপাল মুহূর্তের জন্যে কোনও দুর্বলতা দেখালে সে তাকে তীক্ষ্ণ কথায় আঘাত করেছে। কেন করেছে, আজ সে ভেবে পায় না। অথচ একটা ছোট্ট মেয়ের মত গোপালের বুকে আছড়ে পড়তেও তার খারাপ লাগে। সে উত্তেজনায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকে। গোপাল দু হাত বাড়িয়ে তাকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নেয়।

নয়ন অবশ্য চট করে সামলে নেয় নিজেকে। যে প্রশান্তি তার সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়ছিল তা থেকে নিজেকে ছিঁড়ে সরিয়ে নিয়ে বললে, "ছিঃ ছিঃ, একটা বুড়িকে ওরকম আদর করতে হয় নাকি?" তার কথা কান্নার মত শোনায়। গোপালের হাত ধরে বললে, "বাইরে কেন, ঘরে আয়।"

ঘরে আলো জ্বলে না। অন্ধকারে দুটো লোক পরস্পরকে আলিঙ্গনে বেঁধে বসে থাকে। নয়নের মনে হয় ছেলেবেলায় পরম নির্ভয়ে আনন্দে সে যেমন বাপের বুকে মুখ লুকাতো তেমনি কোনও বুকে সে মাথা রেখেছে। গোপাল হাত দিয়ে যেন পড়তে চেষ্টা করে

নয়নের গালের রেখাগুলো। এ ক'দিনেই যেন আরও শুকিয়ে গিয়েছে সে। অন্যদিন দেখা হতেই দুজনে কথার তুফান তোলে আজ দুজনেই নিস্তব্ধ।

নয়ন হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। সিঁড়িতে মনে হল কার পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। উঠে হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপলে নয়ন। তার চুলগুলো অবিন্যস্ত ভাবে কানের পাশে উড়তে থাকে।

গোপাল বললে, "আমি জচ্চুরি করতে পারব না মন, সবার সামনেই তোমায় আদর করব।"

নয়ন হেসে বলে, "তুই কি মহাভারতের যুগের মানুষ নাকি, যা বলবি তাই করবি ?"

পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোক অফিস থেকে ফিরলেন।

নয়ন যেন নিজেকেই ধমক দিয়ে বললে, "আর না, এভাবে অস্থির হওয়া চলবে না।"

"কেন, ভয় করে ?"

"না না, ভয় না, আমার মনের মত যদি রাজত্ব পেতাম তাহলে তোকে তার রাজা বানাতাম নিশ্চয়। কিন্তু তা তো হয় না। কী করে হবে ?"

"কেন হয় না ?"

"তার কারণ, আমার দুই ছেলে আছে। তারা আমায় মা না বললেও তাদের তো আমি ভুলতে পারি না। তাছাড়া আমার বয়েস আর তুই······মনে কর এমন দিন তো আসবেই যখন এত দেখা হবে না আমাদের মধ্যে। তখন যেন ভেঙ্গে না পড়ি।"

গোপাল নয়নের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বললে, "কিন্তু যদি কেউ তোমায় তার সব দিয়ে, তোমার সব কিছু মেনে নিয়েই তোমায় চায়, তুমি তাকে ঠেলবে কী করে।"

"তা সম্ভব না। তাছাড়া আমি তার যোগ্য নই।"

গোপাল এক আবেশের ঘোরে বলতে থাকে, "তুমি আগেও বিয়ের কথা বলেছ। যদি দুটো স্ত্রী পুরুষের মিলনই হয় বিয়ের আসল উদ্দেশ্য তাহলে তুমি আমার বউ। তাছাড়া আমার একটা বউতে হবে না। যেমন আমার একটা বন্ধুতে চলে না, তেমনি আমার অনেক বউ দরকার।"

নয়ন হেসে বললে, "কটা, একশোটা? আমি তাহলে কোথায় যাব?"

"তুমি পাটরাণী হবে।"

নয়ন এবার চেঁচিয়ে হেসে উঠলো। "তার চেয়ে আমায় তোর মাঠরাণী কর। তোর সঙ্গে মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াব, সেই ভাল।"

গোপাল মুখ গম্ভীর করে বললে, "তুমি হাসছ, কিন্তু বিয়েটা যেখানে হিসেব তাকে আমি ঘেন্না করি। লোকে আমায় যা মুখে আসে বলুক, আমার দ্বারা সে রকম বিয়ে হবে না। আর যদিবা করি তাহলে কে একজন বলেছে না কোথায়—যখন আর কিছু ভাববার নেই করবার নেই তখনই বিয়ে—ঠিক তেমনি ভাবে বিয়ে করব।"

"তোর কথা যখন শুনি তখন মনে হয় সব সম্ভব, সব কিছু করা যায় যদি মানুষের ইচ্ছে থাকে। আগে ভাবতাম আমার চাওয়াটাই বুঝি অস্বাভাবিক। কিন্তু তোর মত এ রকম পাগল হয়ে কোনও দিন চাইনি।"

গলা নামিয়ে বললে, "তার মানে তোর সব কথাই যে ঠিক তা বলছি না। যেমন তুই আমায় তোর বউ বানিয়ে দিলি। সেটা তোর খেয়াল। আমি তো আর সেইমত তোর কাছ থেকে দাবী করব না।"

গোপাল অস্থির ভাবে বললে, "বল, আজকেই একটা ঘর নিচ্ছি।"

"ঘর নিচ্ছি!" নয়ন চমকে উঠলো। তার মাথা ঘুরে যায় হঠাৎ। একবার ভাবল কথাটা একটু বেশী কানে লেগেছে। নিশ্চয় অত ভেবে বলেনি গোপাল। কিন্তু নিজেকে সে রাখতে পারলে না। ঠোঁট কাঁপতে থাকে তার। চাপা গলায় বললে, "কি বললি, আমার জন্যে একটা ঘর নিবি? যখন খুশী"……নয়ন কথা বলতে পারে না, দম বন্ধ হয়ে আসে তার। মাথা নীচু করে বললে, "আমার সামনে থেকে চলে যা গোপাল," একেবারে অচেনা লাগে তার গলার আওয়াজ।

কী কথায় কী হয়ে যায়, গোপাল প্রথমে বুঝতে পারেনি। বুঝতে পারে নয়নের মুখ চোখ দেখে। আড়ষ্ট ভাবে বললে, "মন, একটা কথা ধরে আমায় ফিরিয়ে দিচ্ছ?"

নয়ন তাকায় গোপালের দিকে। তার ঝকঝকে মুখের ভাব খানা কোথায় উড়ে গিয়েছে। সেই মুখখানার দিকে চেয়ে হঠাৎ নয়ন তার দিকে তার হাত বাড়িয়ে দেয়। আস্তে বলে, "আমায় মাপ কর গোপাল।"

গোপালের স্তম্ভিত মুখে আবার রক্ত সঞ্চালিত হয়। ধীরে ধীরে বলে, "কথা বড্ড পাজী, মন। আমরা ভাবি কথা দিয়ে সব বলতে পারি। কিন্তু কিছু পারি না।"

নয়ন ছাড়লে না। বললে, "বল মাপ করেছিস্!"

গোপাল নয়নের চুলের গোছা টানতে টানতে বললে, "করেছি করেছি, কিন্তু এবার উঠি। দশটা বাজে।"

"দশটা, এরই মধ্যে!" নয়ন আশ্চর্য হয়ে বললে।

গোপাল ভাবছিল আরও লোকের মাঝখানে আরও খোলা জায়গায় যদি নয়নকে আনা যেত! শুধু আজকে না, কয়েক দিন থেকেই। একটা ছোট্ট ঘরের চৌহদ্দীর শাসনের ভেতর তাকে বাঁধতে গেলেই নয়ন ছোট হয়ে যাবে, তাকে কী করে আরও লোকজনের মাঝখানে,

আরও কাজের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে আরও ছড়িয়ে দেওয়া যায় ভাবতে ভাবতে গোপাল চলে। আবার ভাবে যদি নয়নের বাইরের জগতটাই বড় হয়ে যায়, যেখানে গোপাল বলতে কেউ নেই, যেখানে হাওয়া দিলে আর একজনের কথা মনে পড়ে না, উঠতে বসতে শুতে একটা লোকের কথায় মন তোলপাড় করে না তাহলে সেই নিরালম্ব নিঃস্বার্থ বহির্জগতের দাম কী?

নয়নের কিছুদিন থেকে আর্থিক স্বাবলম্বিতা অর্জনের জন্যে প্রাণ ছটফট করছে। গোপাল তাতে উৎসাহ দিয়েছে প্রচুর। এমন কি এ নিয়ে মায়ে ছেলেতে আবার একটা নতুন বিবাদ ঘনিয়ে উঠতে পারে, এ সম্ভাবনা মেনে নিয়েও সে ঠিক করেছে এভাবে আত্মসম্মান প্রতিপদে বিক্রী করে থেঁতলিয়ে থাকা ঠিক না। কিন্তু এ নিয়ে যদি ঝড় ওঠে তাহলে সে ঝড়ের ধকল কি নয়ন সইতে পারবে? এটা আর পাঁচ জন মেয়ে যারা ট্রামে বাসে ঘুরছে, স্কুল কলেজে যাচ্ছে তাদের সম্বন্ধে উঠতে পারে না। কিন্তু নয়ন, বয়স তার চল্লিশ, দুটি বড় বড় ছেলের মা, স্বামীর দিক থেকে সে কিছু পায়নি, আবার ছেলে তাকে তার স্বাধীন বিচার বিবেচনার জন্যে সইতে না পারলেও সে ছেলে ছেড়ে থাকতে পারে না।

তাছাড়া তার মেজাজও তেমনি কাটান-ছাড়ান মেজাজ নয়। বনল না কারুর সঙ্গে, বাদ দিয়েই চললাম—এরকম ভাব নয়নের বিরোধী। তার তো সবাইকে নিয়ে সকলের সঙ্গে মিলে মিশেই চলা, অথচ সে চলতে চায় একেবারে নিজস্ব ঢং-এ।

গোপাল আঁচ করতে পারে, নয়নের বুকে আবার নতুন করে ঝড় উঠছে। যেমন ভাবে আর পাঁচ জনের মত স্বামীর কাছে আত্মসম্মান বিক্রী করে থাকতে পারেনি, তেমনি পারবে না ছেলের কাছে থাকতে। কিন্তু এবারে যে তাকে আরও দাম দিতে হবে। যে ছেলের সুখ মনে

করে সে আশ্রম ছাড়লে সেই সুখের কথা ভুলে গিয়ে সে শেলাই শিখে গান শিখে মাস্টারী করে কদ্দিন মনকে শান্ত রাখবে ?

নয়ন এজন্যেই গোপালকে এত আকর্ষণ করে। তার কাউকে ছেঁটে বাদ দিয়ে বাঁচা সম্ভব নয়, অথচ তার বাঁচার তীব্র স্বাতন্ত্র্যবোধের ভেতর দিয়ে সে চারপাশের সমস্ত লোককে বিরক্ত করে তুলছে। সে নিজেও জানে একথা। আর এ ভাবনা যখন তাকে পেয়ে বসে তখনই সে আত্মগ্লানিতে ভরে যায়। এর হাত থেকে সে বাঁচতে পারে যদি আর কেউ তার জীবনে আসে। যাকে দেখে সে আত্মসম্মানের জন্যে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু এই দাঁড়ানোর যে কয়েকটা মামুলী গৎ আছে তা তো গোপালের পক্ষে সম্ভব না। চারদিকের যা হালচাল তাতে বিয়ের ভিত্তি বাদ দিয়ে অনাত্মীয় নারীর ভাল মন্দের সঙ্গে সংযুক্ত থাকাও চলে না। অন্তত বেশী দিন না। কিন্তু সে যদি সমাজের মাথায় পা দেয়, যদি নয়নকে বিয়ে করার কথা তোলে তাহলে নয়ন সইতে পারবে না এই আশ্চর্য কথা, গোপালের জীবন নষ্ট করে ফেলল এই ভেবে কোনও কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। তাছাড়া এ ব্যাপারে সে নিজেই সম্পূর্ণ বিবেক থেকে সাড়া পাচ্ছে না। নয়নের মত সেও তো তার স্বাতন্ত্র্য নিয়ে এ সমাজে বাস করতে চায়।

কিন্তু কেন ? বিয়েটাই এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কথা হয়ে দাঁড়াবে কেন ? বিয়ে ছাড়া নয়নকে সে যদি তার জীবনের সঙ্গিনী হিসেবে আহ্বান করে তাহলে তাদের ভালবাসা কেন সস্তা, খেলো হয়ে দাঁড়াবে ?

গোপাল ভাবলে যদি সমস্ত প্রশ্নটাই এক চাপড়ে শেষ করে দেওয়া যেত, যেমন বিখ্যাত এক প্রেমের কাহিনীতে করা হয়েছে। সেই গল্পের ধারা নকল করে গোপাল বলতে পারতো, "মন, তুমি আমার জন্যে রজনীগন্ধার থালা সাজিয়ে রেখ সন্ধেবেলা, আমি না হয় গোলাপ

ফুলের ঝাড় বানাব তোমায় মনে করে, তাহলেই আমি ধন্য।" জন্ম থেকে মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত দেখেও যে মানুষের নাগাল পাওয়া যায় না, বুঝেও বোঝা যায় না, তার সামনে এক মহৎ প্রেমিক পুরুষের অভিনয় করতে গোপালের গা জ্বলে। নাটক নভেলে বেশ আলগোছে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া যায় জীবনের গভীর প্রশ্নগুলো থেকে।

গোপাল যখন অফিসে যায় তখন অতিমাত্রায় সজাগ থাকে তার চারপাশ সম্বন্ধে। কিন্তু তার নিজস্ব জগতে এলে সে আর কারুর দিকে প্রায় নজর দেয় না। অনেকক্ষণ ধরে তাকে যে কেউ ডাকছিল গোপালের সেদিকে খেয়ালই নেই। হঠাৎ কানে এলো, "এই যে সাহেব, এতক্ষণ থেকে ডাকছি। কৈ একটা সিগারেট ছাড়ো"। পাশ ফিরতেই দেখলে পানের দোকানের সামনে অন্তু।

সিগারেট দিতে দিতে গোপাল বললে, "তোর মার কাছে গিয়েছিলাম অন্তু।"

অন্তু দোকানের লোকটির দিকে তাকিয়ে বললে, "দেখলেন তো সিগারেটটা কিনতে হল না। এই সাহেবদের দৌলতেই তো আছি।"

গোপাল কি বলবে বুঝে উঠতে পারে না। আবার নতুন করে তাকে খোঁচা দেয় মা-ছেলের প্রভেদটা। একটা সিগারেট বার করে সেও ধরায়। যার মার সঙ্গে কথা বলতে গেলে ঘণ্টার পাখা গজিয়েছে মনে হয়, সে কেন বিরক্তিকর হবে—কথাটা ভেবে গোপাল নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত করে। বন্ধুত্ব চাগাবার জন্যে অন্তুর কাঁধে হাত রেখে বললে, "কদ্দিন পর দেখা হল, কেমন আছিস্ বল।"

"আমাদের আবার কেমন থাকা।" অন্তু একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে নির্বিকার ভাবে বললে, "দমদমে গিয়েছিলাম এক সাধুর ওখানে। হাইকোর্টের জজ থেকে পুলিশ অফিসার কেউ বাদ যায় নি। তুই হাত দেখাবি সেখানে?" গোপালের মুখে কোনও পরিবর্তন না দেখে বললে,

"আমায় দেখে বলেছে আত্মহনন···মানে আমরা যাকে বলি আত্মহত্যা। তুই যদি বলিস্ তোকেও একদিন নিয়ে যাব।"

"অফিস থেকে তোদের মাইনে দিয়েছে এ মাসে?"

অন্তু বিরক্ত হয়ে বললে, "অফিসের কথা ছেড়ে দে। আমরা আবার মানুষ, আমাদের আবার অফিস।" বিরক্তির সঙ্গে সঙ্গে অবসাদের সুর তার গলায় বেজে ওঠে। সিগারেটে কয়েকটা জোরে জোরে টান দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে বললে, "আমি ভাবছি কি, এত টাকা ধার তো কোনও দিনই শোধ করতে পারব না। তার চেয়ে কোর্টে গিয়ে ইন্‌সল্‌ভেন্সি ডিক্লেয়ার করি। কাগজে নাম বেরোবে, তা বেরোক।"

"তাই করনা। তারও মানে আছে, এভাবে চোরের মত লুকিয়ে কদ্দিন কাটাবি।"

অন্তু খিঁচড়ে যায়। তার মা যেমন নিষ্ঠুর ভাবে সত্যি কথা বলে, গোপালও তেমনি ভাবে বলছে। মেস থেকে পেছনের দরজা দিয়ে এত কেরামতি করে পালিয়ে এল যখন তখন সে যে টাকার দায় থেকে সাময়িক মুক্তি পেয়েছে সে কথা তার মা ঘুণাক্ষরেও বলেনি। অন্তু এবার গোপালকে পরীক্ষা করার জন্যেই বললে, "নইলে ভাবছি পাওনাদারদের বলব, আমার টাকা নেই, আমায় জেলে দাও।"

"তা বরং বাইরে চোর হয়ে থাকার চেয়ে ভাল। আর তুই তো চুরি করে জেলে যাচ্ছিস্ না। এরকম জেলে অনেক গিয়েছে।"

অন্তু জ্বলে উঠলো। সিগারেটের ডগাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, "তুই যে মার মত বক্তৃতা আরম্ভ করলি। জেলে যাওয়াটা কি চাট্টিখানি কথা? লোকে ছি ছি করবে না।"

"বাইরে থাকলে তো আরও করবে। তুই এখন রাগ করবি। কিন্তু কতবার তোকে বলেছি, নিজেকে ভাসতে দিস্‌নে। তোর শিক্ষা

আছে, বুদ্ধি আছে, আর এমন কী তোর দুঃখ যার জন্যে তুই ভেসে বেড়াবি। একটু চেষ্টা করলেই তুই ঠিক দাঁড়িয়ে যাবি।"

"দেখ, আমার সব সহ্য হয়, সহ্য হয় না খালি বক্তৃতা। তুই তো এমন ধারা ছিলি না। মার সঙ্গে মিশে তুই এ সব শিখেছিস্।" তারপর শান্ত গলায় বললে, "আমার ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না, এখনই যা, নইলে বাস পাবি না।"

বালিগঞ্জ স্টেশনে এসে সত্যিই বাস পেল না গোপাল। শীতের নির্জন রাত্তিরে পায়ে হেঁটে সে রওনা দেয় বাড়ীর দিকে।

আঠারো

সন্ধের দিকে হাওয়া দিচ্ছে। রাস্তা ঘাটে বেরিয়ে আসে অনেক লোক। গোপালের পাড়ায় ফুটপাতে প্রায় হাঁটা যায় না। গোপাল একনাগাড়ে সাতদিন পর পর নাইট ডিউটি করে উঠল। রাত্তির দুটো তিনটে জেগে পরদিন সকালে উঠতে দেরী হয়ে যায়, গা ম্যাজ ম্যাজ করে। দুপুরের দিকে একবার নয়নের কাছে যে যাওয়া যায় না তা নয়। তবে ও রকম বুড়িছোঁয়া গোছের কাজের মধ্যে সে নয়নকে ফেলতে নারাজ। কোনও তাড়াহুড়ো, কোনও বিবক্তি কিম্বা অসোয়াস্তি দিয়ে সে তাকে ছোঁবে না। তার চেয়ে যদি নাও দেখা হয় কিছুদিন হবে না।

ছুটির দিনের জন্যে গোপাল তাকিয়েছিল। গত রাত্তিরে অফিস পলিটিক্স, সেক্রেটারীয়েট, পুলিশ দপ্তর আর কর্পোরেশন ভোরের হাওয়ায় উড়িয়ে দেবার জন্যে রাস্তায় বেরোল। পার্কের ছাতিম গাছের নীচে বেঞ্চিতে বসে মাদ্রাজীরা উলের বল দিয়ে যে ব্যাডমিণ্টন ধরণের খেলাটা খেলে তাই দেখতে দেখতে সাতটা বাজিয়ে দিলে। পকেট থেকে ছুরি বের করে বাল্যকালের অভ্যাস মত গাছের গুঁড়িতে নামের আদ্য অক্ষর আর তারিখ লিখলে।

গোপাল ভেবে এসেছিল কোনরকম আজে বাজে চিন্তা না করে মনটা মুক্ত রাখবে। সারাদিন কাদা ঘাঁটতে হয়,—মধ্যবিত্ততার কাদা। আর মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলে, কাল্‌চারপিপাসী ভদ্রলোকদের সঙ্গে মেলামেশা করে, সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক সমালোচকদের সঙ্গে আলাপ করেও এ কাদা মোছে না গা থেকে। এমন জোর নেই মানুষের যে জোরে নিজে উদ্ভাসিত হয়ে অন্যকেও সে আলো দেয়। কয়েকজন মানুষ বাদ দিয়ে সে যাদের সঙ্গে মেশে তারা একেবারে পেঁচীভূত, একটু খোঁচা দিলেই ব্যক্তিগত ব্যর্থতার কাহিনী গলগল করে বলতে থাকে। আর যারা তা বলে না, ভীষণ ভাবে কাজ করে, তারা কেন এমন ভাবে কাজ করছে, এমনকি কী করছে তার কোন ধারণা নেই। যেমন প্ল্যানিং। উঠতে বসতে যেখানে যাও প্ল্যানিং। স্টীল, কাপড়, কয়লা থেকে সুরু করে মাদুর, গুড়, সমস্ত জিনিষের ওপর প্ল্যানিং। এই সরকারী বেসরকারী কত প্ল্যানিংয়ের কাহিনী দিয়ে সে যে কত কলাম খবরের কাগজ ভরিয়েছে তার ঠিক নেই। আগে এ বিষয়ে নিজের উৎসাহ ছিল। এখন মাঝে মাঝে প্ল্যানকর্তাদের বেয়াড়া বেয়াড়া প্রশ্ন করে। বেশীর ভাগ সময়ই দেখা যায় কর্তারা বেশীদূর ভাবেন নি। তাঁদের বলা হয়েছে একটা প্ল্যান করে দিতে, তাঁরা প্ল্যান করে দিয়ে চাকরী করছেন। শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়ায় তা শুধু চমক তৈরী করা। আর গোপাল মাঝে মাঝে নিজেকে ধিক্কার দেয়, জেনে শুনেও সে এই চমক পরিবেশন করছে। আর এই পরিবেশন করেই তার অন্নসংস্থান হচ্ছে।

গোপালের মনে হয়েছে, কেবল মাত্র রাজনীতির প্রশ্ন এ নয়। উনিশ শতকে ইংরেজ ছিল। প্রচণ্ড অর্থকষ্ট আর দেশজোড়া চাষীদের ওপর অত্যাচার নিগ্রহ চলেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের সামাজিক জীবন অন্তত কিছু কিছু ক্ষেত্রে মহত্ত্ব অর্জন করেছিল। কিছু কিছু

লোকজনের অনায়াস পরিশ্রম ও যত্নের দিকে তাকিয়ে বলা যেতে পারত বাংলা দেশের সামাজিক জীবন আছে। কিন্তু এ শতাব্দীতে যতই দিন যাচ্ছে ততই এক সংক্রামক বেঁড়েমি চারদিক থেকে মাথা তুল্‌ছে। আর এই বেঁড়েমি, এই মধ্যবিত্ততার মূল কথা, কোন ব্যাপারের গভীরে যাব না, আলগোছে ছুঁয়ে যাব। এই আলগোছে ছুঁয়ে যাওয়ার ভাব দেশের সর্বত্র। বিশ্ববিদ্যালয়, পৌরসভা, সরকারী দপ্তর, রাজনৈতিক পার্টি, খবরের কাগজ, সব কিছুই এই প্রকাণ্ড সংক্রামক রোগে ভুগছে।

আর এক ব্যাপার গোপালকে বড় পীড়া দেয়। উনবিংশ শতাব্দীতে যে জ্ঞানস্পৃহা ছিল তার মৃত্যু ঘটেছে, তার বদলে সমাজজীবনে এসেছে উচ্ছ্বাস—সেই উচ্ছ্বাসের ভিত্তিতে রাজনৈতিক নেতারা আসেন তিন লাখ লোকের কাঁধে চড়ে। একবারও মনে হয় না যে জনতার কর্মরহিত উচ্ছ্বাসকে আদর দিয়ে তাদের সর্বনাশের পথ তৈরী করছেন। তার ফলেই বেশীর ভাগ রাজনৈতিক পার্টি তৈরী হয় ভারতবর্ষের সর্বত্র, কোন সুস্থ কর্মপদ্ধতিকে কেন্দ্র না করে কয়েকটি নেতাকে অবলম্বন করে। "রাজা মারা গেছেন, রাজা দীর্ঘজীবী হউন" ইংরেজদের একথা এদেশে খাটে না। রাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রাজত্বের অবসান হয়।

এই সামাজিক জীবনের অসম্পূর্ণতার জন্যেই ব্যক্তির জীবনও কতখানি খর্বকায়, গোপাল ভাবে আর মনে মনে গাল পাড়ে। সম্প্রতি তার বন্ধুবান্ধব মহলে কয়েক জনের বিয়ে হল, যাকে বলে প্রেমে পড়া সেই রকম ধরণের ব্যাপারই হোল। গোপাল লক্ষ্য করে দেখলে এর মধ্যে একটাও এমন নয় যার জন্যে প্রেমিক প্রেমিকারা কোন রকম অসোয়াস্তি ভোগ করেছে। হিন্দু মুসলমান, কিংবা একশ্রেণীর ছেলে আর এক শ্রেণীর মেয়ে, অথবা বিধবা-বিবাহ এসব তো দূরের কথা,

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ঘোষে বোসে বিয়ে হোল। মেয়েগুলো আগে যেমন বিরাট অনিশ্চয়তার সামনে দাঁড়াত এখন তা না হওয়ায় বেশ হাসতে হাসতে বিয়ের পিঁড়িতে ওঠে, যেন সিনেমা হলের সীটে বসছে।

গোপাল কতকক্ষণ ছাতিম গাছের নীচে বসে সমাজ, দেশ, ইত্যাদি ভাবছিল খেয়াল নেই। খেয়াল হল কাকের দাক্ষিণ্যে। ধড়মড় করে উঠে দেখলে শার্টের কলার একেবারে গিয়েছে। সামনের মাদ্রাজী খেলোয়াড়রা বোধ হয় এতক্ষণে অফিস যাবার জন্যে দৌড়চ্ছে। গোপাল বাড়ির দিকে রওনা হোল।

পাঠক নিশ্চয় ভাবছেন, ছেলেটা এক মেয়েমানুষের সঙ্গে সন্ধে কাটাবার জন্যে মেজাজ হাল্কা করতে এসে এত ভারিক্কী ব্যাপারে হাবুডুবু খাচ্ছে কেন? নয়ন এবং তার মধ্যে এসব বাইরের কথার কী মানে থাকতে পারে? কিন্তু ঠিক এইখানেই গোপালদেব গোপালদেব। এই তার স্বভাব। কোন ব্যাপারে মাথা গলিয়ে সে আর এক ব্যাপার মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না। নয়নের কোলে শুয়ে সে মুহূর্তের জন্যেও ভাবতে পারে না জগত সংসার মিথ্যে।

দুপুরে মন আরো ছড়াবার জন্যে বাংলা দেশের ইতিহাসের ওপর বিরাট এক বই খুলে বসলে। লেখক ভূমিকায় বলেছেন, তিনি বাংলা দেশের রাজারাজড়ার উত্থান পতনের কাহিনী লিখবার চেষ্টা করেন নি। তিনি লিখেছেন, বাংলাদেশের মানুষের জীবনের কথা। গোপাল আলগোছে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে দেখলে বাংলাদেশের লোকের যে শিল্পচেতনা অত্যন্ত উচ্চস্তরের, লেখক এই কথাই বলেছেন। ভাটিয়ালী বাউল, সারি, জারি গান, পটশিল্প, কাঁথাশিল্প, মন্দিরের কারুকার্য—এই সব নিয়ে বাংলাদেশের লৌকিক জীবন ধারার ছবি এঁকেছেন। এর কোন কথাই গোপালের কাছে নতুন মনে হয় না। নতুন মনে হতে পারত যে কথাটা তার ধার কাছে ঘেঁষেননি লেখক। এ ইতিহাস পড়ে

ভাববার কোন কারণ নেই, শুধু মুগ্ধ হবার ব্যাপার। এ ইতিহাসের মোটামুটি ছক এরকম—আগে আমাদের সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা দেশ ছিল, ইংরেজ আসার দরুণ যত দুঃখ, ইংরেজ গেলেই আমাদের সব সমস্যা মিটে যাবে। আবার আমরা সারি জারি ভাটিয়ালী বাউলের দেশে ফিরে যাব। বইখানা পড়তে পড়তে গোপালের সেই গানটার কথাই মনে হচ্ছিল, "এই দেশেতে জন্মি যেন এই দেশেতে মরি" কিংবা "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।"

তাই যদি হোত, গোপাল নিজের মনেই তর্ক করে, যদি বাংলাদেশের আপামর মানুষের মধ্যে দেশ বলতে এত বড় ধারণা ছিল তাহলে কয়েকটা রাজনৈতিক নেতার স্বার্থসিদ্ধির কাছে তারা জাতীয় স্বার্থ বলি দিল কেন? কয়েকটা হিন্দু মুসলমান মোড়ল যখন এক টেবিলে বসে ঠিক করলে তাদের দেশ দুটুকরো করা হবে তখন এই ভাটিয়ালীর দেশের লোকেরা লাথি মেরে তাদের চেয়ার থেকে ফেলে দিতে পারলে না? না, বাঙালীদের শুধু আদর দিয়ে নাম কেনা যেতে পারে কিন্তু বাঙালী জীবন আঁকা যাবে না। বাঙালী জীবনের শুধু সম্পদ নয় তার ফাঁকও তুলে ধরবার জন্যে আর একবার কালীপ্রসন্ন সিংহকে এ দেশের মাটিতে জন্মাতে হবে।

দুপুর তিনটে পর্যন্ত বইখানা নাড়াচাড়া করে গোপাল ছেড়ে দিল। অসন্তোষ বিরক্তিতে নয়, তার মাথায় অন্য চিন্তা আসছিল। দেশ, সমাজের উত্থানে পতনের কথা আজ সকাল থেকে তার মন যেমন জুড়ে ছিল বিকেল পড়ে আসতেই সেই বিশাল বিষয় বস্তু থেকে অত্যন্ত ছোট অথচ তার কাছে অত্যন্ত বিশাল এক বিষয় বস্তুতে সে এসে পড়ে। মনে হয়, আরো তাড়াতাড়ি সন্ধে আসে না কেন।

বিকেলে স্নান করবার মত গরম মোটেই পড়েনি। তাহলেও গোপাল হুড়হুড় করে স্নান করলে। সকালে দাড়ি কামায়নি, তাই যত্ন

করে দাড়ি কামিয়ে গোঁফ ছাঁটলে। তারপর পাঞ্জাবী চাপিয়ে প্রায় দৌড়ে বাস ধরলে। কোন ভাব সহজেই জোরালো হয়ে তার মুখে ছায়া ফেলে। এখন তার মুখখানা এত জলজলে এত আগ্রহে ভরা দেখায় যে বাসের হ্যাণ্ডেল ধরা অবস্থায় সে যখন দাঁড়িয়েছিল তখন তার দিকে একটি মেয়ে ঘুরে ঘুরে তাকায়। বেশ লম্বাটে ধরনের দোহারা মেয়েটি, খাড়া বসার ভঙ্গী। গোপালের অন্যমনস্ক চোখের সামনে ভেসে উঠল, ঘন ভুরুর নীচে একজোড়া কালো চোখের চাউনি। এক মুহূর্তে সেদিকে তাকিয়ে নিজেকে ছিঁড়ে নেমে পড়ল সে গড়িয়াহাটার মোড়ে।

ফুটপাতে অসম্ভব ভিড়, গড়িয়াহাটার মোড়ে যেন মেলা বসেছে। রাস্তার বাঁকে বাঁকে কাগজের রংবেরং-এর ফুল নিয়ে ফেরিওয়ালারা, হাইড্রোজেন পোরা বেলুন উড়ছে ট্রামের মাথার ওপর, বাস ট্রাম থেকে কমবয়সী ছেলেমেয়েরা নামছে। অনেকের বেশ সপ্রতিভ ভঙ্গী। গোপাল দাঁড়িয়ে পড়ে। সারা সকাল দুপুর বাঙালী জীবনের সমালোচক বেশ তারিফ করা ভঙ্গীতে বাঙালীদের, বিশেষ করে বাঙালী মেয়েদের দেখতে থাকে। ঠিক এই অবস্থায় বালীগঞ্জ স্টেশন পার হয়ে অন্ধকারে ধোঁয়া আর মশার রাজ্যে যাবার কথা ভেবেই গোপালের মন হঠাৎ দমে গেল। অতদূর আর ওরকম বেহদ্দ জায়গায় বাড়ি নিতে গেল কেন নয়ন? মোড়ের বাড়িটার তেতলায় ঘরগুলো আলোয় ঝকমক্ করছে, জানলা থেকে নীল পর্দা হাওয়ায় উড়ছে। যাদবপুরের বাস এসে দাঁড়াল। কতকগুলো কর্মব্যস্ত তরুণী বোধহয় অফিস কি ইস্কুল থেকে ফিরছে। কোনদিন ভাল লাগেনা উৎসব উপলক্ষে মাইকের অত্যাচার কিন্তু আজ এই আলো আর লোকের মেলায় যখন হালকা মিঠে সুরে দোকান থেকে গীটার বাজে, ভিড় জমে, তখন গোপালের দাঁড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। দুই তরুণ তরুণী পান চিবোতে চিবোতে হাল্কা

চালে বেড়াচ্ছে। গোপালের মনে হোল, কই এরাও তো যাকে বলে প্রেম তাই করছে, কিন্তু তার ব্যাপারটা যেন দুরূহ তীর্থযাত্রার মত। সেখানে আরাম বলে কোন বস্তুই নেই। গোপাল ঘড়িতে দেখলে সাড়ে সাতটা বাজে। সেখানে পৌঁছতে আটটা বেজে যাবে। মাথা ভার লাগে। হঠাৎ তার নিজের ভাবনায় নিজেই চম্‌কে ওঠে। তার মনে পড়ল নির্জন অন্ধকার ঘরে নয়ন তার জন্যে বসে। আর সঙ্গে সঙ্গে এতক্ষণ যা ভাবছিল তা একান্ত রাবিশ বলে ঠেকে। নিজেকে বেচারী ভাবছিল একটুক্ষণ আগে, ভাবতে তার আত্মসম্মানে লাগল। উড়ন্ত বেলুনগুলোর দিকে তাকিয়ে সে ভাবলে যে জন্যে সারা সকাল থেকে সে নিজেকে তৈরী করেছে সেই মুহূর্ত উপস্থিত। গোপাল প্রায় ভিড় ঠেলে দৌড়তে থাকে। বালীগঞ্জ ষ্টেশনে এসে দেখলে এক দীর্ঘ মালগাড়ী অতি মন্থর গতিতে দুপাশের অপেক্ষমান জনতাকে ভ্রূক্ষেপ না করে একটু একটু এগোচ্ছে আর থেমে যাচ্ছে। গোপাল ছুটতে ছুটতে ওভারব্রীজে উঠে ওপারে নেমেই এক সাইকেল রিকশায় চেপে বসলে। নয়নের গলিতে এসে পড়ে আটটা বাজার আগেই।

আলো নেই সিঁড়িতে, সিঁড়ির মাথাও অন্ধকার। নয়নকে দেখা গেল না সেখানে। গোপাল দুটো দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে, তারপর থেমে থেমে ওপরে উঠে আসে। সিঁড়ির মুখ পেরিয়েই খোলা একখানা বারান্দা, পাশে পেয়ারা গাছের ডালে চাঁদের আলো পড়েছে। নয়নের দরজার কাছে এসে গোপাল আস্তে আস্তে কড়া নাড়ে। নয়নের কোন সাড়া আসে না। গোপাল দেখলে ঘরের বাইরে তালা দেওয়া নেই। আবার কড়া নাড়লে আস্তে আস্তে। কোন উত্তর এল না। অল্প ধাক্কা দিতে দরজা খুলে গেল। ঘরের এককোণে কুণ্ডলী পাকিয়ে কী পড়ে আছে। গোপাল সুইচ টিপতেই সেই কুণ্ডলীটা ধড়মড় করে উঠে বসল। নয়ন কী আশ্চর্য বদলে গেছে। মাথায় কাপড় দিতে

পারেনি বলে তার মাথায় যেখানে চুল উঠে গেছে সেখানটা চোখে পড়ল। কিন্তু সবচেয়ে বেশী করে চোখে পড়ল তার চোখ দুটো। যন্ত্রণায় চোখের পাতা মেলতে পারছে না নয়ন। সমস্ত মুখে কে কালি ঢেলে দিয়েছে।

নয়ন গত তিন চার বছর ভুগছে। মাঝে মাঝে তার অসুখটা কমে, কখনও উগ্র হয়ে পড়ে। মেয়েদের অসুখে যে বিশ্রাম, যে নিয়মের দরকার তা তার জোটেনি। তিন দিন থেকে ছটফট করছে সে অসুখে। ময়লায় কখনও থাকতে পারে না, আজ দুপুরেও তাই অসুখের মধ্যে কাপড় কেচেছে। বিকেল থেকেই প্রায় অচেতন হয়েছিল, এ্যাসপিরিন খেয়েও কিছু কমেনি। তার মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, চোখের কোণ ভারী টসটস্ করছে। ক্লান্তিতে, অবসাদে সে যখন চাইলে তখন তাকে প্রায় চেনা যায় না।

নয়ন একবার চায় গোপালের দিকে। যন্ত্রণার ঘোরে পাক খেতে-খেতেও সে আঁচ করতে পারে গোপালের মনের কথা। গোপালের চুল হাওয়ায় উড়ছে। কাঁধ আলগোছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে চৌকাঠে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল। কোন্ মুখে নয়ন তাকে বলে তার মাথা ছিঁড়ে পড়ছে। একবার ইচ্ছে করে গোপাল কোল পেতে বসে তার মাথাটা নেয়। কিন্তু গোপাল যেন পাঞ্জাবীর ভাঁজ সামলাতেই ব্যস্ত। এক মুহূর্তেই নয়নের করুণ অসহায় বড় বড় চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মাথার কাপড় টেনে কাঁপতে কাঁপতে নয়ন উঠে একটা মাদুর বিছিয়ে দিল। গোপাল বেশ আলগোছে জামাইবাবুর মত বসলে। নয়ন বললে, "আজ কদিন থেকে মাথা ছিঁড়ে পড়ছে, আর পায়ের নীচ থেকে এমন ব্যথা উঠে আসছে।"

গোপাল দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে বললে, "কেন, আবার কী হোল?" তার কথা বলার ভঙ্গিতে বিরক্তি যে ছিল তা নয়। বরং

জিজ্ঞেস করেই বেশ মিষ্টি হাসলে। কিন্তু নয়ন বোঝে গোপালের অসোয়াস্তি হচ্ছে। একবার ভাবলে তা হোক না। যদি গোপাল তাকে ভালবাসে তাহলে তার এই বিপদের সময় কি সে পাশে এসে দাঁড়াবে না? এটা খুব বেশী কিছু চাওয়া? কিন্তু দৈহিক অসুখের তীব্রতা তার মনের জোর ভেঙ্গে দিল। সে ভাবলে হয়তো এতখানি চাওয়া তার অন্যায় হবে। সারাদিন তেতেপুড়ে খেটেখুটে ছেলেটা এসেছে, সে যে এসেছে এই যথেষ্ট। নয়ন মনে মনে বলছিল, "তোর কোল পাত, মাথা রাখি," কিন্তু মুখে বললে, "একে বুড়ী, তার ওপর অসুখ, তুই বরং কয়েকদিন পর আয়, তখন সেরে উঠব।"

গোপাল সেদিকে কান না দিয়ে বললে, "কই এ্যাদ্দিন অসুখ হয়েছে আমায় তো জানাওনি।"

নয়নের সঙ্কোচ বোধ হয়, তার এই যন্ত্রণার কথা গোপালকে বলতে তার বড্ড বাধে। বললে, "দু এক দিনের মধ্যে ভাল হয়ে উঠব।"

"ভাল হয়ে যাবে না ছাই, কী চেহারা হয়েছে, ঠিক পাগলীর মত দেখাচ্ছে।"

বেশ হয়েছে, পাগলীর মত হয়েছে, বেশ হয়েছে, তুমি চলে যাও, তোমাকে তো কেউ ধরে রাখছে না।" নয়নের এবার সত্যিই কান্না পায়। তাকে বড় একটা কেউ কাঁদতে দেখেনি। আর কাঁদা তার কাছে কেমন যেন নাটক করা মনে হয়। কিন্তু গোপালের কঠিন কথায় সে আর সামলাতে পারে না। ভয়ে কথা বলে না, পাছে গলা ছাপিয়ে কান্না আসে।

গোপাল বললে, "তুমি ভাবছো খালি তোমার মন দিয়ে এগোবে, না? শরীর না থাকলে কোথায় দাঁড়াবে। তুমি যা ভাবছো, শেলাই শিখবে, গান শিখবে, স্বাবলম্বী হবে, সে তো সব ভেসে যাবে অসুখের ধাক্কায়।"

গোপাল যা বলে তা সবই সত্যি। সত্যিই এ অসুখকে পুষে রাখলে সমূহ ক্ষতি। কিন্তু বলে বিরক্ত হয়ে, অনেকটা তৃতীয় ব্যক্তির তরফ থেকে। সে যেন কাগজে সমালোচনা লিখছে, জনসাধারণ, সরকার দুজনেরই খুঁত কেড়ে উপদেশ দিচ্ছে। আসলে গোপাল সকাল থেকে যে সন্ধের সম্ভাবনা দেখেছিল তা থেকে এ সন্ধে একেবারে আলাদা হয়ে পড়ল। প্রতীক্ষমান উজ্জ্বল নয়নের বদলে রোগে ছটফট করছে এক মহিলাকে যখন দেখলে, তখন সে অসোয়াস্তিতে নিতান্ত সাধারণ হয়ে দাঁড়ায়। তার মনে পড়ল সন্ধেবেলা বাসের মেয়েটির দৃপ্ত ঋজু ভঙ্গী। তার চোখে সে যেন নিজেকে দেখতে পেলে এক উজ্জ্বল, সম্ভাবনাময় যুবক। সঙ্গে সঙ্গে নয়ন হঠাৎ অসুখ বাধিয়ে তার প্রাপ্য আনন্দ থেকে বঞ্চিত করছে বলে তার মনে হয়। অপ্রচুর সময় থাকা সত্ত্বেও সে যে এই ভাবে এসে দাঁড়িয়েছে এতে নিজেকে আদর্শ প্রেমিক পুরুষ না হলেও অস্পষ্ট ভাবে ঐ ধরণের একটা বড় কিছুর মত লাগে।

তার চমক ভাঙে নয়নের কথায়। হেঁচড়ে শরীরকে শাসনে এনে সে তার স্বাভাবিক বসার ভঙ্গী আয়ত্তে এনেছে। দুবার আঁচল দিয়ে মুখ মুছে ধীর গলায় বললে, "অন্তু ডাক্তার দেখিয়েছিল। দুটো ইন্‌জেকসন দিয়ে আর হয়ে ওঠেনি। ওসব কথা তুলে লাভ কী? ওখানে কৌটোয় এলাচ আছে, খুঁজে নে।"

গোপাল এলাচ চুষতে চুষতে উঠলে। প্রত্যেক দিন বিদায় মুহূর্তে তারা দুজনা দুজনের দিকে তাকায়। আজ নয়ন অনেকক্ষণ থেকে খুঁজছিল গোপালের চোখ দুটো। গোপাল কেন যেন চাইলে না। জুতোর বক্‌লস্ এঁটে গম্ভীর মুখে নয়নের মুখের দিকে চাইতেই সে চমকে উঠল। নয়ন হাসছে, প্রত্যেক দিনের মতই আগ্রহে তার দিকে চেয়ে আছে। যেন এই অসুখ, এই প্রচণ্ড অবসাদ আর যন্ত্রণার ওপরেও তার একটা জায়গা আছে, যে জায়গায় সে একেবারে সম্রাজ্ঞী, আর

কাউকে পাত্তা দেবে না। গোপাল থমকে দাঁড়ায়। আর সঙ্গে সঙ্গে তার এতক্ষণ এলোমেলো চিন্তা এত প্রচণ্ড সস্তা ঠেকে যে নিজেকে চড় মারতে ইচ্ছে করে। নয়নের সঙ্গে সে কি প্রেম-প্রেম খেলা খেলতে এসেছিল ? নয়ন যে সে খেলার অনেক ওপরে। এত ওপরে, আর এত আশ্চর্য রকমের বড় লাগে নয়নকে আর নিজেকে এত ছোট, দুর্বল, সস্তা ঠেকে যে আর চুপ করে থাকতে পারেনা সে। হঠাৎ নীচু হয়ে আবার জুতোর বক্‌লস খুলতে থাকে তারপর আলো নিভিয়ে নয়নের কাছে এসে অস্থির ভাবে বলে, "আমায় মাপ কর মন, আমায় মাপ কর। আমি মানুষ ছিলাম না।"

গোপাল তার পাঞ্জাবী দুমড়ে নয়নের মাথা কোলে টেনে নেয়। তার ঘামে ভেজা গালে গাল রেখে শান্ত ভাবে বলে, "উঃ আমি কী ছোট্ট মানুষ।"

নয়ন তার যন্ত্রণা ভুলে যায়, আনন্দে অস্থির হয়ে হাত দুটো বাড়িয়ে বলে "তুই এ্যাত্ত বড় গোপাল, এ্যাত্ত বড়।"

গোপাল সে রাত্তিরে অনেকক্ষণ জেগে থাকে। গুজারামের হাঁপানি হয়েছে। মাঝে মাছে শ্লেষ্মা তোলে। তাতে গোপালের তন্দ্রা কেটে যায়, গোপাল ভাবতে থাকে, বাঁচার যদি একটা প্রকাণ্ড অহঙ্কার না থাকে, যে অহঙ্কারের ফলে চলায় ফেরায় কথাবার্তায় বেঁচে থাকার প্রত্যেক মুহূর্তে আবার সমস্ত জীবন জুড়ে একথা না বোঝায় স্পষ্টভাবে যে বেঁচে আছি, যদি বাঁচা মানে কম বয়সে কতকগুলো দায়িত্বহীন ভাবনা আর তারপর প্রতি মুহূর্তেই আপোষ করে চলার জন্যে নিজেকে তৈরী করা, শুধুমাত্র অভ্যেসের জোরেই টিঁকে থাকার অবস্থায় এসে দাঁড়ান যায়, তাহলে কী এসে যায় এভাবে বেঁচে—এভাবে সবই করে অথচ কিছুই না করে ? বাঁচার অহঙ্কারই খোঁজে গোপাল তার চারপাশের মানুষের মধ্যে। যেখানে সবচেয়ে বেশী অহঙ্কারী লোকের আনাগোনা, ইংরেজী

সাংবাদিক ভাষায় যাকে বলে সোসাইটি, সেখানে কিছুদিন ঘোরাফেরা করার পরেই তার বিরক্তি আসে। সেখানে ওপরের ঠাট সব ঠিক আছে, কিন্তু পায়ের তলায় জমি নেই। একটু এদিক ওদিক হলেই মিঃ বসুর কথা মত সেই পেঁচীভূতটা বেরিয়ে আসে। এক ধাক্কায় বাঁশের কেল্লা ভেঙ্গে পড়ে।

গোপাল তাই নিজেকে জিজ্ঞেস করে, এত তেজ নয়ন পেল কোথায়? গোপালের সমবয়সী বন্ধুরা কলেজ জীবনে এবং তার কয়েক বছর পরবর্তী জীবনে যা সব কথা বলছে তাদের মধ্যে আশমান-জমিন পার্থক্য। নয়ন কী পেয়েছে তার জীবনে? বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নভেলের নায়িকার মত সে এম, এ-তে ফার্ষ্ট ক্লাস নয়। বিদ্যার গর্ব নেই, যৌবনের জৌলুস নেই, স্বামী নেই, ছেলে থেকেও দূরে, তার ওপর আছে অসুখ, দুশ্চিন্তা। তাছাড়া এমন একটা সামাজিক পরিবেশে বাস করে না সে, যাকে বলা যেতে পারে উন্নত। নিজের আত্মীয়ের বাড়ী গতর খাটিয়ে দুবেলা দুমুঠো ভাতের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে সে এত জোর পেল কোথা থেকে? কোথা থেকে টেনে আনলে এই তেজ—যা নেভে না।

পরদিন রোববার, ছুটির সন্ধে। হাওয়া দিচ্ছে ফাল্গুনের। নয়নের পিঠে ব্যথা হয়েছে। হট-ব্যাগ পিঠে দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় তর্ক বাধিয়েছে গোপালের সঙ্গে। জানলার নীচে কৃষ্ণচূড়ার ডাল লাল হতে সুরু করেছে। অন্তু হঠাৎ তার ক্রশওয়ার্ড পাজ্‌ল্‌ গুটিয়ে নিয়ে বললে, "তোমরা কি সব ছাইভস্ম বল বুঝতে পারিনা।" গোপাল বললে, "বোস না, না হয় একটু ছাইভস্ম তুইও শুনবি।" অন্তু জবাব দেয়, "ও আমার হজম হবে না। দাবা খেলা হচ্ছে ছাত্রের বাড়ী, সেখানে চল্লাম।" অন্তু বেরিয়ে যায়,

গোপাল তার কথার সূত্র ধরে বললে, "শুধু মুহূর্ত না, মুহূর্তের দাম

আছে কিন্তু ঠিক তারই মধ্যে বাঁচতে চাইনে। আনন্দকে আরও দীর্ঘ-স্থায়ী করার দায়িত্ব নিতে হবে!”

নয়ন উঠে বসলে। দেয়ালে হেলান দিয়ে বললে, “দীর্ঘস্থায়ী বলিসনে, বল চিরস্থায়ী।”

“না, চির কথাটা বলতে পারছি না।”

“কেন?”

“বলতে পারছিনা, কারণ যদি মন মরে যায় তাহলে শুধু লেগে থাকার কোনও অর্থ হয় না। ওটা একটা অভ্যেস। যেমন চারদিকে দেখি।”

নয়ন বললে, “একথা তোর মুখে আগেও শুনেছি। কিন্তু বুঝি না, সত্যি বলছি বুঝি না মন কেন মরে যায়।”

“গোপাল অস্পষ্ট ভাবে বললে, “মানুষ বলে বোধহয়।”

“মানুষ বলেই তো বুঝিনা মন কেন মরে যাবে!”

গোপাল ভুরু কোঁচকায়। মন মরে যায় কথাটা সত্যিই দম বন্ধ হয়ে আসার মত। অথচ মন মরে যাওয়া এত চলতি হয়ে পড়েছে যে সেটা প্রায় দুর্ঘটনা নয়, ঘটনা মাত্র। তবু নয়নের সামনে এ প্রসঙ্গ তুলতে তার অসোয়াস্তি হয়। তার সম্ভাবনার বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তিকে সংহত করার জন্যে উঠে পড়ে লাগতে ইচ্ছে করে। যার মন মরে যাওয়ার সহস্র কারণ ছিল অথচ মরেনি তার সামনে এ প্রসঙ্গ তুলতে তার বাধে।

গোপাল খুব ভাল বোঝে না রাজনীতি। আগে সুনীলের সঙ্গে কথা হলে তার ঝগড়া হয়ে যেত। গোপাল বলত, “তোরা কি রে! সব ব্যাপারটাই মুলতুবী রাখবি আগামীর জন্যে। এখন এই যে বেঁচে আছিস এর কোন দাম নেই, এ থেকে কোন আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা করবি না? ঐ যে কবিতায় লেখে—ঝড় শান্ত হয়ে যাবে, তারপর

আসবে সকাল……তখন ভাবছিস বুঝি মানুষের কোন যন্ত্রণা থাকবে না? খালি ফারপোয় বসে আইসক্রীম খাবি?" বেশ জোর দিয়েই বলেছে সে এসব কথা এবং এখনও বলে। কিন্তু একটা জিনিষ সে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। উপযুক্ত ভাবে বাঁচতে গেলে পরিবেশের দরকার, চেষ্টার দরকার। মিঃ বসুর মত বাঙালী মধ্যবিত্তকে গাল দিয়ে কী লাভ, যেখানে সে সুনীলের সঙ্গে একমত, সেটা হল, নয়নের মত মনের ঐশ্বর্যের কোনও দাম নেই এ পরিবেশে। কোন অবস্থায় ঠিক থাকবে, তা গোপাল বলতে পারবে না অঙ্কের মত। কিন্তু এটা খুব স্পষ্ট এই কোনঠাসা বুকচাপা মধ্যবিত্তের চৌহদ্দীর মধ্যে মনের বিকাশ হওয়া প্রায় অসম্ভব।

অথচ যে ঘটনায় সে ক্রমশ আশ্চর্য হয়ে পড়ছে তা হল, যদি এ জীবনে কোন প্রচণ্ড পরিবর্তন না-ও আসে, তাহলেই নয়ন ভেসে যাবে না, মন মরে যাবে না তার। একথা তার হাবভাবে, চলায় ফেরায় স্পষ্ট তীব্র ভাবে। নয়নের পরিবেশের কথা ভেবে সে কোন থৈ পায়না। তার বোন ঘুঁটে দিয়ে তা স্বামীর কাছে বিক্রি করে পয়সা আদায় করে। তার স্বামী তাকে বলেছিল, তোমায় শাড়ী গয়না দিতে পারলেই তুমি আমায় ভালবাসতে। আর অন্ত সাধারণ ভাবে কথা বলার রেওয়াজই তুলে দিয়েছে। এরই মাঝে, এই কথাবার্তার আলোড়নে সে যৌবন পার হয়ে আজ মধ্যবয়সী। এ অবস্থায় গোপাল নিজে যদি পড়ত তাহলে সে কী করত বলা মুশকিল। তবে তা সে কল্পনা করতে পারে না।

নয়ন হঠাৎ হেসে বললে, "কী দেখছিস্?"

"তোমাকে। আচ্ছা, তোমার মাথার সামনে তো এত চুল ছিল না। এত চুল হল কী করে? তুমি কি চুল ছিঁড়তে?"

নয়ন লজ্জা পেয়ে যায়, বলে, "টেনে দেখ, পরচুলা পরিনি।"

"আগে তো এত চুল ছিল না!"

"আগে সত্যিই ছিঁড়তাম।"

"আমি তো জানতাম রাগে দুঃখে চুল ছেঁড়া, ওটা একটা কথার কথা। তা আবার সুন্দরী হবার সখ হল কেন?"

"তোকে দেখার পর থেকে।"

গোপাল বললে, "আমায় যদি না দেখ তাহলে আবার তুলতে সুরু করবে?'

নয়ন বললে, "না, আর তুলব না। কী হবে নিজের ওপর শোধ তুলে!" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, "আমার নতুন করে খেলতে ইচ্ছে করে। ছেলেবেলায় ক্রিকেট খেলতাম। সে দিনগুলো খুব মনে পড়ে। আশ্রমে গিয়ে দেখতাম আমাদের বয়সী মেয়েরা ছুটছে শার্ট প্যাণ্ট পরে। বড্ড ভাল লাগল।"

গোপাল স্পষ্ট অনুভব করে নয়ন যেন তাকে ডেকে বলছে: আমি মুখ্যসুখ্য লোক, অত গুছিয়ে সব কথা বলতে পারি না। আমার জগত ছোট, হয়তো সীমাবদ্ধ। কিন্তু এসো, এই জগতেই আমরা ডুবি, এই জগতেই আমরা মাতি। এই যে তুমি বসে আছ, তোমার গায়ে একটা মশা বসছে কিনা সেদিকে চোখ পড়ে আছে আমার। আমার চোখ খুঁজছে তুমি সামান্য বিরক্ত হলে কি না। চারদিকের অবস্থা বুকচাপা, অসোয়াস্তিকর। এই অসোয়াস্তির জন্যেই তোমার এই ঝাঁজ এই কষ্ট। কিন্তু দেখ, যে পরিবর্তনের কথা ভাবছ যদি আমাদের জীবনে তা নাও ঘটে তাহলেই কি ব্যর্থ হয়ে যাব আমরা? কেন হব? আমি যে কত যত্ন করে, কত সাধনা করে, কত অসংখ্য বিরক্তির ঝড় থেকে আমার বুকের আলোটুকু বাঁচিয়ে চলেছি। এমনি কত লোক চলেছে চারদিক ছড়িয়ে। সেই সাধনার দিকে তুমি একবার তাকাবে না? তুমি

বুঝবে না এ জীবনের দাম, এ জীবনের আনন্দ? তুমি আশ্চর্য হও আমার মন কেন মরে যায়নি ভেবে। আমি কেন ভেঙ্গে পড়িনি, চারদিকে ভেঙ্গে পড়ার ছবি দেখে তুমি উত্তর খুঁজে পাওনা তার। তার তো একটাই উত্তর গোপাল, আমি মানুষ। আমার দেশ নেই, কাল নেই। আমি বেঁচে আছি, বেঁচে থাকব।

গোপাল স্তব্ধ হয়ে থাকে। নয়নও আছে চুপ করে। যেকথা নয়ন মুখ ফুটে বলেনি, যা তার আচরণে প্রতি মুহূর্তে প্রকাশ পায় সেই কথাই ঘুরে ফিরে গোপালের মনে হতে থাকে। সারা মন আলোড়িত করে গোপাল বাড়ী ফিরলে সেদিন।

উনিশ

পরদিনও আলোড়ন থামল না। গোপালের মনে হল একটা সুন্দর উজ্জ্বল প্রাণের জন্যে সে দায়ী। আরো দায়ী নিজের জন্যে, অনেকের জন্যে। জীবন জীবিকার যোগসূত্র অঙ্গাঙ্গী হলেও জীবিকার পেষণে নিঃশেষ হয়ে যাবে কেন মানুষ? কেন মিঃ বসুর নেমেসিস—বাঙালী মধ্যবিত্ত হয়ে জন্মালে নিস্তার নেই, পথ নেই—একমাত্র উপসংহার হয়ে দাঁড়াবে?

গোপালের আবার কোনারকের স্থপতিদের কথা মনে পড়ে। কী আছে মানুষের ভেতর যা শৃঙ্খলের মধ্যেও কথা বলে, সাময়িক ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেও যে আচ্ছন্ন হয় না? তার কারণ, নয়নের কথা "আমি মানুষ"—এই সাদামাটা যুক্তিতে অনেকে হেসে উঠতে পারে। কিন্তু গোপাল এইখানেই স্তম্ভিত হয়। এতদিন অন্য যে সব কারণ বলা হয়েছে যুক্তি হিসেবে তা দিয়ে গোপালের দৃঢ় বিশ্বাস মানুষের সমস্ত চাহিদা মেটানো যায় না। কী মানে থাকতে পারে তার বাঁচার আকাঙ্ক্ষাকে কোন বাইরের খুঁটির ওপর দাঁড় করিয়ে মর্যাদা দেবার

চেষ্টায়? তার বন্ধু সুনীল ভাবছে আগামীর জন্যে সে বাঁচছে। কবিতা করে বললে বলা যায়, সে বেঁচে থাকবে আগামীর এক সুন্দর সকালের জন্যে। গৌর বলে তার এক কবি বন্ধু বাঁচছে বিখ্যাত হবে বলে, ক্রমশ বাংলা সাহিত্যে তার আসন তৈরী করে নেবে এই অদম্য আশায়। অবিনাশবাবু আছেন আরও বই, আরও চালাক লোকের সঙ্গ কামনায়। কিন্তু এ লোকগুলোর এই খুঁটিগুলো সরিয়ে নিলেই কি তাদের বাঁচার কোন দাম থাকবে না? তারা হবে ইঁট কাঠ জড় পদার্থের অংশ?

সকালবেলায় চা খাওয়া মিটতেই দরজার কড়া নড়ে উঠল। যার কথা সে এই মাত্র ভাবছিল সেই গৌর হাজির।

কিছুদিন হল পালটে গেছে গৌরের চেহারা। আগে প্রায়ই হয় দাদার শার্ট পরত কিংবা পরত ঝুলছোট পাঞ্জাবী, কালি পড়ত না চপ্পলে। একটু অন্যমনস্ক, কেমন মুখচোরা ভাব। এক একদিন এমন হয়েছে খোঁচা দিয়েও কথা বেরোয়নি। আজ বেশ অন্য রকম দেখায়। ঘিয়ে পাঞ্জাবী, হালকা চাদর, চোখে মুখে আত্মপ্রত্যয়, পকেটে লাল খাম। গৌর এসেছে তার বিয়ের নেমন্তন্ন করতে।

টেবিলের ওপর খামখানা ছুঁড়ে ফেলে গৌর বললে, "সোমবার বিয়ে, যাবি কিন্তু।"

গোপাল খাম খুলে প্রজাপতয়ে নমঃ থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেললে। তারপর কনের নামটা লক্ষ্য করে বললে, "কে রে এই মিনতি?

"কেন, সবই তো দেওয়া আছে। তারকনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী দিনাজপুরের বালুরঘাট নিবাসী..."

"না না, আমি তা বলছি না। তোর সঙ্গে কদ্দিনের আলাপ মেয়েটির?"

গৌর একবার কঠিন দৃষ্টিতে গোপালের দিকে তাকিয়ে বললে, "আমি জানি তুই আমায় ঠাট্টা করবি। বলবি, প্রেমের কবিতা লিখে

বাংলা সাহিত্যে নাম কিনছিস্ আর বিয়ে করলি কিনা শেষ পর্যন্ত পণপ্রথায়, বাপ-মাকে খুশী করার জন্যে এই তো !"

গোপাল এধরনের কথা আশা করেনি গৌরের কাছে। সম্প্রতি কবিতার ক্ষেত্রে তার জনপ্রিয়তা বোধ হয় কিছুটা আত্মপ্রত্যয় এনে দিয়েছে তার কথাবার্তায়। গৌরের কঠিন নিষ্পলক মুখের দিকে তাকিয়ে গোপাল বললে, "হ্যাঁ তাই বলছি।"

গৌর রেগে বললে, "যাবার ইচ্ছে থাকলে যাস্, নইলে যাসনে। আমি তো আর তোকে জোর করছি না।"

গোপাল শান্ত ভাবে বললে, "অত চটছিস্ কেন, বোস।"

আবার দুলতে থাকে তার মন। এতক্ষণ সে যে ভাবে বিচার করছিল, বাঁচা মানেই খেয়ে পরে বসে শুয়ে বাঁচা, সেটা কি সবটাই ঠিক ? প্রেমের ব্যাপারে যে কোনদিন যন্ত্রণা ভোগ করেনি সে কেন রাবড়ি খাওয়ার মত পরমানন্দে প্রেমের কবিতা লিখে বিখ্যাত হবার চেষ্টা করবে ?

গোপাল গুঞ্জারামকে আবার চা করতে বললে। চা খেতে খেতে গৌরের রাগ পড়ে যায়। ঠাণ্ডা হয়ে বললে, "বুঝলি না, সাহিত্যে কবিতায় অনেক কিছু বলা যায়। জীবনে কি আর সব সময় তা হয়ে ওঠে !"

গোপাল ভাবছিল, জীবনে যা ঘটে সাহিত্যে তার কতটুকুই বা ধরা পড়ে।

গৌর আরও কিছুক্ষণ জীবনকে "গ্রহণ" করার কথা বললে বেশ সুন্দর ভাবে। কিন্তু বড্ড ফাঁকা ঠেকে গোপালের কাছে। শেষে চাদর পাট করতে করতে গৌর বললে, "তুই এবার বিয়েটা করে ফেল। কদ্দিন আর একা একা থাকবি এভাবে ? এরপর যে বুড়ো হয়ে যাবি।"

"করব। সামনের বছর একটা ইন্‌ক্রিমেণ্টের কথা আছে, সেটা হলেই করব।"

গৌর আড়চোখে গোপালকে দেখে বললে, "তুই আমায় ঠাট্টা করছিস্‌, না গোপাল? কিন্তু তোর ঐ খুঁতখুঁতে ভাব আমি একদম বুঝি না। সব জিনিষকে ব্যাঁকা অসরল করে দেখে ..."

গোপাল তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে, "দ্যাখ, তোর বিয়ে করতে ইচ্ছে হয়েছে, ভাল কথা। পণপ্রথায় করছিস্‌ বিয়ে, তাতেও আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু এই ব্যাপার নিয়ে কোন ফিলজফি বানাস্‌নে, আমার সহ্য হবেনা অত।"

গৌর বিয়ের ব্যাপার চেপে গেল। বললে, "যাক যাক, যা হবার হয়েছে। প্রেম করে বিয়ে করেও তো কত লোক চুলোচুলি করছে! আর ও ব্যাপারটা যখন করতেই হবে তখন তাড়াতাড়ি চুকিয়ে দেওয়াই ভাল। আচ্ছা, তুই আমার নতুন কবিতার বইটা দেখেছিস্‌?"

গৌর সম্প্রতি তার তৃতীয় কবিতার বই প্রকাশ করেছে। আগে সে ছিল গোষ্ঠীর কবি, এখন সে জনপ্রিয় হয়েছে। বাংলাদেশের তরুণ কবিদের মধ্যে তারই বই সম্প্রতি দ্বিতীয় সংস্করণ হল। এটা সত্যিই ঘটনা কারণ এই ধরনের কবিতা কবিরাই পড়েন, আর বাইরের লোকেরা তো ব্যঙ্গচ্ছলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাদের কত প্রভেদ তাই আঙুল দিয়ে দেখিয়েই খালাস। গৌর এদিক থেকে সাফল্য অর্জন করেছে অনেকখানি চেষ্টা চরিত্র করে। এখন গৌর চট্টোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে প্রায়ই পড়া যায় "তাঁর নিরলস কাব্য সাধনা," "তাঁর ভাবগম্ভীর মানবতাবোধ," "তাঁর জীবন জিজ্ঞাসা" ইত্যাদি।

একটা কাগজে পেন্সিলের দাগ কাটছিল গোপাল। একটু দেরী করে গৌরের প্রশ্নের জবাব দিলে, "হ্যাঁ পড়েছি।" তারপর আবার দাগ কাটতে থাকে।

গৌর বিরক্ত হল। তার মনে হয় গোপাল নিজে পারেনি পাঠকের চিত্ত জয় করতে তাই তার সাফল্যে চুপ করে আছে। একটু ভেবে বললে, "ব্যস, শুধু পড়েছি। কেমন লাগল বলবি না?"

গোপাল বললে, "তুই একটু স্থির হ গৌর, কবিতা ভাল কি খারাপ এই নিয়ে আমাদের ভেতরের সম্বন্ধ পোড় খাওয়াস্‌নে।"

গৌর লজ্জা পেল, সে যে একটু ছেলেমানুষি করেছে তা নিজের চোখেই ধরা পড়ে তার। কিন্তু তার নিজের লেখার প্রসঙ্গে গোপালের এই চিরন্তন নীরবতা তাকে আহত করে। এর আগেও সে যতবার কথাটা তুলেছে ততবারই এড়িয়ে গেছে গোপাল। গৌর একটু চটেওছে সেজন্যে। যেন গোপাল তাকে একটু নাবালকের মত দেখে। পাছে কিছু খারাপ বললে তার লাগে এজন্যেই সে যেন এড়িয়ে যেতে চায় এ ধরনের কথা।

গৌর বললে, "তুই ভাবছিস্‌ আমি চটে যাব তোর কথা শুনে। কিন্তু এ কবছরে এত গালাগাল, এত প্রশংসা শুনেছি যে গায়ে লাগে না আর। তুই বল।"

"তাহলে না-ই শুনলি।"

"না না, আমার শোনা দরকার।"

"কেন?"

"আমি জানতে চাই লেখক হিসেবে আমার দোষ ত্রুটি কী।"

"সে তো তোকে সবাই বলছে। কোন্‌টা প্রতীক হল, কোনটা হল না, তুই কী ভাবে দেখিস্‌ আর একজন কী ভাবে দেখে—এ নিয়ে আর নতুন করে আলোচনার কী দরকার?"

গৌর বিরক্ত হয়ে বললে, "আমার বলতে ইচ্ছে করে না তবু বলছি, তুই আমায় হিংসে করিস্‌ গোপাল। আমার ভাল দেখতে পারিস না।"

গোপাল কাগজ পেন্সিল টেবিলের এককোণে সরিয়ে রেখে বললে, "আগামী সোমবার তোর বিয়ের দিন। এখন এই নিয়েই মশগুল থাক না। কে হিংসে করছে, না করছে তাতে তোর এখন কী এসে যায়। না হয় আমি হিংসেই করি তোকে। তাতে কী এসে যাচ্ছে!"

গৌর নাটকীয় ভাবে হাত নাচিয়ে বললে, "তাহলে তুই বলতে চাস্ মানুষের সমাজ নেই, বন্ধুত্ব নেই, সবাই যে যার খুশী নিজের মত চলবে।"

গোপাল বললে, "আমি তা বলি না"। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "আমি বলি তুই কবি নস্।"

গৌরকে দেখে মনে হল এই আক্রমণের জন্যে সে তৈরী ছিল। চেয়ারটা সামনে টেনে এনে বললে, "এইতো, তুই যে বলিস্ নাটক করে কথা বলা ভালবাসিস্ না, অথচ নিজে বলছিস্।"

"তোর শেষ কবিতার বই পড়ে আমি একেবারে স্থির হয়েছি তুই কবি নস্। তোর মেজাজে কবি হওয়া সম্ভব না।"

গৌর এতদিন পর গোপালের খোলাখুলি কথায় খুব বিচলিত হল কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু সে যে দমে যায়নি তা স্পষ্ট বোঝা যায়। হেসে বললে, "এতগুলো লোক বলছে আমি কবি আর তুই বলবি না? এরপরও যদি আমি বলি তুই আমায় হিংসে করিস্……"

গোপাল তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে, "তোর কবিতা পড়ে মনে হয় সময় কাটাবার জন্যে তুই লিখছিস্। আর অন্য কোন কারণে নয়। তোর তাসখেলার অভ্যেস নেই। থাকলে খেলতিস্। তার বদলে কবিতা লিখছিস্, সাহিত্য করছিস্।"

গৌর ভেবেছিস্ সে উত্তেজিত হবে না। গোপাল নিজে কবিতা লিখতে লিখতে থেমে গেছে, এইটেই তার বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড স্পষ্টযুক্তি। যার ফুরিয়ে যাওয়ার এমন মস্ত বড় লক্ষণ রয়েছে সামনে সে কী বললে, না

বললে তাতে কার কী এল গেল। কিন্তু গোপালের শান্ত স্থির গলায় সে চটে যায়। গোপাল যেন কোন ব্যক্তিগত ঘটনার জের টেনে কথা বলছে না। রাগ সামলে গৌর ধীর ভাবে বললে, "আমি আগেকার মত দুর্বোধ্য ভাবে না লিখে সোজাসুজি লিখি, এজন্যে বলছিস্ ?"

"এটা দুর্বোধ্য সুবোধ্য কোন ব্যাপার না। এ প্রশ্নগুলো তোলা হয় কেন বুঝি না।"

"তাহলে প্রশ্নটা কী ?"

"প্রশ্নটা হল, মানুষের মন আমরা কতখানি খুঁজেছি।"

গৌর হেসে বললে, "এ যে সেই 'অশ্ব একটি মহাপ্রাণী' ধরনের কথা বলছিস্।"

গোপাল হঠাৎ নিভে যায়। এ ধরনের আলোচনা সে আগেও করেছে। আর কথা কাটাকাটিতেই তা শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে। আস্তে আস্তে বললে, "হ্যাঁ, হয়ত তাই বলছি।"

গৌর চাদর জড়াতে জড়াতে বিজয়ীর মত বললে, "তোর বড্ড মাস্টারী রোগ হয়েছে গোপাল। সব ব্যাপারে খুঁতখুঁত করিস্, সমালোচনা করিস্। আমি সিরিয়াস্লী বলছি, তোর একটা বিয়ে করা দরকার। মানে কি জানিস, একটা ইমোশ্যনাল রিলিজের দরকার হয়তো।"

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আবার বলে, "আমি সত্যি সিরিয়াস্লী বলছি। কদ্দিন আর এমনি একা একা থাকা যায়। ব্যাপারটা ভেবে দেখিস্। উড়িয়ে দিস্না। নিজেই ঠকবি।"

তার পাঞ্জাবী-পরা খুশীতে ডগমগ চেহারার দিকে তাকিয়ে গোপাল অন্যমনস্ক ভাবে বললে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয় যাব, সামনের সোমবার তো ?"

সোজা অফিস থেকে গোপাল বিয়ে বাড়ী যায় সন্ধের পর। বাড়ী ফিরে কাপড় ছাড়তে গেলে রাত দশটার আগে গ্রে-ষ্ট্রীটের গলিতে গিয়ে পৌছানো যাবে না। পুরনো চারতলা বাড়ি, চাঁদের আলো ভাঙ্গা কার্ণিশে পড়েছে। নীচে এঁটো পাতা, কুকুর আর আলো দেখে ঢুকে পড়ল গোপাল। ঢুকেই এদিককার বাড়ির মত কলতলা।একজন বৌ কাপড় কাচছিল সিঁড়ির ঠিক মুখেই। গোপালকে দেখে কাপড় নিংড়ে সাবানের টুকরো নিয়ে উঠে গেল। সোজা খাড়া সিঁড়ি, বড় বড় ধাপ। পিতপিতে বালবের আলো। দোতলায় লণ্ঠন জ্বলছে, অনেকগুলো মেয়ে অর্ধেক অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। তেতলায় উঠেও কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে গোপাল একটা দরজায় কড়া নাড়লে। লুঙ্গি পরে কাঁচাপাকা চুল মাথায় একটা ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। গোপালের কোটের পাশ থেকে একঝাড় ফুল উঁকি দিচ্ছিল। সেদিকে একনজর তাকিয়ে ভদ্রলোক বললেন, "অ, বিয়ে খেতে এসেছেন—ওপরে চলে যান সটান।" ভদ্রলোক দরজা বন্ধ করে দিলেন তার কথা শেষ না হতেই।

চারতলায় সিঁড়ির মুখে অবশ্য আলো আছে। একজন বয়স্ক লোক বকাবকি করছেন সিঁড়িতে কোন লোক রাখা হয়নি বলে। কয়েকটি ছোট ছেলে পাঞ্জাবীর হাতায় রজনীগন্ধার বালা পরে তরতর করে নেমে গেল নীচে। গোপাল ওপরে গিয়ে দেখলে, পরিচিতদের মধ্যে একমাত্র নির্মল বসে আছে।

ভারী কালো ফ্রেমের চশমা, সব সময় ব্যস্ত, নির্মল কোন কলেজের মাস্টার। তার ওপর খবরের কাগজের আর্ট ক্রিটিক। সম্প্রতি আরও একটি কলেজে ঢুকেছে। গোপালকে দেখে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে। এতক্ষণ একলা বসে থাকার বিরক্তি থেকে নিজেকে ঝাড়া দিয়ে নির্মল চেঁচিয়ে উঠল, "এইযে সাহেব এসো, তোমাদের জন্যই তো আছি। তোমরা সব মুরুব্বি লোক।"

গোপাল পাশের চেয়ারে এসে বসে। নির্মল বললে, "কই, আজকাল তো তোমায় কোথাও দেখি না।"

"কোথাও মানে ?"

"তোমার মিউজিকে ইনটারেস্ট ছিল না ?"

"ইনটারেস্ট আর কি! মাঝে মাঝে গান বাজনা হলে শুনতে যেতাম।"

নির্মল একটু উসখুস করে একটা বই-এর প্যাকেট বার করলে। চিত্র বিচিত্রকরা ইউরোপীয়ান ব্যালের ওপর বই। গোপালের দিকে তাকিয়ে নির্মল গম্ভীর ভাবে বললে, "তোমার ব্যালে সম্বন্ধে কী মত ?"

গোপাল আশ্চর্য হয়ে বলে, "মত আবার কী ?"

"বাঃ ব্যালে সম্বন্ধে···" নির্মল কী বলবে নিজেই বুঝে উঠতে পারে না।

সে যে একটু চমকে দেবার জন্যে বইটা দিচ্ছে তা গোপালের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। বাংলা কবিতা বই-এর চেয়ে ইউরোপীয় ব্যালের বই বিয়েতে সে কেন দিতে গেল এ প্রসঙ্গে কিছু বলবার জন্যেই সে প্যাকেট খুলেছিল। গোপাল সেরকম কোন সুযোগ না দেওয়ায় বললে, "তুমি যেন কেমন উদাসীন হয়ে পড়েছ আজকাল। আগে যখন কবিতা টবিতা লিখতে তখন তো এরকম ছিলে না।" নিজের মনেই বলতে থাকে, "সেদিন নিউ এম্পায়ারে বাকের একটা রিসাইটাল ছিল···"

গোপাল বললে, "আমি ইউরোপীয়ান মিউজিক বুঝি না নির্মল, কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান কর না।"

"আহা, আমি কি আর সব বুঝি। তবে কি জান, সব জিনিষে একটা টেষ্ট একোয়ার করতে হয়। যেমন মনে কর স্মোক্‌ড্ ফিস। ইলিশ মাছ পোড়া আমি কখনও খেতাম না। কিরকম ধোঁয়া ধোঁয়া

গন্ধ লাগতো। এখন কিন্তু বেড়ে লাগে। সব জিনিষ সম্বন্ধে আমরা যদি একটা বাঁধাধরা এ্যাপ্রোচ নিয়ে বসে থাকি তাহলে আর সকলে কী করবে?”

গোপাল মনে মনে হাসে। বেচারি নির্মল কিছুতেই সাধারণের পর্যায়ে পড়বে না।

হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে নির্মল বললে, “গত রোববারের কাগজে আমার ‘উড়িষ্যার কুটিরশিল্প’ পড়নি ? বড্ড বেশী প্রশংসা শুনছি চারদিক থেকে। অবশ্য তা যে একেবারে অকারণ তা বলছি না। আমি যেভাবে দেখেছি, এ ব্যাপারটা তো আগে সে ভাবে কেউই দেখেনি। আমি প্রমাণ করেছি···আমার মতে···” নির্মল আর থামে না। প্রথম দিকের আড়ষ্টতা একেবারে ভেঙ্গে যায়। এমন কি গোপাল আছে কিনা সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই বলে চলে।

কতক্ষণ এই আমি-র চপেটাঘাত সহ্য করতে হত গোপালকে বলা যায় না। হঠাৎ গৌরের আবির্ভাব হল, একজন ঠাকুরের হাতে এক চাঙ্গারী লুচির পেছনে পেছনে। গোপাল লাফিয়ে উঠে বললে, “তোর বৌ দেখালি না গৌর।” নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নির্মলকে বৌ দেখতে যেতে হল গোপালের সঙ্গে।

বৌ মানে চিরপরিচিত শাড়ী আর বাসন পত্তরের ভেতর মাথা-গোঁজ করা, গয়নার ভারে অবনত যে সব মেয়েদের বিয়ের আসরে দেখতে গোপাল অভ্যস্ত তাদেরই একজনকে দেখলে গৌরের বৌ হিসেবে। ঘরের মধ্যে এত বেশী মেয়েদের ভিড় যে গৌরের ইচ্ছে থাকলেও গোপালের সঙ্গে তার বৌএর আলাপ করিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় না। নির্মল একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে। মেয়েদের দঙ্গলের মধ্যে তার ইউরোপীয় ব্যালের বই মাঠে মারা গেল।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে না উঠতেই যে ফিনফিনে পাঞ্জাবী পরা

ফ্যাকাশে তরুণটী বেতের চেয়ারে শরীরের অর্ধেকখানা এলিয়ে বসে ছিল সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "গোপাল, তুইও শেষ পর্যন্ত বিয়ে খেতে এলি!"

আনন্দকে দেখে গোপালের মুখ অপ্রসন্ন হয়ে গেল। দেড়খানা ছোট গল্প লিখে বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে ঘোরাফেরা করছে আনন্দ বছর দশেক। এমন কোন গোষ্ঠী নেই যেখানে সে নাক গলায়নি। কলেজ ষ্ট্রীটের পাবলিশারের দোকান, মাসিক পত্রিকার অফিস থেকে স্থরু করে অবিনাশ বাবুর মত দুচারজন প্রোথিতযশা সাহিত্যিকদের ল্যাংবোট হয়ে জীবনের তিরিশটা বছর কাটিয়ে দিয়েছে। সব কিছুই সে লিখতে জানে কিন্তু দয়া করে লিখছে না—এই ভাবগুলো অত্যন্ত ক্লান্ত গলায় গোপালের সামনে কয়েকবার বলার পর গোপাল ক্ষেপে উঠেছিল। তবে আনন্দকে একেবারে কাটমারা গোপালের পক্ষে সম্ভব না। সে তার ছেলেবেলার বন্ধু।

"তুই কবে বিয়ে করছিস্ গোপাল? করছিস না, আশ্চর্য! মোটা চাকরী পেয়েছিস। এখন বিয়ে টিয়ে কর। আমরা দেখি।" বেশ হালকা ঠাট্টার মেজাজ আনন্দর কথায়। আনন্দ নাকি তার এই ঠাট্টার মেজাজ দিয়ে অবিনাশ বাবুর মত বিখ্যাত লোকদের ঘায়েল করেছে। একদিকে নির্মল আর একদিকে আনন্দ, এই দুই প্রতিভার পাল্লায় গোপালের দম বন্ধ হয়ে আসে। যা ভাবছিল তাই হয়। আল্‌টপ্‌কা তর্ক বেধে গেল। নির্মলকে লক্ষ্য করে আনন্দ বলে, "দেখুন, আমাদের ইনটারেস্ট কী অদ্ভুত। আমরা মুখে বলি অথচ কাজে করি না। অবিনাশবাবুর নতুন বই বেরোলে কেউ রিভিউ করবে না। চালাকিটা বুঝুন, সামনাসামনি দাঁড়িয়ে কেউ বলবেও না খারাপ হয়েছে। অথচ গত দশবছর বাংলা কবিতায় যে এক্সপেরিমেণ্ট চলছে তার একটা ক্লাইম্যাক্স বলতে গেলে এই কবিতার

বই। যদি কনটেণ্ট ধরেন তাঁর চিন্তার যে সাযুজ্য…যে আততি তাঁর বক্তব্যে, যে সংস্থা তাঁর চরিত্রে……"

গোপাল মনে মনে আওড়ালে সাযুজ্য, আততি, সংস্থা। দুবছর আগে আনন্দ বলত ইমোশুনাল ইনটিগ্রেশন, ইমোটিভ রিজন। কোন দিক থেকেই বদলায়নি আনন্দ।

অবশ্য বেশীদূর যেতে পারেনি সে। রোগা মানুষ, একটু চেঁচিয়ে হাঁপাতে থাকে। নির্মল এইবার পেড়ে ফেলে তাকে। তার দুপুরে ঘুম-দেওয়া মোটাসোটা চেহারা। ষাঁড়ের মত গলায় সে এমন চেঁচাতে থাকে যে আনন্দ ক্লান্ত হয়ে আবার চেয়ারে বসে পড়ে। চোখ বন্ধ করে ম্লান ভাবে হাসতে থাকে সে।

নির্মল তার হাত নাচিয়ে নাচিয়ে বলে, "আর্ট মানেই পিপ্‌ল, বুঝলে? পিপলকে বাদ দিলে আর্ট কোথায়?" গোপালের দিকে তাকিয়ে সে যে আশ্চর্য কথা বলে ফেলেছে এমনি ভাব করে। একটু থেমে আবার স্বুরু করে, "যেমন রবীন্দ্রনাথ, তিনি কোন গোষ্ঠীর কবি নন। বাংলাদেশের সাধারণ লোক তাঁর কবিতা পড়ে আনন্দ পায়। তাঁর গান সবাই গায়, শোনে! অবিনাশ বাবুর মুরোদ আছে এরকম লিখবার?"

ক্লান্ত গলায় আনন্দ বললে, "রবীন্দ্রনাথ আবার কবে থেকে জনগণের কবি হলেন?"

"জনগণ আপনি কাকে বলছেন?"

"জনগণ মানে জনগণ।"

তর্ক বেধে গেল। কেউ কাউকে কাবু করতে পারে না। আনন্দ শেষে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অবিনাশ বাবু যে একজন বড় লেখক এ কথাটা প্রমাণ করবার জন্যেই সে যেন বিয়ের আসরে এসেছে। তাছাড়া সে সব ব্যাপারেই বীতশ্রদ্ধ। চোখ মুখ কুঁচকে সে চারপাশের

লোকজনের চলাফেরা দেখতে থাকে। আর নির্মল জনগণ কাকে বলে এই নিয়ে উৎসাহের চোটে যা তা বলে চলে।

গোপালের মনে হয় সেই একই ছবি—একদিকে বাচালতা ও অতিরঞ্জন অন্য দিকে ক্লান্তি, বিরক্তি ও বীতশ্রদ্ধা। তাদের অফিসের মুখার্জি আর মিঃ বসুর ভূত সমস্ত বাংলাদেশ ছড়িয়ে, বিয়ের আসর, চায়ের টেবিল, অফিস জাঁকিয়ে বসে আছে।

গৌরের ভাই এদিকে আসছিল হাতে এক চাঙ্গারি লুচি নিয়ে। তার আপত্তি না মেনেই গোপাল তার হাত থেকে চাঙ্গারিটা টেনে নেয়। তারপর যেদিকে পরিবেশন চলছে সেদিকে মিলিয়ে যায়। নির্মল আর আনন্দর তর্ক থামে না।

কুড়ি

একটি আশ্চর্য যুগল কলকাতার রাস্তায় বেরিয়েছে। সন্ধেবেলা দক্ষিণপাড়ায় যারা জোড়ায় জোড়ায় বেরোয় তাদের থেকে এরা নিঃসংশয়ে আলাদা। গোপাল যখন দোকানে দাঁড়িয়ে সিগারেট কেনে তখন গম্ভীর উদাস নয়নকে তার পাশে দেখে অনেকেই তাদের একটা কিছু সম্বন্ধ আবিষ্কার করার চেষ্টা করে শেষে হাল ছেড়ে দেয়। কেউ বলে ছেলে, অনেকে বলে ভাই, কেউ কেউ হয়তো আরও কিছু ধারণা করে। পাড়ার কোন কোন বাড়ীতে নয়নের ধর্মপ্রবণতা সম্বন্ধে অস্পষ্ট একটা খ্যাতি আছে। সে যে সব কিছু ছেড়েছুড়ে একলা দুহাজার মাইল গিয়ে আশ্রমবাসিনী হয়েছিল সে খবর কেউ রাখে। কোন গীতাসভা কিম্বা ঐ ধরনের কোন ধর্মসভায় তারা যায় এটাও অনেকের ধারণা।

শহরে বসন্ত এসেছে। কলকাতায় বসন্তকালকে ঠাট্টা করে আধুনিক কবিরা বিখ্যাত হয়েছেন। এবারে অসংখ্য উদ্বাস্তুদের

আসার দরুণ বসন্ত রোগীদের সংখ্যা কর্পোরেশনের খাতায় সপ্তাহে চার সংখ্যার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু গোপাল কদিন থেকেই টের পাচ্ছিল অফিসের কামরায় বসে এই বসন্তকালের আর একটা দিক। রাত্তির সাড়ে দশটাতেও মনে হয় সন্ধে, হাওয়ায় অফিসঘরের খাতাপত্তর উড়ে যায়। শিরীষ আর দেবদারু গাছের তলা দিয়ে চলন্ত ট্রামের বাতাস গায়ে লাগিয়ে নয়ন আর গোপাল হাঁটতে থাকে।

অদ্ভুত লাগে গোপালের কাছে কলকাতার গাছগুলো। সে চোখ ধাঁধানো সবুজ দেখেছে ছোটনাগপুরের শালবনে। কিন্তু চারধারে লাল মাটি আর মস্ত আকাশের নিচে সে-সবুজে চোখ ডুবে গেলেও আশ্চর্য হয়নি। আশ্চর্য হয়েছে কলকাতায়। সারা গায়ে দাদের মলম আর কাপড় কাচা সাবানের বিজ্ঞাপন লাগিয়ে, গাড়ির চাকার ধুলো খেয়ে কোন রকমে টেনে হেঁচড়ে বেঁচে থাকে। আর শীত সরে যেতেই সবুজ স্যুট পরে হাওয়ায় দুলতে থাকে।

সেদিকে তাকিয়ে গোপাল বললে, "আমাদের অফিসে মিঃ রায় বলে একজন কাজ করে। সে বলে, যতই সে মানুষ দেখে তত তার কুকুর ভালবাসতে ইচ্ছে করে।" হেসে চোখ নামিয়ে বললে, "বোধ হয় কোন আধুনিক ইংরেজী বইতে পড়েছে। যেখানে সেখানে লাগাচ্ছে। আমার কিন্তু মন খারাপ হলে এই গাছগুলোর কথা ভাবি।"

নয়ন বললে, "গাছ কেন, মানুষও তো আছে। যে কোনদিন ভাবেনি সে কিছু পাবে, বড়জোর বাহাদুরী দেখিয়ে কষ্ট করে মরে যাবে, সে কি নিজেই জানতো আবার নতুন করে নিজের কথা ভাববে। অন্তু আমার হাত দেখে বলেছে আমি নাকি আরও দুঃখ পাব। আমি কিন্তু আর দুঃখ ভয় করি না। আনন্দের দিকে চেয়ে বাড়তি দুঃখ পেতেও রাজি।"

গোপাল বললে, "আচ্ছা মন, দু তিন বছর আগেও তো তুমি আমাকে জানতে। তখন তুমি আমার সম্বন্ধে কী ভাবতে মন?"

নয়ন হেসে বললে, "বাঃ, এখন যা ভাবি তাই।"

"না, তা নিশ্চয় না। তোমার চোখ মুখ তার সাক্ষী দেবে। আর আমি সত্যি বলছি, কখনও ভাবিনি তোমার এত কাছে আসতে পারব। তুমি ঠিক যে একেবারে বন্ধুর মা ছাড়া আর কিছু ছিলে না তা বলছি না। তবে অন্যের সুবাদেই যেন তোমার সম্বন্ধ। তাছাড়া আমার মধ্যে কিছুটা হয়তো মিশনারী ভাব আছে। তুমি কষ্টে পড়েছিলে...।"

রেললাইনে একটা গাড়ী এসে পড়ায় তাদের কথা থেমে যায়। লাইনের পাশে ফাঁকা জায়গা ধরে তারা হাঁটতে থাকে।

নয়ন বলে, "বই পড়েছিস্ বলে কি সবই শিখে ফেলেছিস্?"

"মাঝে মাঝে ভাবি তোমার বয়েস, হাজার রকমের খিটিমিটি এগুলো কেন আমার গায়ে লাগে না।" খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "দেখ, আমি, ভগবান বিশ্বাস করি না, কিন্তু তোমায় দেখে মনে হয় বিশ্বাস করব।"

নয়ন হেসে বললে, "যাক আমার আশ্রমবাসী হওয়াটা তাহলে একেবারে মাঠে মারা যায়নি। অন্তত একটা লোককেও ধর্মের পথে এনেছি।"

"না, ঠাট্টা না। ভগবান নিয়ে সস্তা কথা বলতে ইচ্ছে করে না। কেউ ভগবান পেয়েছে বললেও হাসি পায়, কেউ ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিলেও হাসি পায়। কিন্তু কেন বলছি জানো, বাঁচাটাকে আমার মাঝে মাঝে বড্ড রহস্য বলে মনে হয়। দিনের অর্ধেক সময় খবরের কাগজের অফিসে কাটিয়েও এ অসুখটা সারাতে পারলাম না। বরঞ্চ যত দিন যাচ্ছে ততই তা চেপে বসছে। এ রহস্যের কোন হিসেব নেই।

যেখানে কোন সম্ভাবনা নেই ভাবছি, ঠিক সেইখানেই হাজার রাস্তা খুলে যাচ্ছে। অনেকটা মন্ত্রের মত।”

“আমি তো জানিস্, পাথর দেখলেই মাথা ঠুকতাম। ছোটমামা এসেই আমায় পাকড়ে হাউ হাউ করে চেঁচিয়ে ধর্মের কথা শোনাতেন। কিন্তু একটা প্যান্ট-পরা ছেলের কাছ থেকে আমি যা ধর্মের কথা শুনেছি আর শুনছি তাতে আমার কাশী হরিদ্বার কোথায় ভেসে গেল।”

গোপাল আত্মগত হয়ে বললে, “এ রহস্য কিন্তু ঠিক এমন ভাবে হাড়ে হাড়ে টের পাইনি। কত বই পড়েছি তবে যখনই পিঠ খাড়া করে পড়তে শিখেছি, সন্দেহ হয়েছে। মনে হয়েছে ভাল কথা, সুন্দর কথা, তবে বেশ বানানো কথা, কিম্বা যদি বানানো ঠিক নাও হয় অন্তত আমার চারপাশের জীবনে তার কোন চিহ্ন দেখিনি। নিজেদের ধিক্কার দিয়েছি কবিতা লিখে ব্যঙ্গ করে। তারপর চোখকান বুঁজে ঝাঁপিয়েও পড়েছি একটা কিছু করার জন্যে। আমি সে ঝাঁপানোকে নিন্দে করি না, স্তুতি করি না। এদেশে এত অন্যায় আবর্জনার জঞ্জাল জুটেছে যে তার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরে গেলেও বেশী কিছু করা হবে না। সত্যিই ঝাঁপানো দরকার। কিন্তু কখনও ভাবিনি এ রহস্যের কথা। তারপর চাকরীতে এসে যাকে বলে খেড়ু হয়েছি। আরও জীবনের ঘাঁতঘোত সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়েছি। এখন আর আমায় কেউ গোবেচারী ভালমানুষ হিসেবে নিতে পারবে না। নেহাত একটা বাউল লোক, নিজে ভাল হয়ে সারা দুনিয়া ভাল দেখছে এ ধরনের মানুষকে আমল দিই না। কিন্তু কখনও ভাবিনি এ রহস্যের কথা এমন ভাবে। সমস্ত জঞ্জাল সরে গিয়েও যদি বাঁচাটা আজকের মত রহস্য হয়ে না দাঁড়ায় তাহলে আমার পক্ষে বাঁচার তাগিদ ফুরিয়ে যাবে।”

নয়ন বললে, "চল, আর দাঁড়িয়ে না, কোথাও বসি।"

কয়েকটা শুকনো গাছে থোলো থোলো বেগুনী ফুল ফুটেছে। গোপাল সেদিকে তাকিয়ে বললে, "বাঃ একেবারে প্রেমের আইডিয়াল সেটিং। এই লেক নিয়ে এত হৈ চৈ শুনেছি, কানে তালা লেগেছে। অথচ যখন ক্লাস সেভেন এ পড়ি তখন থেকে রোজ বৃষ্টি বাদল মাথায় করে লেক পাক দিতাম। তখন অবশ্য এত গাড়ি আর মারোয়াড়ীর উপদ্রব হয়নি। কোথা থেকে কয়েকটা ন্যাকা ছেলেমেয়ে হাত ধরাধরি করে লেকের জলে ডুবে মরলো, তারপর থেকেই লোকে ভাবলে এটা বৃন্দাবন। আমি তো ফাঁকা জায়গা, জল আর গাছ ছাড়া কিছুই দেখি না। বাংলা সিনেমায় প্রেম করতে গেলেই এদিকে আসবে নায়ক নায়িকা, দুজনে মিলে গান ধরে দেবে। মাঝে মাঝে এমন অপবিত্র মনে হয় জায়গাটা, অথচ বেচারা জায়গাটার কী দোষ!"

গোপাল বসে পড়লো একটা গাছের নীচে। নয়ন হঠাৎ বললে, "আর কটা বছরের মধ্যেই আমার সব চুল পেকে যাবে। এর মধ্যে আমায় নিয়ে কোথাও চল, অন্তত কিছুদিনের জন্যে। আর পারিনা প্রত্যেকটা মুহূর্ত নিজেকে দাবিয়ে রাখতে, সব সময় অন্যের কথা না মানলেও সায় দিতে। আমার ছেলেবেলার সেই গাধার গল্পটা মনে পড়ে যায়, সকলের মন রক্ষা করতে গিয়ে যার সব গেল। মাঝে মাঝে মনে হয় একটা লোককেই সব প্রাণ ঢেলে খুশী করি। এই ভাবে নিজেকে ক্ষয়ে যেতে দিতে ইচ্ছে করে না।"

নয়ন যখন বললে, "একটা লোককেই" তখন তার গলা কেঁপে উঠলো। কে বলবে তার চুলে পাক ধরেছে! গোপাল অনুভব করে, নয়নের এ চাওয়ার মধ্যে ঝাঁজ নেই, আকুতি নেই, আছে এমন এক ধরনের বিশ্বাস যা গোপাল আগে কখনও দেখেনি। ঠিক এই মুহূর্তে

তার মনে হল নয়ন আর কারো না, শুধু একটি মাত্র লোকের। আর তখনই সে ভাবে এ বিরাট আত্মদানের সে কি যোগ্য ?"

নয়ন বললে, "শুধু মন কেমন করা নয় গোপাল, রাত্তিরে ঘুমোতে পারি না একজনের কথা মনে করে—একথা বলতে আমার লজ্জা নেই। কিন্তু শুধু মন কেমন করা নয়। অনেক জিনিষ নিয়েই এ জীবনে মন কেমন করেছে। তুই তাদের দলে না। তবু মন খারাপ হয়ে গেলে অতুল প্রসাদের গানটা গাই। খুব যত্ন করে শিখব ভাবছি গানটা।"

"কোন গান ?"

"ঐ যে, একা মোর গানের তরী—"

"ওর অনেক ওপরে উঠতে হবে আমাদের।"

নয়ন বললে, "আমি তা জানি। তুই ধুরন্ধর ছেলে। শুধু খেদের গান তোর ভাল লাগবে কেন ? কিন্তু মানুষ অমনি অমনি তো খেদ পার হতে পারে না। খেদ করেই তো খেদ পার হয়।"

গোপাল ভাবছিল এ কথাটাই সে নিজে বলতে গেলে কতখানি কেতাবি হয়ে যেত। অথচ নয়ন কী সহজ ভাবে বললে।

গোপাল ভাবে সত্যিই কোন জোড়াতালি মিলন তাদের দুজনের পক্ষে অসম্ভব। সে যখন আলগোছে নিজের অজান্তে তার মনের কথাটার ইঙ্গিত দিয়েছিল তখন নিজেরই কানে যেন চড় মেরেছে সেই কথাটা। আবার সে আজ তীব্রভাবে বোধ করে নয়ন তার পাশে থাকলে সে অনেকখানি বিরক্তির হাত থেকে রেহাই পায়। কোন আধ্যাত্মিকতা দিয়েই এই মোদ্দা কথাটা চাপা দেওয়া যায় না।

"মাঝে মাঝে মন, মন্তরে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে।"

"একটা মন্তর তো আমাদের জীবনে ঘটেছে, সেটার মানই রাখি আমরা।"

"দেখ, তোমার যে ফটো নদির বাড়িতে আছে, সেই তোমার

আঠারো উনিশ বছরের চেহারা—এখন থেকে একেবারে আলাদা। খুব তাগড়া মোটাসোটা একটা খুকুমণি ছিলে, বেশ ভোঁতামি ছিল সে চেহারায়। এখন তোমার চুল পাকুক তবু তোমার চেহারা কথা বলে।"

নয়ন হেসে বললে, "তুই আগে বড্ড একটা শ্যাকা কথা বলতিস্। তখন কিছু বলিনি। মনে মনে হাসতাম।"

গোপাল চমকে বলে, "কী কথা?"

"ওই যে খুব গদগদ হয়ে বলেছিলি আমার মেয়ে থাকলে তুই নাকি বিয়ে করতিস্। শুনে অসহ্য লাগতো। আমি কি গল্পের পুতুল? মেয়েমানুষ না আমি? আমার মেয়ে থাকলে তোর কাছ থেকে সাত হাত দূরে রাখতাম তাকে।" নয়ন চমৎকার ভঙ্গী করে ঘাড় বাঁকালে।

রাত নটা বাজে। লোকজনের ভিড় পাতলা হয়ে আসছে। বজবজের ট্রেন চলে গেল। অনেকক্ষণ ধরে লাল আলো দেখা যায়।

গোপাল উঠবার সময় নয়নের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললে, "না, কোন আফশোষ নেই মন।"

পরদিন বেলা বাড়লো, কিন্তু অফিস যাবার নাম করলে না অন্তু।

নয়ন অবাক হয়ে বললে, "অফিস নেই তোর?"

"রিজাইন দিয়ে এসেছি," অন্তুর গলার আওয়াজে মনে হল সে জোর করে গলার স্বর দৃঢ় করেছে।

নয়ন তাকিয়ে দেখলে অন্তুর মুখ চোখের ভাবান্তর। সমস্ত মুখখানা থম্‌থম্ করছে চাপা আবেগে। বললে, "রিজাইন দিলি চাকরীতে, এখন খাবি কী?"

"খাবনা, এভাবে আর চলা যায় না।"

"কেন, কী হয়েছে?"

অস্তু হঠাৎ ভেঙ্গে পড়লো, "কী হবার বাকি আছে! তোমরা সব, সব আমার শত্রু। আমি কেন মরতে যাব তোমাদের জন্যে?"

অস্তুর এই নতুন উত্তেজনায় হতভম্ব হয়ে পড়ে নয়ন। অস্তু তাকে দোষী করছে। কিন্তু কেন, কী করেছে সে?

কিছুক্ষণ কেউ কথা বলে না। তারপর অস্তু বলতে সুরু করে, "তোমাদের সঙ্গে থেকে আমার যা ক্ষতি হয়েছে তার আর পুরণ হবে না। আমার বাপ মা ভাই বোন বন্ধুবান্ধব কেউ নেই। আমি একলা থাকতে চাই। একলার পেট আমি চালিয়ে নেব।"

নয়ন আচ্ছন্ন হয়ে বসে থাকে। যুক্তি তর্ক বিচার সমস্ত ভেসে যায় তার মন থেকে। তার ছেলে তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে, একথা ভাবতেই তার সমস্ত অন্তর ওলোটপালোট হয়ে যায়। শুধু বেঁধা না, অস্তুর কথাগুলো তাকে পোড়াতে থাকে।

অস্তু বলে, "ছেলেবেলা থেকে দেখতাম বাবা তোমায় ভালবাসে না, তুমিও বাসোনা। বড় হয়েই চেষ্টা করলাম বোকার মত সবাইকে আগলাতে। ভাবলাম নিজে তো গিয়েছি তলিয়ে, ভাইটা আছে। সেটাও বখে গেল।"

নয়ন ব্যগ্র হয়ে বললে, "আমি তো আছি অস্তু, আমি আছি।"

"না, তুমি নেই। তুমি থেকেও নেই। তুমি শুধু মা-টি হতে পারবে না, তুমি আরও কী হতে চাও। কী চাও তা জানি না। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার মেজাজের একেবারে অমিল। আর এ অমিল শোধরাবার না।"

নয়ন বললে, "তোর বাবার কাছ থেকে আসার সময় অতশত বুঝে আসিনি। আমি আসাতে যে তোর দেনা হবে তা ভাবিনি, কিন্তু সেই একটা ভুলের জন্যে তুই আমায় এমনি ভাবে দোষী করবি আর কিছু দেখবি না!"

"না মা, এটা শুধু টাকার ব্যাপার না।"

"তাহলে কী অন্তু?"

"আমার মনে হচ্ছে তুমি আমার সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নিয়েছ। সেই ধারণা মত আমি না দাঁড়ালে..." অন্তু কিছুক্ষণ কথা খুঁজে পায় না। তারপর জোর দিয়ে বলে, "সেই ধারণা মত আমি না দাঁড়ালে তুমি আমায় শ্রদ্ধা কর না।"

"তুই কী বলছিস্ অন্তু?"

"আমি ঠিকই বলছি মা। আমি তোমাকে একটু চিনি। তুমি না চাইলে কিছুই চাওনা, একেবারে সন্ন্যাসিনীর মত। কিন্তু চাইলে নিস্তার নেই। তোমার অত চাওয়া আমি মেটাতে পারব না।"

"আমি তোকে অশ্রদ্ধা করি কেন বলছিস্ অন্তু?"

"হ্যাঁ মা, আমি যা, তার প্রতি তোমার কোন শ্রদ্ধা নেই। তুমি অবশ্য চেষ্টার কোন ত্রুটি কর না সেই অশ্রদ্ধা ঢাকতে। কিন্তু আমি বুঝি। তুমি আমায় গড়ে পিটে তোমার মত বানাতে চাও। আমি তা হতে পারব না মা। আমি খুব সাধারণ—দেনা করে দেনা শোধ দিতে চাই না। আর যারা সাধারণ তাদের প্রতি তোমার সহানুভূতি আছে, কিন্তু আর কিছু নেই।"

"আমি তো নিজেই সাধারণ অন্তু।"

"কে বললে? না খেতে পেলে আর ছেঁড়াকাপড়ে থাকলেই সাধারণ হয় না। তুমি যদি সাধারণ হতে তাহলে আমার আর ভাবনা থাকত না...। আমি আগেও ভেবেছি, এখনও ভাবি, কোথায় যেন গোপালের সঙ্গে তোমার একটা মিল আছে। গোপালও তো এত বুক বাজিয়ে সাধারণের কথা বলে। কিন্তু সাধারণের থেকে সে একেবারে আলাদা। যেমন তুমি মাসিমার বাড়িতে শাড়ী আর বাসনের গল্প শুনে হাঁপিয়ে ওঠ তেমনি গোপালও অস্থির হয়ে পড়ে

মামুলী গল্প শুনলে। কোনদিন বন্ধু ভাবতে পারলাম না গোপালকে। আর যারা কলেজের বন্ধু ছিল সবাই তো সরে গেল। কেউ একবার চাইলেও না। গোপাল সে রকম নয়। কিন্তু কেন জানি গোপালকে কিছুতেই আপনার ভাবতে পারি না। তোমার কাছে থাকলে যেমন অসোয়াস্তি লাগে তেমনি লাগে গোপালের কাছে এলে। সে যেন নিঃশব্দে আমার এই সাধারণ আমি-কে ব্যঙ্গ করছে।"

নয়ন বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে অন্তুর দিকে। একেবারে নতুন লাগে তাকে। এত স্বচ্ছ পরিষ্কার ভাবে সে কখনও নিজেকে মেলে ধরেনি। কিন্তু তার কথায় এমন একটা ভাব ছিল যাতে নয়ন অবসন্ন বোধ করে। অন্তু যেন আর এক জগৎ থেকে কথা বলছে। তার স্বাভাবিক কথার স্বর হারিয়ে কেমন একটা ঠাণ্ডা অনুত্তেজিত স্বরে বলে যাচ্ছে, যেন তার বক্তব্য বিশেষ দরকারী নয় তার কাছে। কিম্বা সে এমন জগতে আছে যেখানে তার বক্তব্যে কিছু এসে যায় না।

নয়ন তার বিস্ময় কাটিয়ে ওঠবার আগেই অন্তু বললে, "গোপাল আর আমার কোন মিল নেই, মা। গোপাল বাঁচে তার আইডিয়ার জন্যে। আমার কোন আইডিয়া নেই। গোপালের কোন টান নেই ঘর বাঁধার জন্যে। আর আমি···সে সব কথা তুলে কী লাভ? আমি একটুখানি জানলার পর্দা আর একফালি বারান্দার জন্যে সকাল থেকে রাত্তির আটটা পর্যন্ত অফিসে ধুঁকতে রাজী ছিলাম। কিন্তু সে সব বলে কী লাভ? আমার মনে হয় তুমি আবার মা পণ্ডিচেরী চলে যাও। ধার তো এমনিতেই হয়েছে। আর কিছু ধার করে তোমায় পাঠিয়ে দি।"

নয়ন বিস্মিত হয়ে বললে, "পণ্ডিচেরী কেন?"

"তার কারণ ভগবান না-ই মানো সেখানে গেলে একটু আরামে থাকতে পারবে।"

"আমি এখানেই থাকব অন্তু। আমার আর আশ্রমে যাওয়া হবে না।"

"আমি জানতাম মা, তবু ভেবে দেখ।"

"ভেবে অনেকদিন থেকেই দেখেছি। কিন্তু তুই কোথায় যাবি ?"

"কোথাও যাবো না, কোথাও যেতে চাইনা।"

"তাহলে আমিও তোর সঙ্গে থাকব।"

"তা হয় না। আমি কালই এ বাড়ির পাট তুলে দিচ্ছি। তুমি মাসিমার বাড়ি গিয়ে ওঠো। আমি আমার এক ছাত্রের বাড়িতে উঠব।"

নয়ন অনেকবার অনেক রকমে বোঝাবার চেষ্টা করল অন্তুকে। শেষকালে অন্তু ঘুমিয়ে পড়ার ভান করে! সারারাত ছটফট করে ভোরের দিকে ঘুম এসেছিল নয়নের। সকালে উঠে দেখলে অন্তু বেরিয়ে গেছে তার হোল্ডঅল নিয়ে। এই ক'মাসের সংসারের চিহ্ন, উনুন, কড়াই দালদার শূন্য টিন আর অন্যান্য টুকিটাকি দাঁত বের করে তাকে ভেংচাচ্ছে। বিকেলের দিকে ভারী পায়ে তারিণীদার বাড়ি এসে ওঠে নয়ন।

একুশ

আবার যশোদাকে নিয়ে কুরুক্ষেত্র বেধে গেল তারিণীদার বাড়ি। নদিদি বললেন, "নয়নই তো ওকে আস্কারা দিয়ে মাথায় তুলেছে। নইলে ঝি-চাকর ঝি-চাকরের মত থাকবে। তাদের চা-খাওয়ানো, গরম জামা দেওয়া এ সব আদিখ্যেতা কেন!"

নয়ন শুয়েছিল। গত দুদিন থেকে মাথা ভার হয়ে আছে তার। গোপাল বারবার করে এ্যাসপিরিন যখন তখন খেতে নিষেধ করে দিলেও সে ভাবছিল কাউকে দিয়ে এ্যাসপিরিন আনাবে কিনা।

নদিদির গলা আবার কানে এল, "নয়ন এমন ঝি-চাকরদের মাথায় তোলে যে তাদের দিয়ে আর কাজ করানো যায় না।"

নয়ন এবার উঠে বসলো। খালি গ্লানি, খালি গ্লানি। এর পাঁক হাজার বার রগড়ালেও যে গা থেকে উঠবে না। তারিণীবাবু সকাল সকাল কোর্ট থেকে ফিরেছেন। বাড়ির লোকজনের সঙ্গে চেঁচামেচির ব্যাপারে তিনি মুক্তকণ্ঠ। কোর্টের পোষাক খুলেছেন কি খোলেননি কথাটা উঠলো। তারিণীদা ফেটে পড়লেন, "বড়লোকী করতে গেলে নয়ন, গ্যাঁটের পয়সা থাকা দরকার। তোমার তো কিছুই নেই, ফকির মানুষ। তুমি আজকে একটা বদ অভ্যেস করে দেবে তার ধকল আমাদেরই তো পোয়াতে হবে।"

নয়ন এসব ক্ষেত্রে কথার উত্তর দেয় না, আজও চুপ করে থাকে। এর শুধু একটা মাত্রই উত্তর আছে। তার সুটকেস আর পুঁটলী হাতে নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়া। কিন্তু কোথায় যাবে সে? আর এভাবে গড়িয়ে গড়িয়ে কতদিন কাটাবে?

ব্যাপার সামান্যই। যশোদাকে তিনবাড়ি কাজ করতে হয়। তেতাল্লিশ সালে দুর্ভিক্ষে স্বামী, চার ছেলে হারিয়ে একটী মাত্র ছেলে নিয়ে সে কালীঘাটের বস্তিতে থাকে। সেই ছেলেরও খাওয়া দাওয়ার তদ্‌বির করতে সময় পায় না। নয়ন এজন্যে তার হাতের কাজ নিজের ওপর নিয়ে একটু তাড়াতাড়ি ছুটি দিয়ে দেয় তাকে। কদিন যশোদা তাই সকাল সকাল ফিরেছিল। তারিণীদার কড়া হিসেব। মাইনে থেকে চারটাকা কেটে রেখেছেন।

নয়ন ভাবছিল সংসার করতে গেলেই কি প্রতিপদে অন্যকে অপমান করে বাস করতে হবে? তার মনে পড়লো নতুন জামাই তারিণীদার ফাউণ্টেনপেন খোয়া গেলে তিনি বাড়ির একটা বাচ্চা চাকরের নাকে লঙ্কা পুড়িয়ে কথা বার করবার চেষ্টা করেছিলেন। নয়ন তখন নতুন

জামাই-এরও তোয়াক্কা রাখেনি। ধাক্কা দিয়ে আঁচড়ে ছেলেটিকে বার করে এনেছিল।

নয়নের কঠিন নিস্তব্ধ মুখে বসে থাকার ঢংটি দেখে তারিণীবাবু গলা নামিয়ে বললেন, "ওরা কি আর ছাই মর্যাদা বোঝে? তুমি তাদের যত্ন করলে মাথায় চড়বে।"

যশোদাকে নিয়ে প্রায়ই ঝড় চলছে। ভোর থাকতে উঠে চৌবাচ্চা পরিষ্কার করে ভারী ভারী বালতিতে জল তোলার রেওয়াজ নয়নের ওপরেই পড়েছে। নয়ন এই টানা হেঁচড়ার ব্যাপারে বড্ড অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু এদিক দিয়ে কারও চোখ নেই। নদিদির ছেলে যে সারারাত গানের আসর জমিয়ে শেষ রাত্তিরে বাড়ি ফিরে বেলা তিনটে পর্যন্ত ঘুমোয় সে তো মরে গেলেও এক পা নড়বে না। সম্প্রতি তার পুজোর রোগ ধরেছে। সারা দুপুর ধূপ জ্বালিয়ে চিত হয়ে কখনো উপুড় হয়ে শুয়ে সে কাটিয়ে দেয়। যশোদার কিন্তু ছোড়দির কষ্টের ব্যাপারে খেয়াল আছে। তার অত সকালে আসার কথা নয় কিন্তু সে সাতসকালে এসেই জল তুলে ছুটতে ছুটতে আর এক বাড়িতে কাজ করতে চলে যায়। সে একটু ধার্মিক প্রকৃতির। বলে, "ছোড়দি, তোমার কাজ করা মানে ঠাকুরের কাজ করা।"

সন্ধের পর যশোদা আসতেই নদিদি চেঁচিয়ে ওঠে, "একি, এ জামা তোমার গায়ে কী করে?"

যশোদা অবাক হয়ে বলে, "বা, ছোড়দি দিলে যে।"

নয়নকে লক্ষ্য করে নদিদি বললেন, "তুমি এ জামা যশোদাকে দিয়েছ? আমাকে বললেই পারতে, ফিরিয়ে নিতাম। তুমি কোথায় ঠাণ্ডায় কষ্ট পাবে তাই জন্যে তোমায় দিলাম। আর তুমি কিনা তাই আর একজনকে বদান্যতা করলে।"

প্রায় গলা পর্যন্ত চীৎকার ঠেলে ওঠে নয়নের। আর তার মনে

হয় এ চীৎকার শুধু বিশেষ কারুর বিরুদ্ধে নয়, অথচ সবার বিরুদ্ধে। তার মাথা ঝিমঝিম করে। একবার তার ভেতরের তাপ চোখে ঝিলিক মেরে যায়। কিন্তু পরক্ষণেই নিঃশ্বাস স্বাভাবিক ভাবে পড়তে থাকে। ধীরভাবে বলে, "আমার তো গায়ের একটা কাপড় আছেই। যশোদা বেচারা ঠাণ্ডায় কষ্ট পাচ্ছিল।"

নদিদি কিছু বলেন না, কিন্তু সমস্ত আবহাওয়া থমথমে হয়ে থাকে। ছোটমামা তারিণীদার কাছে এসেছিলেন তাঁর বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে পরামর্শ করতে। সম্প্রতি তিনি বেশ একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন নয়নের মধ্যে। নয়ন তাঁর কথাবার্তায় বিশেষ সাড়া দেয় না। সেই রকম আগেকার আলোচনা তো তার নেই-ই আজকাল—যেমন মানুষ মৃত্যুর পর কোথায় যায়, আত্মা কী, প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধ হয় কী করে—এবং একটা দুটো হুঁ হাঁ ছাড়া এসব ব্যাপারে বিশেষ ঘেঁষতে চায় না।

ছোটমামা সন্ধেবেলার ঘটনা শোনার পর নয়নকে ডাকলেন। নয়ন তাঁর সামনে বসে মাথা নীচু করে একমনে রুটি বেলে। ছোটমামা খানিকক্ষণ চোখ বুঁজে থাকার পর চোখ খুলে বললেন, "তোমার নদিদিকে সংসার করতে হয়। দৈনন্দিন কতরকম কাদা ঘাঁটতে হয়। এই যে সেদিন শুনলাম তারিণীকে না বলে সে টাকা জমিয়ে তার নাতিকে হার গড়িয়ে দিয়েছে। এ তো তারিণীকে ঠকানো হোল না, অথচ কার্যসিদ্ধিও হোল। তোমরা দুজনেই সিদ্ধির পথে এগোচ্ছ। একজন সংসারের মধ্যে দিয়ে, আর একজন সংসারের বাইরে থেকে।"

ছোটমামা বড্ড চেঁচিয়ে কথা বলেন। কেমন একটা আত্মতৃপ্ত মেজাজ তাঁর কথাবার্তায় নয়নের চোখে ধরা পড়ে। নয়নের তা খারাপ লাগে। কেন আরও আস্তে, ভেবে ভেবে কথা বলা যেত না? ছোটমামা এমন ভাবে বলেন যেন তাঁর সব জানা হয়ে গেছে। যে

কোন সমস্যা এলেই তিনি কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে থাকবার পরই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে একটা সমাধান করে দিতে পারেন। নয়ন তার অজান্তেই তুলনা করছিল তাঁর সঙ্গে আর একটা মানুষের। সে যখন কথা বলে তখন সে যেন নিজেকেই জিজ্ঞেস করে উত্তর সন্ধান করছে। সেই শান্ত স্থির অথচ দৃঢ় গলার স্বর ভেসে আসে নয়নের কানে।

শীত চলে গেলেও ছোটমামা গরম পোষাক ছাড়েননি। কম বয়সে বেশ সুপুরুষ ছিলেন। নয়নের মনে পড়ে তাদের ছেলেবেলায় সকালে উঠেই দেখত ছোটমামা সিল্কের চাদর গায়ে তানপুরায় ভোরের রাগিণীতে আলাপ করছেন। এখন একটা বাদামী রংএর ধোক্কড় গলাবন্ধ দিশী কোটে তাঁর চওড়া শরীর ঢেকে রাখেন প্রায় বছরের পাঁচ মাস। শীতকে বড্ড ভয় ছোটমামার। তাঁর মোটাসোটা স্বাস্থ্যবান আঙুলগুলো দিয়ে পায়ের চেটো ঘসতে ঘসতে হঠাৎ বলেন, "যে জন্যে আমি বিয়ে করলাম না।"

নয়ন রুটি বেলা থেকে মাথা তোলে। ছোটমামা বললেন, "বয়স তো আমার বেশ হোল। এখনও যে আমি বিয়ে করতে পারি না তা নয়। কিন্তু সে রকম মনের মত কোন আদর্শ নারীর সাক্ষাৎ পাইনি। আর সে রকম আদর্শ কোন নারীর সাহচর্য না পেলে উপলব্ধির সমগ্রতা আসে না।" কিছুক্ষণ আবার চোখ বোঁজেন। নয়ন লক্ষ্য করলে গালের নীচের মাংসের পুরু স্তর এই ক'বছরেই বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ছোটমামার। চোখ খুলে বললেন, "বুঝলে নয়ন, সংসার মানেই কাদা। তুমি যা চাচ্ছো, সেরকম কোথাও দেখবে না, সে সব খালি বই-তেই হয়, মানুষের জীবনে ঘটে না। সংসারে থাকতে গেলেই স্বার্থপর হতে হয়। আর স্বার্থপরই বা বলি কাকে, আমি যাকে স্বার্থপর বলব তা-ই হয়তো দেখা যাবে বিবেচনা। না না, নয়ন তা হয় না, তুমি যা চাইছো তা হয় না। সংসারের সমস্ত লোক

তোমার আমার মত হলে সংসার সংসারই থাকত না। এত দেখলাম। মানুষের যা মঙ্গল তা নিয়ে বিচলিত হয়ে কোন লাভ নেই। হয়তো এজন্মে হবে না, আসছে জন্মেও হবে না, কিন্তু তারও পরের কোন জন্মে হয়তো সম্ভব হবে। এ নিয়ে বিচলিত হয়োনা নয়ন।"

এতক্ষণ ছোটমামা যে ভাবে কথা বলছিলেন তাতে নয়নের কিছু বলবার ছিল না। এক একটা মানুষ এক এক ভাবে জীবনকে দেখে, এক এক ভাবে জীবনকে পায়। ছোটমামার যৌবনে হয়তো কোন ঘটনা ছিল, সে ঘটনার কোন সুরাহা করতে না পেরে তিনি বিয়ে-থা করেননি, অথচ বিষয় সম্পত্তির বেলায় ঘোরতর সংসারী হয়ে রয়েছেন, একটা কড়ি কম হলে তাঁর রাত্তিরে ঘুম হয় না—এ সবই সত্যি। তবু লোকটাকে একটু বিচিত্রই লাগে নয়নের। বিশেষ করে এ লোকটাই যখন অত্যন্ত ঘোড়েল তারিণীবাবুর সঙ্গে সমস্ত সন্ধে শলাপরামর্শ করে কাটায় তখন নয়নের অবাক লাগে। ছোটমামা আবার তাঁর জীবনদর্শন সুরু করলেন। কী ভাবে জন্মে জন্মে "আত্মার উপলব্ধির" ফলে এক "লোকোত্তর অস্তিত্বের" পথে এগিয়ে যেতে হবে। আজ হোক, হাজার বছর পরে হোক, সে পথে সত্যিই মানুষ যাবে। সমস্ত সমস্যাগুলোর এমনি ঢালা মীমাংসা করে দিতে থাকেন ছোটমামা যে নয়নের অসোয়াস্তি হয়। মৃত্যুর পরবর্তী অস্তিত্ব তাকে এখনও যে বিচলিত করে না তা নয়। কিন্তু এখন ইহলোক অনাত্মীয় মনে না হওয়াতে পরলোক সম্বন্ধে সে চিন্তা করবার প্রায় সময়ই পায় না। এই ইহলোকে এত করার আছে, এত পাবার আছে, এত দেবার আছে যে ঠিক গোপালের কথাই বলতে ইচ্ছে করে, একটা জীবন বড্ড অকিঞ্চিৎকর।

নয়ন রান্না ঘরে গিয়ে বসে। সে চারপাশের গ্লানির ভেতর থেকেও

তার নিজস্ব একটা জগৎ তৈরী করে নিতে চায়। সেটা অনেকখানি মানসিক হলেও সে জগত যেন তার কাছ থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না। যশোদার ব্যাপারে সে যে অবিবেচনার কাজ কিছু করেছে তা মুহূর্তের জন্যেও তার মনে হয় না। আর এ শুধু যশোদা বলে গোপাল বলে না। মানুষকে যত্ন করতে হবে, নইলে মানুষের সংসারে বাস করার মূল্য থাকে না তার কাছে।

কয়েক দিন আগে এ বাড়িতে তাদের একজন পুরোনো পরিচারিকা এসেছিল। আর সবাই তাকে বলে প্রিয়দিদি। নয়ন ডাকে পিওদি। এখন একেবারে খুনখুনে বুড়ী। ছ্যাঁচা পান মুখে দিয়ে অতীতের জাবর কাটতে কাটতে তেলে ভাজা বিক্রি করে। কালীঘাটের মন্দিরের কাছে থাকে সে। স্বামীর ঘর করতে যাওয়ার সময় পিওদি ছিল নয়নের সঙ্গে। তার চোখগুলো কুৎকুৎ করে পিওদি বললে, "কই, তুমি কখন যাবে তোমার বাড়ি? যখনই আসি তখনই দেখি তুমি রান্নাবাড়া করছ এখানে। তোমার ছেলেরা খাবে কী?"

কথাটা লেগেছিল নয়নের। কোনও রকমে সে কথা চাপা দিতে না দিতে পিওদি বলেছিল, "আর তোমার বর, সে আসে না তোমার কাছে?"

"সে ছেলেদের কাছে আসে মাঝে মাঝে। আমি এখন বুড়োসুড়ো হয়েছি।"

চোখ বন্ধ করে এক মুখ পান চিবোতে চিবোতে পিওদি বলেছিল, "দূর, বরের কাছে বৌ কখনও বুড়ী হয়?"

শেষের কথাটা নয়নকে বেঁধেনি, একেবারে ছোঁয়নি বলতে গেলে। বর-বউ এর ওপর পিওদির কথায় সে হেসে লুটিয়েছিল। কিন্তু বিঁধেছে তাকে পিওদির আগের কথাটা। কোথায় রুটি সেঁকতে এসে সে চিন্তা করবে তার নিজের জগতের কথা, যে জগতে সে রাণীর মত হয়ে থাকে

তা না…তার সমস্ত বুক কেঁপে ওঠে। মানুষের আপন বলতে যে সব সম্বন্ধ সেগুলো তার কাছে এমন পর হয়ে উঠলো কেন ?

যশোদা নিয়ে যে ঝড় উঠেছিল তা কোথায় মিলিয়ে যায়। আর এক ঝড় উঠলো নয়নের মনে। এ ঝড়ের বেগ আরও তীব্র, আরও দীর্ঘস্থায়ী।

নদিদি একেবারে হিসেবের জগতের মানুষ। আর সে জগৎ থেকে মাঝে মাঝে তিনি বেশ নিরাসক্ত মন্তব্য করেন। এমনিতে তিনি ঝগড়াটে বজ্জাত ধরনের মোটেই নন। কিন্তু চুপ করে থাকতে তিনি পারেন না। উনুন দুমিনিট খালি গেলে তাঁর মন খাঁ খাঁ করে। তারিণীবাবুর যা রোজগার আর যা জমিয়েছেন এদিক ওদিক থেকে তাতে কলকাতায় বাড়ি তোলবার জন্যে লোকে জোগাড়যন্তর করে। কিন্তু নদিদি রাস্তায় গোবর পড়ে থাকতে দেখলেই ছুটে যাবেন। শীতকালে ভোর চারটেতে উঠে গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে দেবেন। যশোদা কেন গায়ে জামা দেবে শীতকালে তা ভেবে তিনি বাস্তবিক অবাক হন। তিনি দেখেছেন যশোদাদের চোদ্দপুরুষের গায়ে শীতে জামা দেবার রেওয়াজ নেই।

পরদিন দুপুরে মেজদি এলে গুলজার করে দুই বোন পারিবারিক গল্প করতে বসে। মেজদির অবস্থা খারাপ না। আগে স্বামীর জোতজমি থেকে পয়সা আসতো ; একটি ছেলে সরকারী দপ্তরে কাজ করে। সারাদুপুর তবু ঘ্যানর ঘ্যানর করে দুঃখের লম্বা ফিরিস্তি দিচ্ছিলেন। দুপুর গড়িয়ে এলে নয়ন একবার মাথা তুলে হেসে বললে, “তোমরা দুজনেই তো এত সমস্যা নিয়ে দুপুর কাটালে। আমার কথা তো কিছু বললে না ? কী আশ্চর্য, আমিও তো একটা মানুষ।”

নদিদি বললেন, "নয়ন, তুমি আমাদের থেকে আলাদা।"

"কেন, আলাদা কেন? তোমাদের বর ছেলেমেয়ে থেকেও কোন সুখ নেই? আর আমি তো রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি।"

নদিদি বললেন, "তোমার কিচ্ছু নেই, তাই বলে কি তুমি পরোয়া কর। তোমার কিচ্ছু নেই তবু অমন জাঁকিয়ে রাণীর মত বসে থাক। তোমাকে ছাই আমরা বুঝি না।"

মেজদি সহানুভূতি দেখিয়ে বললেন, "আমি হলে তো পাগল হয়ে যেতাম। এই আমার ছেলেটা প্রথমে বলেছিল নিজে দেখে শুনে বিয়ে করবে। শুনে অবধি রাত্তিরে ঘুম নেই আমার। এখন অবশ্য মত পালটেছে। তাহলেও ছেলেমেয়ে নিয়ে কি সুখ আছে?" এ পরিবারে যে সার্বজনীন ঝোঁক আছে ধর্মের প্রতি তারই রেশ ধরে বললেন, "দূর, সব মায়া। সব খেটে খেটে মরা। তা নয়ন ভালই আছে।"

নয়ন ভালই আছে। আজকাল এ দিকে চোরের গুজব উঠতে তারিণীবাবু আষ্টেপিষ্টে দরজা জানলা বন্ধ করে শুয়ে থাকেন রাত্তিরে। পাশের ঘরে খোকা নদিদির ছেলে। ঘরের মধ্যে খাটের ওপরে তারিণী বাবু নাতিকে নিয়ে শোন। আর তারা দুই বোন নীচে। তাও তারিণীবাবু রাত্তিরে নামবেন বলে নয়নকে একেবারে দেয়াল ঘেঁষে কুঁকড়ে শুয়ে থাকতে হয়। খোলা আকাশের নীচে গোপালের সঙ্গে বেড়িয়ে এসে এই গর্তে ঢুকে নয়ন ছটফট করে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এক বছর আগে যখন মনে হোত কোনও কিনারা নেই তার দুঃখের আর শেষ পর্যন্ত আত্মগ্লানির পাঁকেই গড়াগড়ি দিতে হয়েছে, সে অবস্থা আর নেই। সে যা যা ভেবে এসেছে তার চল্লিশ-বছরে তার সব উল্টো ঘটেছে, কিন্তু একটা ব্যাপারই তাকে আশ্চর্য করে দিয়েছে। তার দরুণ সে অবশ্য বেসামাল হয়ে পড়েনি। সে এক একবার নিজেকে প্রশ্ন করে, গোপালের সঙ্গে দেখা না হলে কী

হোত? সে একটা মস্ত বড় কিছু থেকে বঞ্চিত থাকত নিশ্চয়, কিন্তু তার মানে এ নয় সে একেবারে ব্যর্থ হয়ে যেত। গোপাল আসবার আগেও সে যশোদাকে যত্ন করেছে, গোপাল না এলেও করত। গোপাল তার জীবনে না এলে সে নিজে যা এতদিন ভাল বলে মেনে এসেছে তা থেকে একতিলও কেউ নড়াতে পারত না তাকে। হয়তো সে যা ভেবেছে তা পূর্ণ হত না কোনদিন। আর গোপাল আসার ফলেই কি তা পূর্ণ হতে পারে, কোনরকম পাইকেরি অর্থে? তবু আগে এই ভালমন্দর বিচারে সে বড্ড দিশেহারা হয়ে পড়ত, বড্ড একলা লাগত নিজেকে। যখন সে দেখেছে সংসারের আর পাঁচজনা তার মত ভাবে না তখন মাঝে মাঝে সন্দেহ আসত, কমজোর মনে হোত নিজেকে। তাকে মূল্য দিয়েছে গোপাল। সেদিক থেকে এক বছর আগেকার নয়ন আর আজকের নয়নের মধ্যে এক রূপান্তর ঘটেছে।

নয়ন একবার চেষ্টা করলে তার ছোট ছেলের কাছে যাবার জন্যে। বিশেষজ্ঞ যাঁরা তারা বলতে পারেন মা ছেলের মধ্যে মূলগত তারতম্যের কী কারণ। পরিবেশ কিম্বা দেহগত ব্যাপার যাই থাকুক না, কারণ হিসেবে মান্তা আর নয়নকে পাশাপাশি না দেখলে বোঝা যায় না মানুষের এত কাছের সম্বন্ধেও কী দুরপনেয় ব্যবধান। অন্তুর সঙ্গে নয়নের মেজাজের পার্থক্য থাকলেও তা বোঝা যায়। অন্তু নিস্তেজ, দুর্বল, মুমূর্ষু হোক তার সঙ্গে কিছু কিছু ব্যাপারে তার মার মিল থাকতে পারে কিন্তু মান্তা একেবারে অন্য রাজ্যের বাসিন্দা।

অন্তুর মত মান্তা কোনদিন লেখাপড়া অথবা ঘরোয়া ব্যাপারে মাথা ঘামায়নি। ছেলেবেলা থেকেই সে বেশীরভাগ বাপের কাছেই মানুষ। স্কুলের উঁচু ক্লাসে উঠে হঠাৎ পড়াশোনা ছেড়ে দিলে। দাঙ্গার সময় থেকে কালীঘাটের কতকগুলো বদলোকের পাল্লায় পড়লো। এদিকে

গানের চর্চা স্থরু হোল ফিল্ম লাইনে যাবার জন্যে। তারপর বোম্বাই অভিযান। নয়নের কাছে এ এক সম্পূর্ণ আলাদা জগৎ।

কয়েক মাস হোল মান্তা ফিরে এসেছে বোম্বাই থেকে। তার মাথার একঝাড় কোঁকড়া চুল কামিয়ে ফেলেছে। তার ফিরে আসার পর অন্তু আবার চেষ্টা করেছিল তার পড়াশোনার জন্যে। কিন্তু মান্তা সে দিকে কান দেয়নি। যতটুকু না করলে নয় এমনি পয়সা রোজগার করার জন্যে কয়েকটা গানের ট্যুইশানি করে। নয়নের নতুন বাসা করার কথায় সে ঘাড় নাড়িয়েছিল, স্রেফ বলে দিয়েছিল মা ভাই-এর সঙ্গে থাকতে পারবে না। তাছাড়া অল্প বয়সে অত্যন্ত বেসামাল জীবন যাত্রায় তার এক বিকট বৈরাগ্য এসেছে। "অশ্লীল", "কুৎসিত" এ সব কথা ছাড়া সে কথা বলতে পারে না। দুনিয়াটা, বিশেষ করে মেয়েমানুষ,—সে যেই হোক না কেন, পুরোপুরি অশ্লীল তার কাছে।

উত্তর কলকাতায় একটা মেস খুঁজে নয়ন এক সন্ধেবেলা মান্তার ঘরে হাজির হোল। ভেজানো দরজা ধাক্কা দিয়েই সে চমকে ওঠে। মান্তাকে সে চিনতে পারে না, মনে হয় অন্য কারো ঘরে ঢুকেছে। মাথার চুল ফেলে দেওয়ায় একেবারে পাল্টে গেছে তার চেহারা। আরো অনেক রোগা, লম্বা দেখাচ্ছে। এর আগে যতবারই দেখা করতে এসেছে মান্তার কোন পাত্তা পায়নি।

মান্তা তার মার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, "তুমি! তুমি এখানে কেন?"

নয়ন আড়ষ্টভাবে হেসে বললে, "তোকে দেখতে এলাম।"

মান্তা বললে, "সেটা বাজে কথা, কী মতলবে এসেছ বল তো?"

অন্তুর সঙ্গে মনের অমিল হলেও স্বাভাবিকভাবে কথা বলা যায় তার সঙ্গে। কিন্তু মান্তার আচরণ একেবারে আলাদা। তারদিকে তাকিয়ে

নয়ন আশ্চর্য হয়ে ভাবে তারই গর্ভে মান্তার জন্ম হয়েছে, এটা কী করে সম্ভব হোল? এতদিন পর দেখা হতে মান্তার এই সম্বোধন তাকে তীব্রভাবে আহত করলেও সে ভেঙে পড়ে না। মান্তার কথায় কোথায় যেন তার বাপকে আবিষ্কার করতে পারে। একদিকে অন্তর ধার করে সন্দেশ খাওয়ানোর ত্যাকতেকে নরম মনোভাব আর একদিকে মান্তার চোয়াড়েমি এ দুটোই ছিল একজনের মধ্যে।

নিজেকে সংযত করে নয়ন বললে, "এভাবে আর কতদিন কাটাবি মান্তা? তুই দাদা আমি যে যার মত তিনদিকে চলব, এ তো হতে পারে না। তার চেয়ে বরং..."

মান্তা তার মার কথা থামিয়ে দিয়ে বললে, "দেখো মা, দাদা এসেছিল। আমার কথা ছেড়ে দাও। বিলাসিতা আমার দ্বারা হবে না। তবে দাদা যা বলেছে তা ঠিক, আমরা কাদার লোক, কাদায় থাকি। আমাদের মেনে না নিলে তো তোমার থাকা চলবে না।"

মান্তা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "তারপর এসব কী? দাদার কাছে শুনলাম, তুমি গান শিখছো, শেলাই শিখছো, যেখানে সেখানে যার তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছো, এর মানে কী?"

নয়ন বললে, "উঃ, তোর ঘর দোর কী করে রেখেছিস্। একটা ঝাঁটা দে। এখানে কি মানুষ থাকতে পারে?"

তক্তপোষের এক কোনে হুড়-করে রাখা জামাগুলো নয়ন গোছাতে লেগে গিয়েছিল, মান্তা চেঁচিয়ে উঠল, "ওসব ছুঁয়োনা তুমি।"

নয়ন হেসে বললে, "এই ময়লা জামাগুলো ছুঁলে ওরা অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। তা যদি যায় কাচতে দিয়ে দিস্।"

মান্তা গম্ভীর লেকচারের ঢঙ-এ বললে, "কথা ঘুরিও না, কথা ঘুরিও না; তুমি বাবার সঙ্গে থাকো না বেশ কর। কুক্কুরী নও এ খুব

আনন্দের কথা, মনের মিল না থাকলে শারীরিক যোগাযোগ না থাকাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তুমি থাকবে বিধবার মত। তোমার কোনও ব্যাপারে কোনও আসক্তি থাকবে না।"

মান্তা আর অন্তুর কথা বলার ঢঙ-এ অনেক তফাৎ। মান্তার মতে চোয়াড়ে করে বলাটাই সত্যবাদিতার লক্ষণ।

"বিধবারা আবার বিয়ে করতে পারে। বিদ্যাসাগর এ ব্যবস্থা করে গেছেন।" কথাটা বলেই নিজেকে সামলে নিলে নয়ন। শান্ত গলায় বলে, "তুই কিছুই জানিস না মান্তা। কতই বা বয়েস তোর যে জানবি। এ নিয়ে আর কথা বলিস না, তবে জেনে রাখ, যদি আর একবার বিয়ে করার ইচ্ছে থাকতো করতাম। তার জন্যে নরক ফরকে কিছু আটকাতো না। সে তো পরের জন্মের কথা। এ জন্মটাই তোরা নরক করে তুলেছিস্।"

তারপর তার চাদরের নীচ থেকে একটা কৌটো বার করে বললে, "একটু মিষ্টি এনেছি। একটা খা।"

মান্তা মাথা নীচু করে বললে, "আমি এখন কারো হাতে খাই না, তোমার হাতেও খাব না।"

নয়ন পীড়াপিড়ি করলে না। মান্তার এই উৎকট বৈরাগ্যে ম্লানভাবে হেসে বললে, "খাসনে, তার জন্যে আমি কাঁদছি না।"

নয়ন আরও কিছুক্ষণ বসে থাকে। মান্তার কথাবার্তায় তার ক্রমশ মনে হয় মান্তা ফিরবে না। অন্তু বরং নড়ে ওঠে, নিজেদের গ্লানির কথা তোলে। মান্তা বলে সে সুখে আছে, দারিদ্র্য তাকে পীড়া দেয় না। কারণ সে বিলাসী নয়।

বেদনা নয়, অভিমান নয়, একটা ভোঁতা যন্ত্রণা নিয়ে নয়ন ফিরল মান্তার মেস থেকে।

বাইশ

ক্লাইভ ষ্ট্রীটের বিলিতি মার্কেণ্টাইল ফার্মের সবগুলিই চলেছে মন্ত্রের মত, তাদের নিজেদের কোন ইচ্ছা বা মর্জি নেই। বিজ্ঞানের কথায় বলতে গেলে একশো বছরের মোমেনটামে বিজনেস হাউসগুলো চলছে। সেখানে সামান্য চিঠির খসড়ায় একটি শব্দ এদিক ওদিক হবার যো নেই। যাকে সাধারণত বলা হয় কর্মদক্ষতা তার একটাই মাপকাঠি, ভুল সম্বন্ধে সজাগ থাকা। ইণ্ডিয়ান অ্যাসিস্টাণ্টদের কাজ কেরাণী বড় বাবুদের পেছনে ওৎ পেতে থাকা, তারপর কোন শুভ মুহূর্তে কোনও ভুল আবিষ্কার করে কর্মদক্ষ হিসেবে নাম কেনা। মৌলিক কোনও সিদ্ধান্ত নেবার কিম্বা নতুন কোন রাস্তা দেখানোর প্রশ্নই ওঠে না। সে সব প্রশ্ন অর্থাৎ অফিসের শুভ-অশুভের শতকরা নিরানব্বই ভাগ অভারতীয়দের হাতে। ভারতীয়দের অবশ্য মোটা মাইনে দিয়ে চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছে।

গোপালের অফিস কাগজের। কিন্তু বিলিতি অফিসগুলো থেকে তা আলাদা নয়। গোপালের মূল কাজ, লেখায় আচরণে ভুল না করা এবং চারপাশে কেউ করছে কিনা সে বিষয়ে খেয়াল রাখা। মাঝে মাঝে নিজেকে সে সান্ত্বনা দেয়, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এক কোম্পানীর সঙ্গে আর এক কোম্পানীর যখন রেষারেষি তখন তাদের এ ধরণের খুঁত কাড়াকে জীবনদর্শন করে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ অস্তিত্ব যে তিলমাত্র সুখকর না তা সে মর্মে মর্মে বোধ করে।

অফিসের কাঁচের দরজা ঠেলে ঢুকতে না ঢুকতে তাকে এমন এক ধরনের হাসি হাসতে হবে যার কোন মানে নেই, এমন কি বেশ লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে বেশ বোকার হাসি। অথচ এ হাসি না হাসলে গোপাল “আনসোশ্যাল”দের পাল্লায় পড়ে যাবে। সে আর “স্মার্ট” লোকদের পংক্তিতে স্থান পাবে না।

এছাড়া কতকগুলো ব্যাপার আছে। সাহেবরা যাকে বলে ‘হিউমার’ সে ব্যাপারেও যদি যথেষ্ট পরিমাণে অভিভূত হয়ে না পড়া যায় কিম্বা কেউ যদি উদাসীন থাকে সে সময় তাহলেও রক্ষে নেই। এরকম হাল্কা মেজাজে মাঝে মাঝে “ইণ্ডিয়ার” ওপরে আলোকপাত করা মন্দ না। কিন্তু আবার এসব প্রশ্নে কেউ যদি বোকার মত আগ্রহ দেখায় তাহলেও সর্বনাশ।

এ ধরনের অফিসে থাকতে থাকতে কতকগুলো ব্যাপারের ওপর এত অনুক্ষণ নজর রাখতে হয়, এত সময় দিতে হয় যে আর কোনও গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা ঘটবার যে সম্ভাবনা থাকতে পারে কিম্বা ঘটছে, এ চিন্তা ক্রমশ সরে যেতে থাকে। ক্রমশ মাথার মধ্যে চেপে বসে একটাই কথা: নতুন কিছু ঘটবার নেই, বলবার নেই, করবার নেই। মনে হয় জীবনের কোন ক্ষেত্রেই কোন নতুন প্রেরণা মূল্যহীন। এক একটা বিরাট বিরাট বিজনেস হাউসের এত অসংখ্য লোকের জীবন—কেরাণী, বেয়ারা, বড়সাহেব, মেজোসাহেবের চিন্তা চেষ্টা যে ভাবে গত একশো বছর ধরে বয়ে চলেছে তার সামনে কিছুতেই কিছু এসে যায় না। অবশ্য উনিশশো সাতচল্লিশে সেই জীবনযাত্রা কয়েক মুহূর্তের জন্যে শিউরে উঠেছিল। তবে এখন কয়েক বছর গড়িয়ে যাবার পর তা আরও সংহত হয়েছে। নতুন যা ঘটবার ছিল অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতা তা ঘটে গিয়েছে। আর কিছু ঘটবার নেই, করবার নেই।

করা একটাই আছে—ভুল না করা, কিম্বা অন্যের ভুল ধরিয়ে দেওয়া। এ চিন্তা এখানকার লোকদের জীবনদর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে বছরের পর বছর চাকরী করার পর ক্রমশ এ চিন্তা চেপে বসে—যে সম্পূর্ণ নির্ভুল সেই প্রকৃত মানুষ। যে ব্যক্তি জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, অফিসে, সংসারে, প্রেমের ব্যাপারে, ধর্মপালনে, বন্ধুত্বে একেবারে নির্ভুল সে মহাপুরুষদের পর্যায়ে।

গোপাল ভেবেছিল তার জীবনের দিগন্ত বাড়াবে ধীরে ধীরে। শুধু বই-এর মারফৎ কিম্বা ভূঁইফোঁড় কোন চিন্তার ভেতর দিয়ে নয়, প্রত্যেকদিনের বাঁচার মারফৎ। দিগন্ত বাড়াও—একথা সে বাঙালী মধ্যবিত্তের সামনে শ্লোগানের মত রাখতে চেয়েছিল। ঠিক এই কারণেই নিরাপদ, নিরুদ্বেগ মাস্টারী জীবন তার কাছে উদ্ভিদ বংশীয় মনে হয়েছে। ভেবেছিল আরও বৃহত্তর ব্যবহারিক জীবনের সংস্পর্শে এসে মানুষের ওপর বিশ্বাসকে একটা শক্ত খুঁটি দিতে পারবে। সে দিগন্ত যেন দূরে মিলিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। অন্তত এটা সে উপলব্ধি করে, মাত্র এই মার্কেণ্টাইল ফার্মের খুঁৎকাড়ার নায়কত্বে বাঙালী জীবনের দিগন্ত বাড়ানো যাবে না।

গোপালের পক্ষে তাই নয়নের কাছে আসা মানে নিঃশ্বাস নেওয়া। এমন একটা পরিবেশ যেখানে নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে বাতাস আটকে যাচ্ছে সেখানে জোর করে বাতাস ছিনিয়ে নিতে হবে, নইলে সে বাঁচতে পারে না।

সম্প্রতি এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তিনি পাথর থেকে এ নিঃশ্বাস নেন। গোপালের জগতে যা নড়ছে, কথা বলছে, সে সম্বন্ধে কোন আগ্রহ নেই তাঁর। কিন্তু ভারতীয় ভাস্কর্যে তাঁর আগ্রহের সীমা নেই। পায়ে হেঁটে তিনি দুর্গম মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কিন্তু শুধু বই কিম্বা পাথরের মারফৎ গোপাল পারে না এই বদ্ধ আবহাওয়ায় বাঁচতে। পাথরের মনোরমার দিকে তাকিয়ে তার রক্ত মাংসের কথাই মনে হয়।

অথচ কী আশ্চর্য, যারা মানুষের মন নিয়ে কারবার করেন, যাঁদের বলা হয় সাহিত্যিক, যেমন অবিনাশবাবু, গৌর—এদের সঙ্গ তাকে ক্লান্ত করে। ক্লান্ত করে বললেও ভুল হয়, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। কিছুক্ষণ তাদের সঙ্গে থাকবার পরেই সে ছটফট করে। কথায় তাঁরা

মুক্ত বিহঙ্গম, অথচ মানুষ হিসেবে এক একটি নেংটি ইঁদুর। গোপালকে একান্ত বিরক্ত করে তাদের সঙ্গ।

গোপাল আগে কখনও ভাবে নি প্রেম এতখানি রহস্যময় হতে পারে। মৃত্যুর মত আশ্চর্য তার আলো ছায়া, ভগবানের মত অনির্দিষ্ট তার রূপ। অবশ্য মৃত্যু আর প্রেমের পার্থক্যও স্পষ্ট। মৃত্যুর রহস্য অব্যক্ত। প্রেমের রহস্য উন্মোচন করলেও তা রহস্যই থেকে যায়, বললেও বলা হয় না।

গোপাল যে হিসেবের জগৎ থেকে এসেছে সেখানে কোন রহস্যের বালাই নেই। এমন কি প্রেম বলে যে চীজটির সঙ্গে তার রোজ স্কুল-ফেরতা সিনেমা পোস্টারে আলিঙ্গনবদ্ধ যুবক-যুবতী মারফৎ দেখা হত, তারপর পরবর্তী জীবনে বন্ধু-বান্ধবের রসালাপে যেটা ফুটে উঠত তা বেশীর ভাগই তাকে বিরক্ত করেছে। সেটা অনেকটা ফুর্তির মত, কড়া শীতের দিনে কাঁকড়া দিয়ে কড়াইসুটি খাওয়ার মত। কিন্তু তার জন্যে যে কোন দায় থাকতে পারে তা কোনদিন ঠাণ্ডা মাথায় সে ভাবে নি।

কিন্তু সম্প্রতি গোপাল এক তীব্র অস্থিরতা অনুভব করে নয়নের সংস্পর্শে। সে অস্থিরতা যুক্তি দিয়ে লাঘব করা যায় না। সে জ্বালা মাথা তুলে থাকে তার বুদ্ধি বিবেচনার ওপরেও।

ছুটির দিন গোপাল নয়নের সঙ্গ ছাড়তে চায় না। সকালে আসে, দুপুরে আসে, সন্ধেবেলাও হাজির হয়। যখন রাত্তিরে তারা বেড়িয়ে ফেরে তখন চৌকাঠে পা দিয়ে নয়নের দুচোখে চোখ রাখা অবস্থায় তাকে দেখে মনে হয় পাথর হয়ে গেছে। নয়নও স্তব্ধ হয়ে থাকে। সে আগেকার মত শুধু হেসে তাকে বিদায় দিতে পারে না। যে তার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে আছে তাকে এমন হাওয়ায়, এই রাত্তিরে যেতে

দিতে তার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে। গোপালের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তারও দুচোখে অস্থিরতা আসে। আস্তে আস্তে বলে, "আচ্ছা, আয়।" তারপর যোগ করে দেয়, "কাল দুপুরে আসিস্।"

দুপুরে নদিদির পাশের ঘরটিতে এসে গোপালের মনে হয় এটাই তার বাসর। বন্ধু-বান্ধবের বিয়েতে, বোনেদের বিয়েতে বাসর সে অনেকবারই দেখেছে। পালঙ্ক, থালাবাসন, ফুল শাড়ীর আয়োজন কোনদিন তাকে টানে নি। কিন্তু এই দুপুর রোদ্দুরে তারিণীবাবুর এই ঘরখানায় যেখানে নয়ন অন্তত ঘণ্টা দুয়েকের জন্যেও একছত্র রাণী সেখানে আসার জন্যে তার সব মন পড়ে থাকে। ঘরখানার একদিকে কাঁচভাঙ্গা আলমারী, মশলা ভর্তি লক্ষ্মী ঘিয়ের টিন, বেবি ফুডের কৌটোর সারি, অবিন্যস্ত স্টীলের ট্রাঙ্ক, পুজোর সরঞ্জাম, তারের ঢাকা দেওয়া আচার—সেদিকে তাকিয়ে গোপালের মনে হয় তার ঝকঝকে অফিস, তার নিজের ঘর, এমন কি সমস্ত শহরের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় এই ঘরটি।

নদিদির মেজাজটি আয়েসী। দিবানিদ্রা না হলে তিনি ভাল থাকেন না। পাশের ঘরে দরজার ফাঁক দিয়ে যে আলোটুকু আসে তাতে আরো ধারালো লাগে নয়নের মুখ। সে যে চল্লিশ বছর পার হয়েছে তার ছাপ সে আলোয় ঢাকা পড়ে যায়। নয়ন তাকিয়ে থাকে গোপালের দিকে। তাকে দেখে মনে হয় সে একটা মস্ত চীৎকারকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। গোপালের হাত থেকে নিজেকে না ছাড়িয়ে ধীরে স্পষ্ট গলায় বলে, "আর না।"

"কেন'

"যদি সব কিছু ওলোট-পালোট করে দেওয়া যেত তাহলে না হয়·

"আমি সব কিছু ওলোট-পালোট করে দেব। এখানে না হয় বুঝি, কিন্তু অন্যখানে ?"

"কোথায়—ওয়ালটেয়ার, দার্জিলিং, পুরীতে ? তারপর ?"

তারপর ? নয়নের প্রশ্নটা গোপালকে চমকে দেয়। নয়ন তাকে ফাঁকি দিচ্ছে কিম্বা নিজেকে ঠকাচ্ছে এটা তার মনে না হলেও সে ভেবে পায় না যে লোকটা তার এত কাছে এসেছে তার সঙ্গে এ প্রভেদ থাকবে কেন।

নয়ন যেন তার মনের কথা টের পায়। বলে, "আমি কোন লজ্জা করে বলছি না। এমনি কি কলঙ্ক টলঙ্কর কথা যা এত শুনে এসেছি তাও ঘুণাক্ষরে মনে হচ্ছে না। আমিও অস্থির হই। আমারও… কিন্তু রাশ টানি। এ রাশ টানতে হবে।"

গোপাল তার চোখ দুটো নয়নের মুখের কাছে নামিয়ে এনে বলে, "কেন মন ?"

আবার আবেশ আসে, আবার কোথায় হারিয়ে যায় নয়ন। প্রথমে গোপালের কোন অস্থিরতা দেখলে সে যেমন আহত হত এমন কি কেঁদে ফেলত, এখন সে ভাব হয় না তার। কিন্তু এর পার কোথায়—ভাবতে গিয়ে সে কোথায় তলিয়ে যায়। আর আধুনিক কোন কোন লোকজনের মত তারা দুজনে ঠাণ্ডা মাথায় কখনও চিন্তা করতে পারে না, তাদের মুহূর্তগুলোর সঙ্গে তাদের সারাজীবনের কোন যোগ থাকবে না, নেহাত মুহূর্তের অভিজ্ঞতা দিয়ে সমস্ত জীবনের ফাঁক ভরাতে পারবে তারা। নয়ন বললে, "কোন দায়সারা গোছের ভাব আমার ভাল লাগে না গোপাল। তবে কোন আফশোষ থাকা ঠিক না।"

গোপাল নয়নের শেষের কথায় ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় তার দিকে। না, কোন লজ্জা নেই, সঙ্কোচ নেই। গোপাল কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখে নয়ন এতক্ষণ যে ভাবে জ্বলছিল সে রকম আভা যেন তার মুখে নেই।

গোপাল ঝুঁকে পড়ে নয়নকে দেখতে থাকে। নয়নের চোখ বন্ধ। আবার তাকায় সে আবছা অন্ধকারে ঘরটার চারদিকে। এমন কি লক্ষ্মী ঘি-এর টিনগুলোও যেন প্রতীক্ষা করছে। মিনিট দু-এক চলে গেল। গোপাল হঠাৎ চমকে উঠল। নয়ন যেন বলছে, তারপর? সে আবার নয়নের দিকে তাকায়। কৈ, তার ঠোঁট তো বন্ধ। কিন্তু তার প্রশ্নটা আবার গোপালের কানে ঝম ঝম করে বেজে উঠলো। তার বুক তোলপাড় করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত অস্পষ্ট ভাবে সে মনে মনে বলতে থাকে, "না, না, আমি এ চাই না।" ধীরে ধীরে তার মাথা থেকে সর্বাঙ্গে রক্ত সঞ্চালিত হয়। না, এমন কি নয়ন যদি নিজে মুহূর্তের জন্যে ভুল করে, যদি তার প্রশ্নের কোন উত্তর না পেয়ে, নিজের সঙ্গে আর যুদ্ধ করতে না পেরে শেষকালে আত্মদান করে তাহলেও গোপাল এ দান নেবে না। তার স্বভাবের অহঙ্কার সে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না তাহলে। নয়নকে সে যেভাবে চায় তা যদি সে মুক্তকণ্ঠে খোলা আকাশের নীচে ঘোষণা করতে না পারে তাহলে তার চাওয়ার অপমান হবে। নয়নের বুকে মাথা রেখে সে ধীরে ধীরে বললে, "আজ নয় মন।"

আজ নয় কিন্তু কবে? প্রশ্নটা যে গোপালের মনে না উঠেছিল তা নয়। কিন্তু ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়। গোপাল অনুভব করে নয়নের দিক থেকে এ ব্যাপারের জন্যে কোন প্রতিরোধ নেই। কিন্তু তার নিজের অস্থিরতার তো একটা লক্ষ্য থাকবে।

গোপাল ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু নয়ন আরও তলিয়ে বোঝে। তার মনে হয় তার রাস্তা পরিষ্কার হয়ে আসছে ক্রমশ। এ সম্বন্ধে তার কোন দ্বিধা রাখলে চলবে না।

পরদিন অফিসে ক্যাজুয়াল লীভ নিল গোপাল। দুপুরবেলা তারিণীবাবুর নির্জন ঘরে এসে গোপাল বললে, "আমি সব গুলোট

পালোট করে দেব মন, এভাবে মেনে নিতে পারব না!" একেবারে অভিভূত হয়ে বললে, "তোমায় ছাড়া আমার চলবে না।"

"চলবে, পৃথিবীতে এত জিনিষ চলছে, এত ক্ষতি হচ্ছে, এটুকুন ক্ষতিও চলে যাবে। কষ্ট হবে। আমরা তো সাধু নই।"

"আমি মানব না। আমি তোমার সঙ্গেই থাকব।" বলার সঙ্গে সঙ্গে গোপালের নিজের কানেই কথাটা লাগে। কিন্তু কিভাবে গুছিয়ে বলবে ভেবে না পেয়ে কষ্টে তার মুখ কালো হয়ে যায়।

"আর পাঁচ-ছ বছর পরে যখন তোর বৌ হবে, ছেলেমেয়ে হবে তখন বুঝতে পারবি আমি যা বলছি তার মানে। আমার বয়সের তো একটা দাম আছে।"

গোপাল চেঁচিয়ে উঠল, "দাম আছে না ছাই, ও তো আপোষের কথা, ওসব কথা..." তাকে অস্থির দেখায়। তার স্বাভাবিক ধৈর্যের অভাব হয়েছে বোধ হয়।

নয়ন বললে, "চেঁচাসনে, ওরা জেগে উঠবে। ঝোঁকের মাথায় কিছু করা, কিছু বলা আমার ভাল লাগে না, শুনতেও ইচ্ছে হয় না।"

"আমি বিয়ে করব না মন, সত্যি বলছি। বিয়ে করা মানে যদি..."

"তার মানে আমার সর্বনাশ। তোর জীবনে যদি অশান্তি আনি তাহলে আমার বেঁচে থাকার কোন যুক্তি থাকবে না।"

"শেষ পর্যন্ত তাহলে অন্তরই জিত হল।"

"না", অস্বাভাবিক দৃঢ় গলায় নয়ন বললে।

"তবে ?"

"তবের কথা এখন থাক গোপাল।"

গোপাল অফিসে গিয়েও স্থির হতে পারে না। কাজ ঠিকই করে, সাহেবদের সঙ্গে হেসে কথাও বলে। কিন্তু সে যে কোথায় আছে

নিজেই বোঝে না। এফিসিয়েন্সি দেখাবার প্রতিযোগিতায় সে ক্রমশই পিছিয়ে পড়ছে, কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই তার। এই বিরাট লোকজন নিয়ে এতবড় অফিসের সবটাই তার কাছে ক্রমশ সুদূর অবাস্তব হয়ে যেতে থাকে। এখানে চলতে ফিরতে যে নীতি অর্থাৎ সব সময় সজাগ থাকা, কিম্বা কথাবার্তায় চালচলনে সামান্য ত্রুটিও না ঘটে সেদিকে নজর রাখা—এসব ব্যাপার থেকে সে ভিন্ন জগতের বাসিন্দা হয়ে পড়ছে। এমন কি যাকে বলা যায় গাফিলতি সে ধরনের কাজও সে দু-একবার করে ফেলেছে। আর এ ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে অর্থাৎ জোর গলায় যুক্তি দেখিয়ে বলা যে গাফিলতি মোটেই গাফিলতি নয়, গোপাল সে ধরনের তর্কে আশ্রয় খোঁজেনি। তার ভুল দেখিয়ে দেওয়ায় সে অন্যমনস্ক ভাবে বলেছে, "হ্যাঁ, একটা ভুল হয়েছে দেখছি।" তাতে বিনয় নেই, এমন কি তিলমাত্র মনোযোগ নেই।

সেদিন মাইনে নেবার কাউন্টারে মাথাটা আড়কাত করে তাদের অফিসের ক্যাশিয়ার মল্লিকবাবু বললেন, "কী সাহেব, কত জমলো?"

মল্লিকবাবু গোপালকে ব্যাঙ্কে টাকা রাখতে দেখেছেন। চাকরীতে ঢোকবার সময় গোপালের যে প্ল্যান ছিল তা এখন কাগজের প্ল্যান হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই প্ল্যান অনেকবার মনে মনে আওড়েছে গোপাল: পাঁচ বছরে খুব চেষ্টা করে হাজার দশেক টাকা জমাবে, তারপর চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে লেখাপড়া করা। আর যেহেতু টাকার জন্যে তাকে হন্যে হতে হবে না কাজেই ব্যবহারিক জগতের চাপ থেকে সে থাকবে মুক্ত। তার চিন্তার ওপর টাকার ছায়া পড়বে না।

পাঁচ বছরের মধ্যে প্রায় একবছর হতে চললো। গোপালের হিসেব মত অন্তত দু-হাজার টাকা জমানো দরকার। সে জায়গায় গোপাল জমিয়েছে পাঁচশো। এক সুদূর অদৃশ্য ভবিষ্যতের জন্যে এ ভাবে সঞ্চয় করবার চেষ্টায় হাঁফ ধরেছে তার।

মল্লিকবাবু নোটগুলো আলতো ভাবে দুবার গুণে গোপালের দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, "কী সাহেব, এত অন্যমনস্ক কেন? বিলেত যাওয়া হচ্ছে কবে?"

এ অফিসে কেন, প্রায় সমস্ত বিলিতি মার্কেণ্টাইল ফার্মে এই রেওয়াজ—একবার এদেশী অফিসারদের বিলেত ঘুরিয়ে আনা। বেশী না ছ মাস কি আট মাসের ব্যাপার। হেড অফিসের সঙ্গে যুক্ত থেকে কিছুটা কাজ, কিছুটা ওখানকার চালচলন আয়ত্ত করা। ফিরে এলে সাহেবদের সঙ্গে একটু একাত্ম হওয়া যায়। চায়ের পার্টিতে যাবার আহ্বান আসে। বিদেশ যাবার ব্যাপারে গোপালের যে খুব অনিচ্ছা তা নয় তবে নেহাৎ বিদেশ যাবে বিলেতফেরত 'বস্' হবার জন্যে, ভাবতেই তার হাসি পায়।

মল্লিকবাবুর প্রশ্নের জবাবে হ্যাঁ না গোছের কী একটা উত্তর দিয়ে সে সরে পড়ে।

অফিস থেকে ফেরার পথে চ্যাটার্জির সঙ্গে বেধে গেল গোপালের।

চ্যাটার্জি বিজ্ঞাপন বিভাগের সেজকর্ত্তা। সম্প্রতি বিলেত থেকে ফিরেছেন। মোটাসোটা বছর পঞ্চাশেকের মানুষ, নীচেকার গ্রেড থেকে ধীরে ধীরে উঠে বর্তমান পদে আসীন হয়েছেন। এদিক থেকে কম বয়সী ছোকরাদের রাতারাতি ভাল গ্রেড দিয়ে তাদের সমকক্ষ করে ফেলার বিপক্ষে তিনি প্রচণ্ড মত পোষণ করেন। সেদিন ঝগড়া বাধল অবশ্য অন্য কারণে—সমাজতাত্ত্বিকদের ভাষায় বলা যেতে পারে, আইডিওলজিকাল কারণে।

চ্যাটার্জি গত সাতদিন সারা অফিস তোলপাড় করে তুলেছেন বিলেতের প্রশংসায়। ইণ্ডিয়ার সঙ্গে বিলেতের তুলনা করেন যখন তখন সাহেবরাও সস্নেহে জানিয়ে দেন, "ওভাবে তুলনা কোরনা চ্যাটার্জি।" চ্যাটার্জি আরও চেঁচান। তাঁর সহকর্মী অফিসারেরা

কেউ কেউ বিরক্ত হন আর কেরাণীরা প্রায় প্রকাশ্যেই গালাগাল দেন।

গাড়িতে আরও কয়েকজন ছিল। অফিস থেকে বেরোতে না বেরোতেই মুখ ভার করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চ্যাটার্জি বললেন, "নাঃ ছেলেগুলোকে আর এখানে পড়ানো যাবে না।"

মিঃ বোস সঙ্গে ছিলেন। সাধারণত আলাপে তিনি যোগ দেন না। আজ চ্যাটার্জিকে একটু সায় দিয়েই বললেন, "তা এডুকেশন ব্যাপারে আপনার কথা ঠিক। এদেশের ইস্কুল কলেজগুলো হয়েছে একেবারে গোয়াল।"

চ্যাটার্জি বললেন, "আর শুধু ইস্কুল কলেজ কেন মশাই, আমাদের ন্যাশনাল লাইফ দেখুন। আমাদের ন্যাশনাল লাইফ আর ইংরেজদের ন্যাশনাল লাইফ। যাই বলুন ওসব প্যাট্রিওটিজম ফ্যাট্রিওটিজম, যদি জন্মাতে হয় একটাই দেশ আছে স্যর।"

মিঃ বোস দুতিনবার বিলেত ঘুরে এসেছেন, কাজেকাজেই চ্যাটার্জির মন্ত্রমুগ্ধ ভাবখানা তাঁর বোধ হয় খুব মনঃপুত হয় না। একটু দর্শন ঘেঁসে বলেন, "ওটা কোন জাত ফাতের ব্যাপার না মিঃ চ্যাটার্জি, এখন যা অবস্থা……"

চ্যাটার্জি উত্তেজিত হয়ে পড়েন। আগেও অনেকবার ভদ্রলোকটিকে দেখেছে গোপাল। বেশ ভারিক্কী কর্মপটু ভদ্রলোক। এখন একেবারে ছেলেমানুষের মত মিঃ বোসের মুখের সামনে হাত নাচিয়ে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, "আরে রাখুন মশাই অবস্থার কথা। এই দেখুন ইংল্যাণ্ড, কী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ট্রাম থেকে নেমে ট্রামের টিকিট-টা পর্যন্ত রাস্তার পাশে টুকরীতে ফেলছে লোক। এ আমরা পারি না? আমাদের এই বি-এ, এম-এ পাশ করা ছেলেরা, বলতে যান, একেবারে হৈ হৈ করে তেড়ে আসবে।"

একটু থেমে আবার সুরু করেন তাঁর ছমাসের বিদেশ যাত্রার কাহিনী। এমন ভাবে বলেন যেন কতকাল সেখানে কাটিয়েছেন। ফ্রান্সে গিয়েছিলেন, কিন্তু ফ্রান্সে তাঁর জুত হয় নি। তিনি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেছেন ফ্রান্সের লোক বিশেষ কেউ ইংরেজী বলে না। কথার শেষে আক্ষেপ করে বললেন, "আই ওয়াণ্ডার হাউ ফ্রেঞ্চ পিপল স্পীক ফ্রেঞ্চ ল্যাংগুয়েজ।"

গোপাল সীটের এক কোণায় ঝিমোচ্ছিল। চ্যাটার্জির শেষ কথাটায় অন্ধকারেও তার মুখে হাসির স্পষ্ট রেখা ফুটে ওঠে। আবার ঝিমোতে থাকে সে।

চ্যাটার্জি হঠাৎ বলে বসলেন, "নাঃ, ভাবছি বিলেতেই সেট্‌ল করব।"

কথাটা এত আকস্মিক যে ড্রাইভারের সীটের পাশ থেকেও আর এক ভদ্রলোক পেছন ফিরে তাকাল। গোপাল এক কোণ থেকে আস্তে আস্তে বললে, "খুব টেনেছেন নাকি ?"

চ্যাটার্জি আহত হন স্পষ্ট বোঝা যায়। এতক্ষণ চীৎকারের পর তাঁর অকস্মাৎ নীরবতা কানে লাগে। গোপালের দিকে ফিরে অত্যন্ত বেয়াড়া রকমের ভারী গলায় বললেন, "জানেন, আপনার নামে রিপোর্ট করতে পারি।"

গাড়ির মধ্যে মুহূর্তে এক বিশ্রী আবহাওয়া সৃষ্টি হয়। আগে হয়তো গোপাল এড়িয়ে যেত। কিন্তু এখন জ্বলে উঠে বলে, "আপনার স্ত্রী মেমসাহেবের মত ইংরেজী বলেন ?"

"সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তা নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করব না।" চ্যাটার্জি ইংরেজীতে বললেন।

"কিন্তু তাই তো আপনি করছেন। আপনিই তো সেটল করার কথা তুললেন। গত সাতদিন কতবার যে শুনলাম ট্রামের টিকিটের গল্প আপনার কাছ থেকে, কৈ আমরা তো চটিনি। আপনি কেন

চটছেন? মিসেস চ্যাটার্জিকে তো আমি দেখেছি। কেন বেচারীকে কষ্ট দেবেন বিলেতে নিয়ে? তাছাড়া আপনি নিজেই কি পারবেন ওখানে বেশীদিন থাকতে?" হঠাৎ সে চুপ করে যায়। ধীরে ধীরে বলে, "অবশ্য আপনার আগেও এ ভাবনা অনেকে ভেবেছে। আপনি চটবেন না আমার কথায়।"

কথা বলতে গিয়ে গোপালের রাগ পড়ে যায়। শান্ত, ভদ্র, মাঝ-বয়সী লোকটির এই বিকারে সে পীড়া বোধ করে। চ্যাটার্জির কথায় যেন তারই লজ্জা বেশী। তার দুঃখ আর রাগটা চ্যাটার্জি ছাড়িয়ে তার চারপাশের পরিবেশের ওপর গিয়ে পড়ে। নামবার সময়ও সে হাত তুলে বললে, "গুড নাইট মিঃ চ্যাটার্জি, রাগ করবেন না।"

তেইশ

গোপাল যতই নয়নের কাছে আসে ততই তার নিজের জগতের বেশ কিছুটা মেকী লাগে। যা তার সবচেয়ে প্রিয় স্বপ্ন, পাঁচবছর পর হাজার দশেক টাকা জমিয়ে সে এই মধ্যবিত্ত জীবিকার গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে নিজের মনের মত কাজ করবে, সে স্বপ্নও বেশ অবাস্তব ঠেকে। আগে সে এই টাকাটা দেখত মুক্তির সোপান হিসেবে, একটা উচ্চতর জীবনের খুঁটি হিসেবে। কিন্তু ক্রমশই সে উপলব্ধি করে এ খুঁটি যথেষ্ট নয়। এখন তাকে একদিকে কোন বিশেষ মানুষ আর একদিকে দশ হাজার টাকা দিলে সে বছর খানেক আগে যা করত তা নিশ্চয় করবে না। নয়ন যদি শুধু মাত্র মেয়েমানুষ হয়ে আসত তার কাছে, তাহলে সে নিশ্চয় লাফিয়ে থলি চেপে ধরত দশ হাজারের, তার আদর্শ মেটাবার তাগিদে। কিন্তু নয়ন মানেই এক জীবনধারা। আর এই জীবনধারা থেকে মুখ ফেরানো মানে মৃত্যু। তখন দশহাজার কেন পঞ্চাশ হাজারেও কিছু আসে যায় না।

নয়ন তাকে বলেছিল, "আমার তৃতীয় রাস্তা গোপাল—না ছেলে, না সেই লোক যার কাছে থাকতে চাই। আমাকে আমার নিজের জগৎ তৈরী করে নিতে হবে।"

গোপাল ভাবে নয়নও তো তারই সমাজের বাসিন্দে, বরং লেখাপড়া সুযোগ সুবিধে যা সাধারণ মেয়েরা এখন পেয়ে থাকে সে মাপকাঠিতে সেকেলে। তাহলে কোথা থেকে পায় সে এই মহাভারতের নায়িকা হবার শক্তি?

বাস থেকে নেমে গোপাল প্রায় ছুটতে ছুটতে বাড়ি পৌছোলো। ঘরে ঢুকেই সে জুতো জামা প্রায় ছুঁড়ে ফেলতে থাকে। তার এ রকম ত্র্যস্ত ভাব গুঞ্জারামের এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কোনরকমে এক কাপ চা খেয়ে স্নান করে উঠে কাপড়চোপড় পরে বেরোতে সাতটা বেজে যায়। সেদিন বড় বেয়াড়া খাটনি ছিল, একটু ক্লান্তি লাগছিল তার। তাছাড়া চ্যাটার্জির সঙ্গে বিরোধের জের সে মন থেকে একে-বারে মুছে ফেলতে পারছিল না। সমস্ত অবসন্নতাকে চাবকিয়ে সে রাস্তায় বেরোয়।

ঝিরঝিরে হাওয়া, কালীঘাট পার্কের সামনে দেবদারুর সারি রাস্তার আলোয় দুলছে। গোপাল জোর কদমে পা চালায়। সমস্ত শারীরিক ক্লান্তি তাকে পার হতে হবে। একদিকে অফিসের চাল আর একদিকে তার নিজস্ব মেজাজ এই দুমুখো জীবনের ভার বয়ে নিয়ে যেতে হবে আরও কয়েকটা বছর। তার আগে মাথা ঠিক রাখতে হবে। গোপাল ভাবলে স্প্রিং ডাম্বল আবার সুরু করবে, শরীর তাজা রাখতে হবে। ভোরে উঠে বেড়ালে ভাল হয়। যদি দিন চব্বিশ ঘণ্টায় না হয়ে ছত্রিশ ঘণ্টায় হোত তাহলে গোপালের পক্ষে কোন ভাবনা ছিল না। তা যখন হবার না, তখন আরো জোরে জোরে হাঁটতে হবে। রায় একদিন তার বাড়িতে গিয়ে বলেছিল, "আপনি দেখি এখনও মোটা-

মোটা বই পড়েন মশাই, আমিও পড়তাম এককালে। বুঝলেন, ইউনিভার্সিটির ভাল ছাত্র ছিলাম এখন…।” গোপাল প্রায় দৌড়তে সুরু করে। না, তার কিছুই ছাড়লে চলবে না, কিছুই ছাড়তে পারবে না সে। তার চাওয়া আরও বাড়াতে হবে। তারিণীবাবুর বাড়ির গলির মুখেই নদিদির ছেলে খোকার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। খোকা এক বন্ধুকে নিয়ে গানের আসরে চলেছে। গোপালকে দেখে কাছে এসে বললে, “কই, মাসিমা তো এখনও ফেরেননি শেলাইয়ের ক্লাস থেকে।”

“আচ্ছা, আমি একটু ঘুরে আসি।”

যতখানি স্বাভাবিক গলায় সে উত্তর দিল ততখানি স্বাভাবিক তাকে দেখায় না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কী ভাবতে থাকে। একবার রাগ হয় নয়নের ওপর। কথা দিয়ে কথা না রাখার বিরুদ্ধে নয়ন নিজে বড্ড সজাগ অথচ…। নয়নকে লক্ষ্য করে গোপাল খানিকক্ষণ কঠিন কথা বলার মহড়া দিলে। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়ায়।

ট্রাম থেকে যে সব মেয়েরা নামে তাদের মধ্যে কমবয়সীদের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করেই গোপাল চোখ ফিরিয়ে নেয়। অবশ্য তার বিচার নেহাত প্রেমিকের বিচার। গোপাল ভাবে, সামনে পেছনে সবই ঠিক আছে, কিন্তু আর কিছু নেই। আর কিছুটা কী? রং, চলন, গড়ন? তারপর নিজের মনে আওড়ালে “ক্যারেক্টার”, ‘চরিত্র’। চেহারায় চরিত্র থাকতে হবে, চেহারায় সমস্ত মানুষটা কথা বলবে। সে রকম চেহারা প্রেমিক গোপাল দেবের অবশ্য চোখে পড়ে না।

এ ভাবে বেশীক্ষণ দাঁড়ানো ঠিক না, লোকে কিছু ভাবতে পারে। গোপাল উল্টোফুটে হাঁটতে হাঁটতে বইয়ের স্টলের সামনে এসে দাঁড়ায়। দুটো বই আর ম্যাগাজিনের স্টল পাশাপাশি। একটাতে বিক্রি হচ্ছে প্রেমের বই, আর একটাতে দেশপ্রেমের বই। স্টলের ম্যাগাজিনের

পাতা আল্গাভাবে ওল্টাতে থাকে সে। এ দুই স্টলের লেখকরাও দুরকম, তারা পরস্পরকে বেশ হিংস্রভাবেই গালাগালি দিয়ে চলেছে। গোপাল বিরক্ত হয়ে রাস্তায় নেমে ভাবলে, এ দুটো ঘটনা কি একজনের জীবনে ঘটে না? মানুষ আর দেশে এতই তফাৎ?

সাড়ে সাতটা কিছুতেই বাজছে না। সাতটার পর আধঘণ্টা কেটে গেলে নয়নকে খুব বকতে পারবে এই ভেবে সে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করে। কিন্তু হঠাৎ চমকে ওঠে, যদি কোন বিপদ হয় নয়নের।

তার তো চাদর নিয়ে বুড়ীর মত না বেরোলে চলে না। যদি ট্রামের চাকায় জড়িয়ে—নাঃ বড্ড ভাবপ্রবণ কথা। ও রকম তো কলকাতার চল্লিশ লক্ষ লোক ট্রামের নীচে পড়তে পারে। তার জন্যে ছেলেমানুষের মত উদ্বিগ্ন হবার তো কোন কারণ নেই।

আর যখন নয়নের সঙ্গে তার আর দেখা হবে না—কথাটা হঠাৎ স্তম্ভিত করে দেয় গোপালকে। কয়েক মাস আগেও তো সে এভাবে ভাবেনি। নয়নকে সে প্রায়ই বলত তার নিজের একান্ত নিজস্ব দশ হাজারী জগতের কথা—যেখানে সে রাজা, জীবিকার জন্যে বর্তমান সমাজের মূল্যের কাছে নিজেকে বিক্রি করতে হবে না, এমন কি আর একটা কথাও ছিল, এ জগৎ এত নিজস্বভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ যে এখানে নয়নের স্থান হলেও কোন বিশেষ স্থান নেই।

তারিণীবাবুর বাড়ির দিকে যতই সে পা ছোট করে এগোতে থাকে ততই তার এক নতুন চিন্তা প্রবল হয়ে ওঠে। তার সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎ একটা ভড়ং। দূর থেকে তার অতিপরিচিত রংওঠা দরজার পাল্লাটা দেখা যায়। গোপাল কল্পনা করে নয়ন নেই। এ জায়গা থেকে নয়নের বাস উঠে গেছে। তাদের বাড়িতে গেলে নদিদি মোড়া এগিয়ে দিয়ে বলবেন, "বোসো বোসো, তোমাকে কি আমরা

একপেয়ালা চাও খাওয়াতে পারব না?" এত তীব্র জীবন্ত ভাবে ছবিটা ভেসে ওঠে চোখে যে গোপালের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। যেন এই মুহূর্তে পাঞ্জাবী হোটেলের একদিকে জড়ো করা ছাইয়ের গাদায় সে বসে পড়বে। পা লোহার মত শক্ত ঠেকে। ঘড়িতে দেখলে সাতটা পঁয়ত্রিশ। এখনই যেন এ রকম কোন অভ্যর্থনা তার জন্যে তৈরী আছে, ভাবতে ভাবতে সে পা গুণে গুণে এগোয়। আজকে যদি নয়নের সঙ্গে দেখা হয় তাহলে গোপাল তাকে সোজা বলবে, তাকে ছাড়া তার চলবে না, এজন্যে সে সব ঝুঁকি নিতে তৈরী। সে মস্ত দার্শনিক হতে চায়না, লেখক হতে চায়না, তা না হলেও সে বেঁচে থাকবে কিন্তু নয়নকে বাদ দিলে সে থাকতে পারবে না। আর নিজেকে ধিক্কার দিলে, তার দশহাজারী রাজত্বে কী এসে যায়? সে আর কিছু চায়না আর কিচ্ছুটি চায়না, খালি নয়নকে চায়। রাস্তায় দাঁড়িয়ে চীৎকার করতে ইচ্ছা করে গোপালের। পাছে মনে থাকে না, পাছে হারিয়ে ফেলে কথার ভিড়ে, তাই গলির মুখে দাঁড়িয়ে মন্ত্রের মত জপ করতে থাকে কথাগুলো।

হঠাৎ কার গায়ের বাতাস লেগে তার চটকা কেটে যায়। সে একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়েছিল। তার পাশাপাশি নয়ন এসে বললে, "যাক, এক সঙ্গে বাড়ি যাই চল। নিউ মার্কেটে গিয়েছিলাম। ফিরতে দেরী হয়ে গেল।"

নয়ন এই প্রথম তাকে তুমি সম্বোধন করলে। গোপাল ভাবলে এখনই বলবে কিনা। নয়নের হাতে কাগজের মোড়ক। কাগজের ভাঁজ দেখে বোঝা যায় ভেতরে ফুল আছে। নয়ন বললে, "যে রকম চেয়েছিলাম ঠিক সে রকম পেলাম না। সে রকম কালচে লাল ঠিক শীতকালেই ফোটে। খুব হয়রান হয়েছি। চল বাড়ি গিয়ে চা খাই।"

নয়ন হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে গোপালকে বললে, "কী হয়েছে? এত গম্ভীর কেন?"

তার চোখ খুশীতে উপছে পড়ছে, চুল উড়ছে হাওয়ায়, হাতে ফুলের মোড়ক নিয়ে সে মোষের গাড়ি আর লরির ভেতর দিয়ে পাশ কাটিয়ে যেন নাচতে নাচতে এগিয়ে চলে। সে আনন্দ গোপালের মুখেও সংক্রামিত হয়।

সেদিন আর বলা হয় না কথাটা। বলতে গেলে গোপালের ভয়, ছেলেমানুষি হয়ে যাবে। আর শুধু ছেলেমানুষি না, ছোট শোনাবে, হাল্কা শোনাবে। নয়ন একমনে রুটি বেলে আর গোপালের মন তোলপাড় করে। নয়নের তৃতীয় পথ কী? সে পথে গোপালের স্থান আছে কি? এমন ভাবে দুজন মানুষ পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে যেখানে তাদের মধ্যে কোন দেয়াল নেই আর যেখানে নয়নকে হাতের মুঠোর মধ্যে নিলেও নয়ন ফুরোয় না, সে অবস্থায় নয়ন তৃতীয় পথ নিলে গোপালের স্থান কোথায় হবে?

তাছাড়া তার এমন কী বহির্জগৎ যেখানে নয়নের স্থান নেই? এতদিন অবশ্য সে এই বহির্জগতের একটা চেহারা খাড়া করেছিল, এমন জগৎ যেখানে খাওয়া পরা শোওয়া একই লক্ষ্যের সূত্রে গাঁথা। আর সেই লক্ষ্য হোল কাজ,—মানুষের জন্যে লেখায়পড়ায় চিন্তায়। কিন্তু সে জগতের দাম কী যদি নয়নের মত লোক সেখান থেকে নির্বাসিত? তার মানুষের সঙ্গ কামনার ইচ্ছে কি সেই ভাবনাপ্রসূত ইংরেজীতে যাকে বলা হয় ইণ্টারেস্টিং কম্পানী। ইণ্টারেস্টিং-এর তো একটাই অর্থ ব্যবহারিক জগতে—চমকপ্রদ অথবা চটকদার। গোপাল দেব কি তার জীবনে সেই চটক খুঁজছে?

তা যদি না খোঁজে তাহলে কি সে আরো বড় যশের প্রার্থী, তার নিজস্বতায় সে কি মধ্যবিত্ত চিন্তাশীলতার উর্ধ্বে উঠতে চায়? কিন্তু

সম্প্রতি এ বাসনা গোপাল দেবের মগজে নাড়া দিলেও তা তার সমস্ত সত্তায় ছড়িয়ে পড়তে পারছে না কেন? কেন প্রাণহীন লাগে তার এই যশাকাঙ্ক্ষার চেষ্টা?

গোপাল নিজেকে তলিয়ে দেখেছে। সে যাই করুক, যেখানেই থাকুক, তার মূল লক্ষ্য হল আনন্দ। এ আনন্দ সে তার চলায় বলায় প্রত্যেকদিনের কাজ থেকে আহরণ করে নিতে চায়। মানুষের জীবনের সঙ্গে থেকে তার কষ্টের, তার হাজার রকম খিটিমিটির গায়ে গা দিয়ে সে তার এই লক্ষ্যে পৌঁছতে চায়। কাজেই দাঁড়িপাল্লার একদিকে তার যশাকাঙ্ক্ষা, তার দশ হাজার টাকার জগতের সাধনা রাখার পর নয়ন যদি তার হাল্কা শরীর নিয়ে আর এক পাল্লায় এসে ওঠে তাহলে নয়নের জিত রোখার মত শক্তি কারো নেই।

গোপাল হঠাৎ বললে, "মন, এখনও তো তারিণীবাবুর আসতে আধঘণ্টা দেরী। আর তুমি আমার কোলে শুলে নদিদির চোখ কপালে উঠবে। কিন্তু আমি তোমার কোলে শুই! তাতে তো কোন আপত্তি নেই।"

নয়নের কোলে মাথা রেখে গোপালের চোখে জল এল। এত প্রিয় একটা মানুষের সঙ্গে তার এত বড় ব্যবধান। আর এ ব্যবধান মেটাবার জন্যে এমন কতকগুলো 'যদি' আনচান করে ওঠে যে তারা দুজনেই অস্থির হয়ে পড়ে। যার কোলে শুয়ে আছে তার সঙ্গে যদি আরো বেশ কিছু বছর আগে এমনি ভাবে দেখা হোত কিংবা চার-পাশের জগৎ-নিরপেক্ষ নয়নকে পাওয়া যেত, এই অন্তহীন যদির তীব্র অদৃশ্য চাবুকে তারা আহত হয়, ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ে। যেখানে সম্ভাবনার সবচেয়ে বড় বীজ বোনা হয়েছে সেখানেই আবার সবচেয়ে বড় পাথর চাপা দেওয়া কেন? একথা চাপা থাকে না দুজনের কাছে।

নয়নকে এ ব্যাপারে বোঝা যায় না। গোপালকে সে একেবারে

ধাঁধিয়ে দেয় তার নিত্যনতুন আলোয়। যদির ধাক্কায় সে হকচকিয়ে যায়নি।

অন্ধকারে গোপালের মাথাটা আরো বুকের মধ্যেখানে টেনে নিয়ে নয়ন বললে, "আচ্ছা এমন যদি দিন আসে যখন তোমার সঙ্গে আমার ঘন ঘন দেখা হচ্ছে না—এতো আসবেই, খুব স্বাভাবিক—তখন যদি আমার বড্ড মন কেমন করে আর তোমার কাছে যেতে ইচ্ছে করে—"

গোপাল দুহাত দিয়ে নয়নের গলা জড়িয়ে বললে, "আমি যেখানেই থাকি, যে ভাবেই থাকি, তুমি মন আসবে, আসবে আসবে।"

"তুমি যখন তোমার ছেলেমেয়ে নিয়ে…"

"হ্যাঁ হ্যাঁ তখনও।"

নয়ন ধীরে ধীরে বললে, "ছ্যাখো তোমার কাছে মিথ্যে বলব না। তুমি আমাকে অনেক শক্ত হবার কথা বলেছো, আমিও খুব চেষ্টা করি। তবু তোমায় না দেখলে বড্ড কমজোর লাগে। কিন্তু তুমি আমায় দেখো। তোমাকে তো অনেক জায়গায় যেতে হবে, অনেক কাজ করতে হবে। এখানে না বলো না তুমি। আমার জন্যে তোমার জগৎকে ছোট করবে, এ আমি কখনই হতে দেব না। কিন্তু তখনও আমাকে—তুমি যে বিচ্ছিরি কথাটা বলো,—ন্যাতা না কি,—তা কখনও হতে দেখবে না। তা বলে কি আমার চুল পাকবে না। মাথা ভর্তি চুল পেকে যাবে আর কয়েক বছরের মধ্যেই। কিন্তু আমি আমিই থাকব!"

গোপাল ধারণা করতে পারে তাদের দুজনের মেজাজের যোগসূত্র। নয়ন সারা জীবন ধরে কতকগুলো চাওয়া জিইয়ে রেখেছে, তাদের অপমানিত হতে দেয়নি। তার সাংসারিক জীবন তার বাইরের জীবন বলতে একমাত্র ছেলেবেলায় বাপের সঙ্গে কিছু ঘোরাফেরা ছাড়া আর বেশী কিছু সে পায়নি। কিন্তু এই না পাওয়ার দরুণ তার চাওয়ার মান

ক্ষুণ্ণ করেনি। হেলায়নি নিজেকে। নয়ন একদিন বলেছিল, "বিছানার নীচে কুশ রাখি, রাজত্ব ফিরে না পাই রেখে যাব।"

আর গোপাল নিজে? গোপালেরও চাওয়ায় স্বাতন্ত্র্য আছে। সে যেমন কবি-কেরাণী নয় তেমনি মার্কেণ্টাইল ফার্মের সাহেব নয়, আবার রাজনৈতিক কর্মী নয়। সে যা চেয়ে এসেছে তার কোন পাইকেরী সমাধান সম্ভবও নয় হয়তো। কিন্তু যে মধ্যবিত্ততার সঙ্গে তার যুদ্ধ তার সঙ্গে নেহাত জনপ্রিয়তার খাতিরে সে আপোষ করতে পারবে না, কোন ভাবেই নয়। এমন কি অত্যন্ত সাহেবীঘেঁষা হয়ে যে হালফ্যাশানী মধ্যবিত্ততার উদ্ভব হয়েছে গত কয়েক বছর, সে রকম কোন সস্তা আপোষে সে বাঁচতে পারবে না।

বাড়ি ফিরে গোপাল ফুলের মোড়ক খুললে। বারোটা লাল টকটকে গোলাপ ফুল। মধ্যেখানে নয়ন নিজের হাতের একটা সাদা ফুল গুঁজে দিয়েছে।

নয়নের কাছে একটা কথা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে: তার এক সিদ্ধান্তের দিন এগিয়ে আসছে। নিজেকে অস্বীকার করে তার চল্লিশটা বছর পার করে দিল। কিন্তু যখন সে জেগে উঠেছে তার সমস্ত সত্তা দিয়ে, তার বাল্য কৈশোর যৌবনের সমস্ত তীব্রতায়, তখন আর মরতে সে পারবে না। এতগুলো বছর সে চেষ্টা করেছে দাঁতে দাঁত দিয়ে আদর্শ বউ হতে। পারেনি। ছেলেদের জন্মের পর থেকে তাদের নিয়ে আছে, বিশেষ করে অন্তুর সঙ্গে পিঠাপিঠি সে নিজেও মানুষ হয়ে উঠেছে গিন্নীবান্নিদের জগত থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে। মান্তা তার বাপের কাছেই মানুষ, একেবারে ছেলে বেলা বাদ দিলে সে অন্যরকম। তার জন্যে নয়নের খুব ক্ষোভ নেই। তার ক্ষোভ, গোপালের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ ছেঁটে ফেলে নেহাত বাহাদুরীর জন্যে মা হওয়ায়।

বাহাদুরীতে কিছু আসে যায় না। নয়ন লক্ষ্য করে দেখেছে গোপাল একটা ছল মাত্র। গোপালকে তার ছেলেরা পছন্দ করে। অপছন্দ করে তার মেজাজ, তার চিন্তাধারা।

ঠিক যে কারণে তার স্বামীর সঙ্গে ঠিক সেই কারণে ছেলেদের সঙ্গে তার ব্যবধান আর শুধু ব্যবধান বললেই যথেষ্ট হয় না, এ ব্যবধান মিটবে কী করে তার সম্বন্ধে কোন ধারণা তার নেই। অন্তু বদলায়নি। কলকাতায় বাসা বাঁধার পর রোজ মার জন্যে সন্দেশ এনেছে। খেতে অস্বীকার করলে কুরুক্ষেত্রে বাধিয়েছে। কয়েকমাস পর দেনার দায়ে পড়েছে অথচ নয়নকে তার হিসেবনিকেশ দেবার প্রয়োজনও মনে করেনি। নয়ন তো প্রাণপণে চেষ্টা করেছে তাকে বাঁচাতে, রান্নার হাতা না থাকলে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ডাল রেঁধেছে, টুঁ শব্দ করেনি। কিন্তু ক্রমশই সে এখন টের পাচ্ছে অন্তুর পুনর্জন্মের কোনরকম সম্ভাবনা নেই। এ অন্তুর ইচ্ছামৃত্যু।

ছোট ছেলে মান্তার ভেতর অনেক সময় তার বাপ ভেসে ওঠে। অন্তুর তরফ থেকে সে এতকালে পেয়েছিল অতিবৃষ্টি, ছোট ছেলের কাছ থেকে আসে অনাবৃষ্টি। সে পরীক্ষার পড়া ছেড়েছে। একটা গানের ট্যুইশানি করে আর অন্যসময় দরজাবন্ধ করে যোগ করে। পৃথিবীর সমস্ত কিছুই তার কাছে অশ্লীল। একদিকে অন্তুর নরম ত্যাকতেকে অবসন্নতা, আর অন্যদিকে মান্তার চোয়াড়েমি, অনেক সময় প্রায় হিংস্রতা —এ তার স্বামীর জগতের আর এক সংস্করণ বলেই নয়নের মনে হয়। আর এই জগতে যখন হাঁফিয়ে দমবন্ধ হয়ে তার মরে যাবার জোগাড় হয়েছিল তখন গোপাল এসেছে, এসেছে একেবারে প্রাণধারণের নিঃশ্বাস হয়ে। সেই গোপালকে পর করতে হবে নেহাত একান্ত ভাবে ছেলেদের সঙ্গে থাকবার জন্যে, এরকম বাহাদুরী করতে তার মন সরে না।

আর তাও নয়ন ভেবে দেখেছে, যদি গোপালের সংস্রব ত্যাগ

করলেই মাস্তা অন্তর পরিবর্তন হোত, অস্বাভাবিকতা কেটে শক্ত জলজলে ছেলে হয়ে উঠত—যার জন্যে নয়ন মনপ্রাণ এক করে সাধনা করেছে,—তাহলেও মানে হোত। কিন্তু নয়ন তলিয়ে দেখেছে। শুধু গোপালকে ছাড়া নয়, তার নিজের মেজাজ, তার চরিত্র, তার সব কিছু অস্বীকার, এককথায় সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন—কেবল এই ভিত্তিতে সে মা হতে পারে। আর সে তা পারবে না। আত্মবিলোপের ভিত্তিতে সে বৌ হতে পারেনি, মা হতেও পারবে না।

পরদিন সন্ধেবেলা গোপাল নয়নকে বললে, "মন, আমার জন্যে তোমার সংসার ভেঙ্গে যাবে এ হতে পারে না।"

নয়ন হাসল। সে হাসিতে বিষাদ নেই, অবসন্নতা নেই, অত্যন্ত ধীরস্থির বুদ্ধিতে দীপ্ত সেই হাসি। বললে, "এ তো ভদ্রতার কথা গোপাল, এ কথা কেন?"

গোপাল বললে, "না মন, এখানে আমার বলতে ভয় হয়। তুমি আমায় ধাঁধিয়ে দিয়েছ, মানুষের কাছে আসবার চেষ্টা করে আহত হয়েছি, বিরক্ত হয়েছি, তুমি সে সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে দিয়েছ। কিন্তু এর জন্যে তোমার কোন ক্ষতি স্বীকার করতে হবে, ভাবতেও আমার কষ্ট হবে।"

"তা হোক না, সারাজীবন তো হাবুডুবু খেয়েছি, লাভ অবশ্য আছে।" নয়ন তীর্যক ভঙ্গীতে একবার চাইলে গোপালের দিকে, "আর সে লাভ যে কত বড় তা যতই ভাবি—আর সব কথা ভুলে যাই।"

"কিন্তু মন, তুমি যে মা, একথা আমি তো খুব বুঝি না। কিন্তু তোমার কাছে—"

"আমার কাছে কথাটা খুব সাংঘাতিক, একেবারে বিঁধছে, দিন রাত্তির বিঁধছে। কিন্তু তার চেয়েও আর একটা ব্যাপার আছে, সেটা তোমার আসার আগে বুঝতে পারিনি।"

নয়নের কথায় কোন আফশোষ নেই, তাপ নেই, অসহিষ্ণুতা নেই। সে যেন তার অতলস্পর্শী চোখ দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে তার গত চল্লিশ বছরের দিনরাত্তিরগুলোর দিকে। গোপাল আস্তে আস্তে বললে, "সেটা কী মন ?"

"আমি যে মানুষ গোপাল, আমি যেখানে নিঃশ্বাস নিতে পারি না আমার সেখানে মা হওয়া, বৌ হওয়া, কোনটাই হয় না গোপাল।"

গোপাল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে, "তাহলে তো একটা ব্যবস্থা করতে হয়।"

নয়ন হাসল,—তার সেই ধারালো উজ্জ্বল হাসি, যে হাসি চোখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে হাসতে হয়। গোপালের ডান হাতটা তার বুকের ওপরে রেখে বললে, "আমার দায়িত্ব আমাকেই নিতে হবে।"

"কিন্তু তার জন্যে তো তোমায় তৈরী হতে হবে মন।"

"আমি তৈরী।"

নদিদি মেয়ের বাড়ি তদারক করতে গিয়েছে। বৈঠকখানায় তারিণীবাবু তার মার্টার মক্কেলদের নিয়ে ব্যস্ত। নয়ন অদ্ভুত ভাবে ঘর খানার দিকে তাকায়। সত্যি এই কারাগারেই তার জাগরণ। সে যা যা ভেবে এসেছে তার একটাও হয়নি তার জীবনে, কিন্তু যা হয়েছে তা ভাবেনি।

নয়ন গোপালের চুলগুলোয় হাত বুলোতে বুলোতে বললে, "তুমি যে আমায় সেদিন বলেছিলি, তুমি আমার কে ? আর আমি তোমায় যে উত্তর দিয়েছিলাম তা নিশ্চয় তোমার মনের মত হয়নি। কিন্তু এখনও বলছি, এত শ্লোক ফ্লোক আওড়াই, তাও জানিনা। ছেলেবেলা থেকে এ বাড়িতে এত ধর্মের ঘটা, আমার আশ্রমবাসিনী হওয়া, আবার ছোটমামা, কিন্তু কোন ধারণা ছিল না। এত কাণ্ডর পর তুমি এসেছো।

আর তুমি হাসবে, তোমার পাগলের প্রলাপ বলে মনে হবে, কিন্তু তুমি আমার ভগবান। আমার কোন আফশোষ নেই, ক্ষতি নেই। তুমি আমায় যেখানে যেতে বলবে সেখানে যাব। যা করতে বলবে তাই করব।" তারপর হঠাৎ চোখ নামিয়ে বলে, "তবে আমি নিজেকে চাপাব না তোমার ওপর, কিছুতেই না।"

গোপালের মনে হয় সে একটা গান শুনছে আর এমন গান যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে ঠোঁট কুঁচকিয়েছে, তার ভয় হয়েছে অবাস্তব বলে। কিন্তু এখন সে একেবারে তন্ময় এ গানের স্বরে। এ গানের প্রসঙ্গ সে যে শোনেনি তা নয়। বরং শুনে শুনে সে এতদিন জ্বলে উঠেছে। মনে হয়েছে এ ভাঁওতামিতে কী লাভ? যা জীবনে ঘটে না তা চাওয়া কেন? চারদিকের গ্লানি আর অহরহ মৃত্যুকামনার মাঝখানে বসে সেই দিব্য সঙ্গীতের কথা মনে উঠতেই সে শক্ত করে তার মনের ডালা চেপে ধরেছে। ব্যঙ্গ করেছে নিজেকে, ধাক্কা দিয়েছে। রং দিয়ে বলেছে মনে মনে, মানুষের কুষ্ঠ হলে গোলাপে কী এসে যায়! কিন্তু এ ঘটনাটা যে তার সামনেই ঘটছে, আর একেবারে চোখের ওপর। একে তো অস্বীকার করা যায় না। বলা যায়না তুমি নেই, তোমার বিরাটত্ব কিছু নেই। তাহলে তো তার চোখ বুঁজে বলা হবে। একথা মনে হতেই এক অতলস্পর্শী গভীরতা গোপালকে স্পর্শ করে। তার গত একবছরের সাহেবী অফিসের অভিজ্ঞতা, তার চারপাশের মানুষের মধ্যে সামাজিক সত্তার অনুপস্থিতিতে তার অহরহ পীড়া, এ সমস্ত ছাপিয়ে নয়ন তার জীবনে এসেছে। আর নয়ন তার সহস্র রকম খিটিমিটি, তার সমস্যা, তার অবরুদ্ধ পরিবেশ নিয়ে এত সত্য ও জীবন্ত যে গোপালের মনে হয় তার হৃদয়ের ঠিক মধ্যে খানটায় সমস্ত আবর্জনা ঝাঁট দিয়ে সে আসন করে নিয়েছে। হঠাৎ তার অফিসের ক্যালেণ্ডারটার কথা মনে পড়ে। কোনারকের

গাঁথুনীদের জ্বলন্ত সাক্ষী সেই ঘোড়ার ছবিখানা যেন লাফিয়ে তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

নয়নের বুকে মাথা রেখে গোপাল ধীরে ধীরে বললে, "তুমি যেখানেই যাও মন, তুমি আমার কাছেই থাকবে।"

চব্বিশ

গোপাল চলে যাবার পর নিখিল এল। নিখিল গোবিন্দ ভজনা করে। দূরে সরে গেলেও একেবারে সরে যেতে পারেনি। তারিণীবাবুর বাড়ীতে নিখিল নারীত্রাণকর্ত্তা হতে সব সময় উৎসুক। অনেক অনাথ দুঃস্থ মেয়েদের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। নয়নকে প্রায়ই বলত, "কেন মিছিমিছি ছেলেদের নিয়ে সংসার করার চেষ্টা করছ। তুমি যদি বল তাহলে কি চেষ্টা চরিত্তির করে একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় না?"

ব্যবস্থার মধ্যে কলকাতা এবং তার উপকণ্ঠে যে কয়েকটি নারী সমিতির সঙ্গে সে সংশ্লিষ্ট সেখানে ভর্তি করে দেবার ব্যবস্থা তার কিছুটা আয়ত্তের মধ্যে। নয়ন এতদিন কান দেয়নি। ছাত্রীনিবাস কি ঐ জাতীয় হোস্টেলধরণের হলে না হয় সে বলত। কিন্তু এখানে নিজের নিজের জীবনধারার সম্বন্ধে অধিবাসিনীদের কোন বক্তব্য নেই। এসব জায়গায় আশ্রমের মত নির্বাসন না হলেও অনেকটা তাই। এখানকার বাসিন্দাদের একমাত্র বিশেষণ তারা অনাথা। লেখাপড়া শিখে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে নিজেরা স্বাবলম্বী হয়েছে কিংবা ঘর সংসার বেঁধেছে এরকম কেউ যে নেই তা নয়। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের সঙ্গে চারপাশের বহির্জগতের কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নেই।

নয়ন ঠিক এ ধরনের মাথা গোঁজার আস্তানা চায় না। সে চায় নিজেকে নির্ভাবনায় তৈরী করে নেবার মত একটা জায়গা, যেখানে

নিজের খাওয়া পরা চলাফেরায় নিজের স্বাতন্ত্র্য থাকবে, স্বাধীনতা থাকবে।

নিখিল আগে যতবার চাপ দিয়েছে ততবারই সে গা করেনি। তাগিদ আসেনি এই ধরনের নতুন কলেবরে এক আশ্রমের জন্মে। কিন্তু ক্রমশই সে ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে পড়ছে। সে আর মাথা নীচু করে থাকতে পারবে না! ছেলেদের সঙ্গে থাকলে কুরুক্ষেত্র। তারিণীদার বাড়ীতে কোন অসুবিধে নেই। শুধু চারবেলা রান্না আর নদিদির অন্যান্য ফাইফরমাস খেটে যেটুকু সময় পাওয়া যায় তার মধ্যেই নিজেকে তৈরী করে নেবার ব্যবস্থা। তবে সেও এক কারাগার। পিওদিদির মত যে কেউ সেখানে আসবে সকলেই তাকে সহানুভূতি জানাবে, সকলেই বলবে নয়নের এত সাধ ছিল, অথচ মিটল না। কিংবা ছোটমামার মত কেউ কেউ নয়নের কথাবার্তায় কোন উচ্চতর আধ্যাত্মিক জীবনের ইঙ্গিত খুঁজবে, এসব কথা শুনতে শুনতে সে যখন একেবারে পাগল হয়ে যায় তখন গোপাল এসে দাঁড়ায় তার কাছে। তার সমস্ত গ্লানির পাঁক পেরিয়ে সে সোজা তার দুহাত বাড়িয়ে দাঁড়ায়। আর নয়ন যেমন এই কারাগারেই মুক্তির স্বাদ পায় তেমনি গোপালের দরুণই এই কারাগারে অস্থির হয়ে পড়ে। তার ভয় হয় গোপালকে নামানো হচ্ছে টেনে, নিজেকে নামানো হচ্ছে টেনে। নিজেকে এবং নিজের প্রিয় লোককে এই ক্ষয়ের রাজত্বে এক মুহূর্তের জন্মেও রাখতে তার সমস্ত চেতনা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

এই রকম যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতিতে নয়ন শুধু হরিপদ কেরাণী তার আকবর বাদশার ভেতর একটা মিল খুঁজে মানুষ মানুষই থাকে যে কোন অবস্থায়, এই সুন্দর কবিতা আপ্তবাক্যের মত মেনে নিতে পারে না। তার মনে এমন ঝড় ওঠে যে তাকে শান্ত করবে কী করে ভেবে দিশেহারা হয়ে যায়। অথচ গোপাল যদি তাকে এখনই ডাকে

তার জীবনের সঙ্গে তাকে যুক্ত হওয়ায় জন্যে তখনও সামাজিক বিধির দোহাই বাদেও আর একটা মস্ত বড় দোহাই থেকে যায়। সে কি নিজেকে তৈরী করে নিতে পেরেছ? শুধু আর্থিক স্বাবলম্বিতার অর্থেই নয়, সব দিক থেকে, গোপালের সঙ্গিনী হবার জন্যে?

এ চিন্তা আশ্চর্য লাগে নয়নের নিজের কাছেই। কয়েক মাস আগেও সে ঠিক এ ভাবে চিন্তা করেনি, করতে পারেনি। কোথা থেকে এই সিংহীর উৎসাহ উঠেছে তার বুক ঠেলে? তাকে গোপালের সঙ্গিনী হতে হবে, আরও গভীর ভাবে, আরও জ্ঞানের ভিত্তিতে, একথা তার বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়ার মত ঠেকে না। কিন্তু এজন্যে সে আছড়িয়ে পড়তে পারবে না গোপালের ওপর। তাহলে যে সে এতটুকু হয়ে যাবে। তাকে অপেক্ষা করতে হবে, হয়তো শেষ পর্যন্ত সে যে পূর্ণতা চায়, তা পাবে না। তাও মোটেই অসম্ভব নয়। কিন্তু পুর্ণতার জন্যে প্রতীক্ষা করতে হবে। তার জন্যে যে যন্ত্রণা তা ভোগ করবে সে।

ঠিক এই কারণেই নিখিলকে সে আবার নতুন করে ডেকে পাঠিয়েছিল। নিখিল বললে, "তোমার যে শেষপর্যন্ত সুবুদ্ধি হল এই যথেষ্ট। আর কতদিন এভাবে চালাবে! সেখানে তাঁত, শেলাই, বেত সব কাজ শেখানো হয়। গানটা অবশ্য হয় না। তা না হয় গান না-ই করলে।"

"না, গান ছাড়লে আমার চলবে না"

নিখিল বললে, "তোমায় দেখে আশ্চর্য হয়ে যাই ছোড়দি। ছেলেবেলা থেকে দেখছি, তোমার চাওয়াটা একপয়সাও কমালে না।" তারপর একটু চিন্তিত হয়ে বললে, "কিন্তু ঠিক স্বামীপরিত্যক্তা যাদের বলে তাদের ওরকম গানবাজনা···"

নয়ন তার কথার মাঝখানে তীক্ষ্ণস্বরে বললে, "স্বামীপরিত্যক্তা কে?

আমিই তো ছেড়ে এসেছি। নইলে তার দিক থেকে ওরকম হিঁচড়ে হিঁচড়ে জীবন কাটানোয় তো কোন আপত্তি ছিল না।"

নিখিল মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, "তাহলে ফর্মে কী লিখব ?"

"কেন, ফর্মে এ সব লিখতে হয় নাকি ?"

"বাঃ লিখতে হয় না ! তুমি একেবারে নিঃস্ব, রিক্ত, অনাথ না হলে, একেবারে সব দিক থেকে বিপন্ন হয়ে না পড়লে, মানে একেবারে তোমায় কেউ দেখবার নেই শোনবার নেই···" নিখিল থেমে যায়।

নয়ন হেসে বললে, "একেবারে রাস্তায় না দাঁড়ালে আমার সেখানে স্থান নেই, এই তো ?"

নিখিল লজ্জা পেয়ে বললে, "না মানে, সেই জন্যেই তো আমি আগে বলেছিলাম তুমি ঠিক এ পর্যায়ে পড় না।"

"ঠিক পড়ি। তার চেয়ে আমার কোন আলাদা পর্যায় নেই," নয়ন ধীর ভাবে বললে।

নিখিল গত কয়েক বছরে যে সব মেয়েদের ত্রাণ করেছে তাদের কথা একে একে ভাবতে থাকে। সে অনুভব করে তার পরিচিত অনাথাদের সঙ্গে এ রাজমহিষীটির মেজাজের কোন মিল নেই। নিখিল ভাবে, যে কারণে এখানে হাঁফিয়ে ওঠে ছোড়দি সে কারণ তা সেখানেও আছে। তবে হয়তো এখানে একজনের গ্লানির খোঁচাটা বেশী। সেখানে এক সার্বজনীন গ্লানির আবহাওয়ায় অনেক ব্যাপার বোধ হয় হাল্কা হয়ে যায়।

নিখিলের মুখের দিকে তাকিয়ে নয়নে বললে, "না রে নিখিল, তোর অত ভাবতে হবে না। এখন তো যাই। তারপর দেখা যাবে।"

"তাহলে কি একবার বিরাজমোহিনী দেবীকে বলব ?"

"হাঁ বল।"

বিরাজমোহিনী দেবী হলেন বাগবাজারের "বিদ্যাপীঠ, প্রতিষ্ঠিত ১৯১৪"এর কর্ত্রী। কলকাতা আর তার উপকণ্ঠের অনেক দুঃস্থা অনাথাদের তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। অনেককালের পুরোণো রংওঠা একখানা দোতলা বাড়ী। মস্ত বড় কম্পাউণ্ড। সাত থেকে সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত প্রায় দুশো মেয়ের বাস। তাঁত, সেলাই, বেত, চামড়ার কাজ শিখিয়ে আর এই সব জিনিষ সরকারের কাছে বিক্রি করে কলকাতার কয়েকজন বদান্য লোকের দানে সমিতি চলে। বছরে একবার করে সেখানে উৎসব হয়। গভর্ণর এসে মেয়েদের কাজকর্মে খুশী হয়েছেন বলে বক্তৃতা দেন। মেয়েরা নিজের হাতে সিঙ্গাড়া নিমৃকি রসগোল্লা বানিয়ে অতিথিদের সামনে থেকে দূরে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কলকাতার কয়েকটা নামজাদা ঘরের হিতৈষিণীরা নারী কল্যাণকর্তব্যে এখানে এসে নিমকি খান।

নয়ন সবই জানে। ছেলেবেলায় মফঃস্বল অঞ্চলে সেও তো ফ্রক পরে বাবার হাত ধরে লাফাতে লাফাতে এরকম উৎসবে যোগ দিয়েছে। দূরে আড়ষ্ট মেয়েদের দিকে তাকিয়ে তখন কি কোনদিন ভাবতে পারত যে তাকেও একদিন এদের দল ভারী করতে হবে।

কিন্তু নয়নকে মেনে নিতে হবে। অন্তত বিদ্যাপীঠ তার ছেলেদের আস্তানার চেয়ে কিংবা নদিদির পরিবেশ থেকে ভাল। সে যে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে সেটাও অন্তত সে নিজে জানুক। আর তাছাড়া তার নিজের চাওয়া সে সত্যিই একপয়সা নামাতে পারবে না। বিদ্যাপীঠ যদি গারদই হয়,—নয়ন অস্পষ্ট ভাবে ধারণা করে কালো পুরু লোহার রড দেওয়া ফটক, দারোয়ান দাঁড়িয়ে—তাহলেও সে জানবে গারদে আছে। কিন্তু এরকম আত্মীয়তার ফুল-বিছানো কারাগার অসহ্য।

সে এবার জোর দিয়ে বললে, "হ্যাঁ, তুমি এবার বিরাজমোহিনীকে বলে এসো।"

নিখিল চিন্তামুক্ত মনে হল না। তাহলেও সে নয়নকে চেনে। নয়ন যা একবার সিদ্ধান্ত করেছে তা থেকে তাকে টলানো মুস্কিল। দুহাজার মাইল দূরে একেবারে অপরিচিত আশ্রমে যাবার জন্যে যখন তাকে টিকিট কেটে দেওয়া হল এবং একটি লোকও তার সঙ্গী হল না তখন তাকে দেখেছিল নিখিল। যে কোনদিন একলা রেলে চড়েনি সে এই দীর্ঘ যাত্রা আর অপরিচিত ভাষার জগতে যাবার কথায় একবারও পিছপা হয়নি। উঠতে উঠতে নিখিল বললে, "আচ্ছা আমি তাঁকে বলব।" তারপর নয়নকে একটু বাজিয়ে নিল, "তুমি আবার মত পাল্টাবে না তো?"

নয়ন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে ফিরে বললে, "সে তুমি পরে দেখো।"

নিষ্ঠা ও রুক্ষতায় মেশা বিরাজমোহিনীর চেহারা প্রথম দৃষ্টিতেই চোখে পড়ে। বছর সত্তরের কাছে বয়স। একটুও নুয়ে পড়েনি শরীর। রোল্ডগোল্ড ফ্রেমের চশমার ভেতর থেকে তাঁর চোখজোড়া এখনও উজ্জ্বল। তবে খুব শুকনো চেহারা। বিদ্যাপীঠের বাসিন্দাদের মতে তিনি প্রায় হাসেন না। অন্যে তাঁর সামনে হাসলে তাঁর ভুরু কুঁচকে যায়।

দুদিন পর যখন নয়ন নিখিলের সঙ্গে বিরাজমোহিনীর কামরায় হাজির হোল তখন একদৃষ্টিতে তার আপাদমস্তক দেখে ফর্মের কাগজখানার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে তিনি বললেন, "এই যে, এখানে ফাঁক রয়েছে। এখানে তো কিছু লেখা হয়নি।"

বিরাজমোহিনীর কথায় নয়ন মাথা তোলে। তার চিবুক থেকে চোখের পাতা পর্যন্ত একটা দৃঢ়তার ছবি। বিরাজমোহিনীও একটু কৌতূহলী হয়ে তাকালেন সেই দিকে। নয়ন ঘাড় ফিরিয়ে প্রশ্নকর্ত্রীর মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে বললে, "আমার স্বামী তো আমায় ত্যাগ করেননি, আমিই ছেড়ে এসেছি। কী লিখব ফর্মে?"

বিরাজমোহিনী আশ্চর্য হন। স্বামী ত্যাগ করে বেকায়দা অবস্থায় কিছু কিছু স্ত্রীলোক যে তাঁর কাছে আশ্রয় চায়নি এমন নয় কিন্তু নয়নকে তাদের সঙ্গে মোটেই এক করা যায় না। নয়নের চেহারায় চালচলনে এমন একটা কী আছে যার ফলে তাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করালেও লোকে তার দিকে ফিরে তাকাবে। আর সে তাকানোয় শুধুমাত্র টিটকিরিই থাকবে না।

নিখিল তাড়াতাড়ি বললে, "ওঁদের মধ্যে মানে ঠিক বনিবনা ছিল না।"

বিরাজমোহিনী ফর্মটা পিনে গাঁথতে গাঁথতে বললেন, "কী কী শেখা আছে?"

"ঠিক শেখা নেই কিছুই তবে গান আর শেলাই···"

বিরাজমোহিনী বিস্মিত হয়ে বললেন, "গান শিখছেন, এই বয়সে?"

"হ্যাঁ, তারের বাজনাও একটা শেখবার ইচ্ছে আছে। সুরু করে-ছিলাম বেশী দূর এগোয়নি।"

বিরাজমোহিনী বিরক্ত হয়ে বললেন, "না না, গানটান এখানে চলবে না। যদি তাঁত চালাতে পারেন তবে এখানে আসবেন।" তারপর নিখিলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এখন তো একেবারে তিল ধারণের জায়গা নেই। আপনি বরং ওঁকে সামনের মাসের প্রথমে নিয়ে আসুন। আমাদের একটি মেয়ের খুব বাড়াবাড়ি অবস্থা। বুকের অসুখ। একটা সীট খালি হতে পারে, তখন আসবেন।"

পঁচিশ

সেদিন অফিসে ঢুকতে না ঢুকতেই ম্যাকমোহনের সঙ্গে গোপালের দেখা। গম্ভীর মুখ করে ম্যাক বললে, "অফিসের পর আমার সঙ্গে

দেখা করো।" সাধারণত সে যে ভাবে মিষ্টি করে হেসে কথা বলে সে চালে বললে না।

সন্ধের পর চৌরঙ্গীর এক চায়ের দোকানে গিয়ে ম্যাক প্রথমেই বললে, "তুমি কি চাকরী করতে চাও গোপাল, না চাওনা?"

"কেন, তোমাকে আমার ওপর খবরদারী করতে কেউ হুকুম দিয়েছে?" গোপাল রেগে উঠে বললে।

"না দেয়নি, নেহাত বন্ধুভাবেই তোমাকে সাবধান করছি। ম্যানেজমেণ্ট বদলিয়েছে। এখন বছরের তিনমাস যেতে না যেতে আমাদের একবার যাকে বলে ষ্টক্-টেকিং নেওয়া হয়। এই সময় যাদের ইনক্রিমেণ্ট হবার হয়, আর অন্য যা ব্যাপার—"

"তোমাকে আমার জন্যে ভাবতে হবে না।"

ম্যাক আহত হয়। সে সত্যিই চেয়েছে গোপালকে সাহায্য করতে। গত কয়েকমাস ধরে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে গোপাল যে ভাবে কাজ করে যাচ্ছে তা অসাবধানী চোখেও এড়িয়ে যাবে না। গোপালের কাজ সে জানে, ভুল করবার ছেলে সে নয়। আর তাছাড়া যে বিদ্যের দরকার এ চাকরীতে তার কিছুই ঘাটতি নেই গোপালের। পনেরো বছর এ লাইনের অনেক দেশী বিদেশী রুই কাতলার সঙ্গেই মেলোকাত হয়েছে তার। ম্যাকমোহনের মতে বড়সাহেব হতে গেলে নেহাৎ দরকার কমনসেন্স। গোপালের কথা ভেবে সে একবার নিজের কথাও ভাবলো। নিজে নির্ভেজাল সাহেব নয় আবার মুখার্জি নয়, এ জন্যেই তার সমস্যা।

চুপ করে তারা দুজন চা খেতে থাকে। গোপালের মনে পড়ে ক্যালকাটা ক্লাবের সেই রাত্তিরের কথা যখন ক্ষণিকের জন্যে একটা বিরাট বাধাহীন রাস্তা তার চোখের সামনে দুলে উঠেছিল। ম্যাক ফস্ করে বললে, "একটা কথা হচ্ছিল কিনা, সেই জন্যে বললাম।"

"কী কথা?" গোপালের মুখে এবার একটু উৎকণ্ঠা ফুটে ওঠে। "দেখো গোপাল, সত্যিই এতে খুব কিছু এসে যায় না, তুমি কতখানি কাজ করলে। আমি গত কয়েকমাসের কথা বলছি। তুমি যে কাজ কম করেছ তা বলছি না। তবে তুমি এমন অন্যমনস্ক সবাই লক্ষ্য করেছে, বলাবলি করেছে। তোমার যেন কিছুতেই কিছু এসে যায় না। আচ্ছা, এভাবটা তোমার তো আগে ছিল না। আগেও তো দেখেছি।"

গোপাল চুপ করে থাকে। এ অফিসের মতিগতি বুঝে ওঠা তার পক্ষে ক্রমশ অসম্ভব হয়ে উঠছে। যেখানে গজফিতে মেপে হাসতে হয়, কথা বলতে হয় সেখানে তার কাজে চলায় বলায় আগাগোড়া ঔদাসীন্য যে ওপরওয়ালাদের চোখ এড়িয়ে যায়নি তা এখন ম্যাকের কথায় তার একে একে মনে হতে থাকে।

ম্যাক হঠাৎ তার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললে, "কি গোপাল, লাভ করছো নাকি?"

গোপাল বললে, "লাভ বলে বাঙলায় একটা কথা আছে, তার মানে কী জানো—প্রফিট। আমার কোন কাজে প্রফিট রাখি না।"

"তোমার হেঁয়ালী রাখো গোপাল। আর কেউ তোমায় এভাবে বলবে না। ঐ যে দেখছো রায়, সুযোগ পেলে সেও কিছু তোমার নামে লাগিয়ে সুবিধে করে নেবে।"

"যারা রাস্কেল তারা রাস্কেলের মতই ব্যবহার করে। এতে আশ্চর্য হবার কী আছে?

"গোপাল, সমস্ত দুনিয়াটাই রাস্কেলরা চালাচ্ছে, এ বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে? তাহলে তুমি কী করবে? কোথায় যাবে? অবশ্য তুমি যদি তলে তলে এ চাকরী ছেড়ে বাইরে কোথাও যাবার জোগাড়যন্তর করে থাকো তাহলে আমার বলার কিছু নেই। আমিও

তো সামনের বছর গেলেই বাইরে চলে যাব। এদেশে কি আর এক্স-প্যানশন বলে কিছু আছে? এ কোন পার্টি ফার্টি ব্যাপার নয় গোপাল। এ দেশে যে পার্টিই আসুক না কেন দেখবে ইন্‌এফিশিয়েণ্ট এ্যাড-মিনস্ট্রেশন। একটা জাতের ব্যাপার বুঝলে?"

গোপাল বিরক্ত হয়ে বললে, "কী সব মাতালের মত কথা বলছ ম্যাক। এগুলো বিলেতফের্তা চ্যাটার্জির কাছে বোলো, সায় দেবে। তোমার এ দেশ ভাল লাগে না। চলে যাওনা, কে বারণ করছে। আমাকে টানছো কেন?"

ম্যাক ঠাট্টা করে বললে, "তাহলে গোপাল, তুমি একটা ট্র্যাজিডির নায়ক হতে চাও। ব্যাপারটা যে খুব খারাপ তা না তবে কিনা ওটা দেখতেই ভাল লাগে।"

"কেন চাকরী যাবে নাকি আমার? কিছু শুনেছ?"

গোপাল লক্ষ্য করলে ম্যাকমোহনের মুখের ওপর একটা আস্তরণ পড়ে গেল। আগেও অনেকবার দেখেছে সে, ম্যাকমোহনের মত বাইরে সদাশিব লোকেরও কূটনীতি বেশ রপ্ত করতে হয়েছে। ম্যাক গম্ভীর হয়ে বললে, "না না, গোপাল, সেরকম আমি কিছুই শুনিনি। সেরকম শুনলে আমি নিশ্চয় তোমায় আগে বলতাম। চাকরী যাওয়া জানতো এসব ফার্মে অতো সোজা নয়। তবে কিনা একটু সাবধান হওয়া দরকার।"

"চ্যাটারটন তোমায় কিছু বলেছে আমার সম্বন্ধে?"

"না না, গোপাল, তুমি আমায় বিশ্বাস করো। সেরকম কিছুই শুনিনি।" ম্যাক প্রায় গোপালের হাত চেপে ধরে বললে।

একটু ম্লান হেসে গোপাল বললে, "আমিও ম্যাকমোহন হলে নিশ্চয় এরকম সান্ত্বনা দিতাম।" তারপর ধীরে ধীরে তার মুখখানা কঠিন হয়ে যায়। শান্ত স্বরে বলে, "তবে আমারও কিছু ভাবনা আছে ম্যাক।

ঠিক ক্রেজি বয় ভেবোনা আমায়।" হঠাৎ সে চুপ করে গেল। মনে মনে বললে, ভাবলেই বা! না ভাবাই অস্বাভাবিক।

ম্যাক চোখ মটকিয়ে বললে, "জানি জানি গোপাল, তুমি আরও কিছুর তালে আছ।" হঠাৎ আবার উত্তেজিত হয়ে বললে, "তবে যাই করো, খুব সিরিয়াসলী প্রেমে পড়োনা। বড্ড সময় নষ্ট। আর তাছাড়া মিছিমিছি অনেক কষ্ট পেতে হয়। যার কোন পয়েন্ট নেই।"

ম্যাকমোহন চুপ করে থাকে। গোপাল একটু আশ্চর্য হয়। ঠিক এ ব্যাপার নিয়ে ম্যাক কখনও মুখ খোলেনি। আর খুললেও হলিউডের কোন নতুন ছবিতে কোন নায়িকা সবচেয়ে গরম এই পর্যন্ত আলোচনা করেছে। ছোটখাটো সার্কাস ক্লাউনের মত তার চেহারা, লাফালে ঝাঁপালে বেশ লাগে। কিন্তু বিষণ্ণ অথবা সিরিয়াস অবস্থায় বড্ড বেয়াড়া দেখায়। ম্যাক বললে, "তুমি ঘটনাটা জানো নিশ্চয়, এককালে এ নিয়ে কাগজে লেখালেখি হয়েছে। যে আমার প্রথম বৌ ছিল…"

গোপাল তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি শুনেছি।" ম্যাকের প্রথম বৌ একজন বিদেশী সৈনিকের সঙ্গে চলে যায়। দ্বিতীয় বার বিয়ে করে ম্যাক এখন সংসার করছে। দ্বিতীয় বৌটি চোখে চোখে রাখে স্বামীকে। দেরী হলে তার কুকুর নিয়ে সোজা অফিসে হাজির হয়।

ম্যাক বললে, "ছাখো, তখন মনে হয়েছিল সমস্ত লাইফটাই নষ্ট হয়ে গেল আমার। আবার যে উঠে দাঁড়াব ভাবতেও পারিনি। আর তাকে তুমি দেখলে—আমি নিজের বৌ বলে বলছি না। অন্য লোককে জিজ্ঞেস কোর। কিন্তু কিছুতেই কিছু এসে যায় না। এই তো আমি বেশ আছি চমৎকার, ছেলেপিলে নিয়ে। পাগলের মত কেন কেস করে টাকা নষ্ট করেছিলাম এখন ভাবি।" চায়ের কাপটা শূন্যে নাচিয়ে বললে, "এসব কথা এ কাপে জমে না। চলো, তুমি তো

একেবারে মহাপুরুষ হয়ে গিয়েছ। ককটেল পার্টিতে গিয়ে শুনি তুমি আজকাল লাইম ছাড়া মুখে কিছু দাও না। তা না হয় আমার জন্যেই একটু দিলে।"

"আমার কোন ছুঁচিবাই নেই। তবে এই গরমে ভাল লাগে না। তাছাড়া চায়ের কাপে কেন এক গেলাস জল খেয়েও আমার এসব কথা বেশ জমে।"

"তোমার ওসব রাখো তো গোপাল।" ম্যাক প্রায় টানতে টানতে নিয়ে গোপালকে গাড়িতে ওঠালে।

ম্যাক, ম্যাকের কুকুরওয়ালা বৌ, একজন চুলপাকা সংবাদপত্র জগতের প্রসিদ্ধ লোক, এক নিউজ এজেন্সীর উৎসাহী তরুণ, আর গোপাল—সবাই মিলে মধ্যকলকাতার এক রেস্তোরাঁ-বারে হাজির হোল।

গোপাল বললে, "আমায় একগেলাস ঠাণ্ডা বীয়ার দিও।"

ম্যাকের একটা বিশেষ গুণ সে সমস্ত কাগজের লোকজনের সঙ্গে প্রচুর মিশতে পারে। এদিক দিয়ে সে সত্যিকারের সাংবাদিক, তার কোন নিজস্ব জগৎ নেই। প্রসিদ্ধ ভদ্রলোকটির দিকে তাকিয়ে ওয়েটারকে তালিম দিলে ইংরেজীতে, "হারুদার জন্যে, সব আমার একাউন্টে।"

উৎসাহী তরুণটি একটু লাজুক হেসে বললে, "না না, সে কী করে হয়।"

মিসেস ম্যাকমোহন তাঁর কোলের কুকুরটাকে দুতিনবার 'নটিবয়' 'নটিবয়' বলে' এক পেগ রামে চুমুক দিতে আরম্ভ করলেন।

মিনিট দশেকের ভেতরেই বেশ সৌহার্দ্যের ভাব দেখা গেল সকলের মধ্যে। গোপালের এই পর্যন্ত ভাল লাগে। সে গেলাসের আর্ধেক পর্যন্ত খেয়ে সিগারেট ধরিয়ে ভাবলে, যদি বেড়ানো যেত এসময় আর

কারুর সঙ্গে। হঠাৎ তার মনে হোল পাশের প্রসিদ্ধ ভদ্রলোকটি তার দিকে ঝুঁকে পড়ে কী সব বলছেন।

ভদ্রলোকটি এক কাগজের সম্পাদক। বেশ চোখা বাংলা লেখেন। লেখা কী করে জনপ্রিয় হতে হয় সে আর্ট তাঁর নখদর্পণে। গোপালকে তিনি অনেক আগে থেকেই চিনতেন। কারণ তিনিও আবার কবি। কোন সভায় সভাপতি হিসেবে গোপালের কবিতা একবার তারিফ করেছিলেন তিনি। গোপাল উল্‌টে তাঁর কবিতা তারিফ করেনি, বরঞ্চ বিরুদ্ধ কথাই বলেছে লোকের কাছে। এজন্যে তাদের সম্বন্ধ একটু চোট খেয়েছিল। কিন্তু পানীয় পেটে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দিলদরাজ হয়ে পড়েন।

গোপালকে বললেন, "সব বাচ্চা লোকজন নিয়ে ভর্তি করাচ্ছে অফিস। ইংরেজী বুকনী ছাড়া কিস্‌সু জানেনা, আবার এডিটোরীয়াল লিখবে। তাও কথায় কথায় ইংরেজী বুকনী। আরে বাছা, কোথায় লিখছিস্ সে তো দেখতে হবে। বুঝতে পেরেছ গোপাল, একদিকে বঁটিতে চাড় দিয়ে কুমড়ো আধখানা করেছেন আর পরের ফালি কুটবার আগে বাড়ির গিন্নী একটু কানখাড়া করে আছেন, তাঁর ছেলে কাগজ পড়ছে এই তো ব্যাপার দেশের! এই একটা মুহূর্ত তোমার সময়। কিংবা মনে করো ট্রামে বাসে কাগজ পড়বে। অফিসে গেলেই তো ভুলে মেরে দেবে। হ্যারিসন রোড আর ডালহৌসী স্কোয়ারের মধ্যে তাকে বোঝাতে হবে। তা অতো বুকনী শুনবার কি সময় আছে তাদের?"

দুপেগ পড়তে না পড়তেই হারুদা চেঁচাতে থাকেন। তবে তার কথা খুব এলেমেলো হয় না। সন্ধেতে মৌজ না হলে তাঁর কলমে নাকি জোর আসে না। টেবিল থেকে হঠাৎ ফুলদানীটা টেনে নিলেন হারুদা। একপাশে রাখা ছাইদানি আর গোপালের আধখাওয়া গেলাস সরিয়ে

নিয়ে একটা ত্রিভুজ তৈরী করলেন। তারপর গোপালের দিকে চোখ কুঁচকে বললেন, "কী বলো তো এটা ?"

"ত্রিভুজের মত মনে হচ্ছে।"

"পারলে না গোপাল, পারলে না। এটা হল এডিটোরিয়াল।"

গোপাল কৌতূহলী হয়ে টেবিলের দিকে তাকায়। হারুদা তাঁর মাথা প্রায় ফুলদানীর সঙ্গে ঠেকিয়ে বললেন, "ধর এটা মালিক। মালিক বাবা সব চেয়ে বড় জিনিষ। ওদিকে থেকে চোখ নামিয়েছ কি রক্ষে নেই। আমি কেন, সবাই নস্যি ওর কাছে।" ছাইদানিটা এবার টেনে নিয়ে বললেন, "আর এটা হল জনমত, বুঝলে ? জনমত একেবারে হাড়ে হাড়ে বুঝতে হবে। তুমি নিজে কি ভাবছ না ভাবছ তাতে কিচ্ছু এসে যায়না, কিচ্ছুনা।" হারুদা চুপ করে থাকেন, চোখ মুখ বেশ উজ্জ্বল ঝকমকে দেখায়। এবার মুখখানা একেবারে গোপালের কাছে নিয়ে এসে চীৎকার করে ওঠেন, "আর তুমি তো ইয়ং, হ্যাঁ কি না বল।"

গোপাল হেসে বললে, "নিশ্চয়।"

হারুদা টেবিল চাপড়ে বললেন, "ব্যস তাহলেই হোল। দেশের তরুণ সমাজ মানেই একটা বিপ্লব। বিপ্লব থাকতেই হবে।" গোপালের আধখাওয়া গেলাসটা টেবিলের এককোণে বসিয়ে হারুদা বললেন, "এইটা তোমার গিয়ে বিপ্লব।" হারুদা এবার তন্ময় ভাবে টেবিলের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

গোপাল একবার ভাবলে মাতলামি করছে লোকটা। কিন্তু এবুড়ো তো মাতলামি করার লোক না। হেসে বললে, "তা তো হোল হারুদা। কিন্তু এ নিয়ে এডিটোরিয়াল লিখবেন কী করে ?"

"আরে শোনোই না", বলে হারুদা আবার টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়েন। তারপর টেবিলের তিন কোণে রাখা তিনটি বস্তু এক একবার

ছুঁয়ে বল্লেন, "প্রথমে মালিক, দ্বিতীয় জনমত, তৃতীয় বিপ্লব—এই তিনের মাঝখান দিয়ে স্থুড়ুক স্থুড়ুক করে যাবে।"

গোপাল আশ্চর্য হয়ে বলে, "স্থুড়ুক স্থুড়ুক মানে ?"

হারুদা বিরক্ত হয়ে বললেন, "এই তো, ইংরেজী বুকনী শিখে মাতৃভাষা ভুলতে বসেছ। স্থুড়ুক স্থুড়ুক মানে কোনটাতেই তুমি লেগে থাকবে না। একটু তালিম দিলে মালিককে, তারপরেই স্থুড়ুক করে বিপ্লবের কথায় চলে গেলে। আবার স্থুড়ুক—সিধে জনমতের দরজায়।" বলবার সঙ্গে সঙ্গে হারুদা ক্রমাগত অঙ্গভঙ্গী করতে থাকেন।

এতক্ষণ মিসেস ম্যাকমোহন পাশের তরুণটির সঙ্গে ফিস ফিস করে কথা বলছিলেন আর মাঝে মাঝে প্রায় একই সঙ্গে তরুণটি ও কুকুরটিকে "ও ইউ আর নটি" বলে খোঁচা মারছিলেন। হারুদার থিসিস্ শেষ হবার পর ম্যাকের মেজাজ খুলে যায়। চেঁচিয়ে বলে, "যাই বল হারুদা, আমাদের লাইনের একটা জিনিষ, আমাদের হিউমার। কিছুতেই কোন ব্যাটাকে ডাউন করতে পারবে না। এদিকে একশোটা মিটিং কর, এখানে ছোটো সেখানে ছোটো, কিন্তু ডাউন করতে পারবে না। একেবারে বুর-র-র-র···বুর-র-র-র, ফাইন।"

ম্যাক কিছুক্ষণ পান করবার পরেই এ ধরনের আওয়াজ বার করবার সুযোগ খোঁজে। তার বৌ-এর ভাল লাগে না। হঠাৎ স্বামীকে তীব্র-ভাবে একনজর দেখে গোপালের দিকে ঝুঁকে বলে, "তোমার মনে হয় না গোপাল, লোকটা একটা ইডিয়ট ?"

গোপালের অসোয়াস্তি হয়। এত জোরে কথাটা বলা হয়েছে যে ম্যাকের কানে নিশ্চয় গেছে। কিন্তু চেয়ে দেখলে চারপাশে সবাই যে যার মনে কথা বলছে। কেউই বিশেষ কারো দিকে নজর দিচ্ছে না। গোপালের আরও বিরক্তি লাগে। সে তার দ্বিতীয় গেলাসটার কিছুটা উপুড় করে দেয় পেটমোটা ছাইদানীতে।

সিগারেটের ধোঁয়া চারদিকে। বড্ড চাপা ভাব। প্রথম আধঘণ্টা যে হাল্কা মেজাজ ছিল কোথায় তা উবে গেছে। একবার ভাবলে কেটে পড়বে। কিন্তু পরদিন অফিসে ম্যাকমোহনের মুখই দেখতে হবে সর্বপ্রথম। মিসেস ম্যাকমোহন আবার তাঁর চেয়ারের ওপর ঝুঁকে বললেন, "কই, কথার জবাব দিচ্ছ না কেন গোপাল? তুমি কি কখনও 'মিস্' করবে এই লোকটাকে?"

গোপাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মিসেস ম্যাকমোহনের দিকে তাকায়। মহিলাটির চুল উড়ছে। কথা জড়ানো, কেমন একটা বাসি ভাব সমস্ত মুখে। একবার গোপালের মনে হল সে কি কোন রকমে জুড়ে আছে স্বামীর সঙ্গে? বললে, "কেন, ম্যাক তো বেশ মাই ডিয়ার লোক।"

"হ্যাঁ মাই ডিয়ার। তবে বড্ড ছেলেমানুষ।"

কথাগুলো ম্যাকমোহনের কানে গেল কিনা বোঝা গেল না। সে প্রায় লাফিয়ে উঠে টেবিলের ওপর তার অর্ধেক শরীরটা চাপিয়ে গোপালের কানের কাছ মুখ এনে বললে, "তোমার যদি সিরিয়াসলী কিছু করবার ইচ্ছে থাকে গোপাল, তাহলে এ লাইন ছাড়ো। পালাও এখান থেকে।"

গোপাল নিউজ এজেন্সীর ছোকরাটিকে বললে, "আর কেন? চলুন না বেরোই। এরা না হয় পাঁড়। আমার আপনার এখানে থেকে লাভ কী?"

ছোকরাটির বোধ হয় আত্মসম্মানে লাগলো। চেঁচিয়ে বললে, "আপনি কেটে পড়ুন। আমি আজ রাস্তায় গড়াব।"

হারুদা টেবিল চাপড়ে বললেন, "এই তো, এই তো চাই। এই তো বাংলাদেশের বাচ্চা। এই চেতনা নিয়েই কোটি কোটি মানুষ জেগেছে, আবার জাগবে।"

ম্যাকমোহন ভুরু কুঁচকে বললে, "হারুদা, তোমার বক্তৃতাটা

ইংরেজীতে দাও। শুনেছি তুমি খুব ভাল বাংলা লেখ। আমার একটু চাঙ্গা হওয়া দরকার।”

হারুদা ইংরেজীতে বাংলাদেশের অতীত ভবিষ্যতের ওপর বক্তৃতা সুরু করলেন। দু ভাষাতেই তিনি সিদ্ধকণ্ঠ। সিগারেটের ধোঁয়ায় তাঁর মুখ দেখা যায় না। শুধু তাঁর ঢিলেহাতা পাঞ্জাবী শুদ্ধ হাতখানা শূন্যে দুলতে থাকে। একটা চেয়ার সরানোর আওয়াজ হয়। কেউ খেয়াল করে না।

বাইরে খোলা হাওয়ায় গোপাল নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলে। রাত নটা বাজে। দোলপূর্ণিমা সামনে। ফাগুয়ার গান গাইছে হিন্দুস্থানী শ্রমিকের দল। গোপাল দৌড়ে বাস ধরলে।

পরদিন শনিবার। গোপাল জ্বর বলে একদিন ছুটি নিয়েছিল। আর জ্বর তো একদিনে সারে না তাতে স্বভাবতই সন্দেহ জাগে। কাজেই গোপাল ভাবলে একেবারে সোমবারে যাবে। অবশ্য এ রকম জ্বরে আরও বার দুয়েক সে পড়েছে, আর প্রত্যেকবারই জ্বর সেরে গিয়ে অফিস গেলে তার ঝকঝকে স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল চেহারার দিকে তাকিয়ে তার অফিসের বন্ধুবান্ধবদের সন্দেহ আরো দৃঢ় হয়েছে। তবে গোপাল নিজেকে নিয়ে আজকাল এত ব্যস্ত যে তাদের দিকে তাকাবারই সময় পায় না।

সেদিন সকালে ক্যামেরা বগলে ঝুলিয়ে গোপাল বেরোল ময়দানের দিকে। যখনই সে অস্থির বোধ করে কিংবা নতুন করে ভাববার কথা মনে হয়, তখনই সে ঘরে থাকতে পারে না। বাইরে অবশ্য রোদ্দুর চড়তে সুরু করেছে। তবে সকাল নটায় এখনও তেতে ওঠেনি চারদিক।

সেণ্টপল চার্চের পাশে নামল গোপাল। গরমে ফুল ফুটতে সুরু করেছে চারধারে, ধুলো ধূসরিত গরমে জ্বলে যাওয়া গাছগুলো থেকে

আশ্চর্য রং বেরিয়েছে। ঘন কালো সবুজের ভেতর থেকে থোলো থোলো টকটকে লাল জেগে আছে একটা গাছে।

গোপাল হাঁটতে স্বরু করল ময়দানের পেট কেটে। এখান থেকে গঙ্গার ধার বেশ দূর। খানিকদূর হাঁটবার পর সে ঘেমে ওঠে। একবার ভাবলে ফিরবে কিনা। তারপর ময়দানের মাঝখান থেকে চৌরঙ্গীর সারিবদ্ধ বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে আবার চলতে স্বরু করে।

এক গা ঘাম নিয়ে সে গঙ্গার ধারে আসে। সমস্ত শরীর জুড়িয়ে যায়। বড় বড় জাহাজ থেকে পান্সীতে কতকগুলো চীনে এসে নামল। যে মাঝিটা হাল ধরে আছে নৌকোয় তার চকচকে বুক খানায় রোদ্দুর খেলা করছে। একটি বেকার যুবক অত্যন্ত বিষন্ন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে জেটিতে। কতকগুলো হাফপ্যাণ্ট পরা পোর্ট কমিশনারের অফিসার এক সঙ্গে পা ফেলে চলে গেল। তেলেভাজা দোকানের সামনে মাল্লাদের ভিড় জমেছে।

অন্যদিন গঙ্গার ধারে এসে শান্তি পাওয়া যায়। এতগুলো মানুষের ওঠানামা চলাফেরার মাঝখানে যেন নিজেকে দাঁড় করানো যায়। আজ কিন্তু গোপাল খানিকক্ষণ পরেই উঠে দাঁড়াল। যে লোকটার পাশে এলে আরও অনেক লোকের মাঝখানে এসে দাঁড়ানো যায়, সে লোকটাও অস্থির হয়ে আছে, তার বুকে ঝড় বইছে। আর গঙ্গার শান্ত পরিবেশের মাঝখানে গোপালের বুকে সে ঝড় এসে লাগে। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে সে ঝড় থামে না।

ফিরবার পথে ট্রামে ভিড় ছিল না। হাজরা রোডের মোড়ের কাছে প্রকাণ্ড ভিড়। অনেকগুলো লোক নিজেদের মধ্যে গুলতানি করছে। কোন এ্যাক্সিডেণ্ট হবে ভেবে গোপাল নেমে পড়ল।

"কী হয়েছে দাদা? এত ভীড় কেন? কোন এ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে?" গোপাল ভিড় ঠেলে এগোতে এগোতে জিজ্ঞেস করে।

পাশের একজন দোকানদার বললে, "রেসের ঘোড়া স্যর। সহিসের হাত ফস্‌কে বেরিয়ে গেছে।"

গোপাল কৌতূহলী হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। পাশ থেকে একজন বললে, "নিজে জখম হয়েছে, দুটো সাইকেলের সোয়ারীকে জখম করেছে। দেখুন না, এক্ষুনি এসে পড়বে।"

মনে হোল হরিশ মুখার্জি রোড দিয়ে ঘোড়াটা এগিয়ে আসছে। ওদিকেই ভিড় বেশী। এখন অফিস টাইম। চারদিকে গিস্‌গিস করছে লোক আর গাড়ি।

"এত ভিড়, ট্রাম-বাস, ঘোড়াটাকে কেউ রুখতে পারছে না," গোপাল যেন নিজের মনেই বললে।

দোকানদারটি আবার বলে উঠল, "এ স্যর, রেসের ঘোড়া, একি আমাদের মত ? ও মরবে তবু দৌড়ুবে।"

হরিশ মুখার্জি আর হাজরা রোডের মোড় থেকে কোলাহল স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দোকানপাটের লোক ঘাড় উঁচু করে দেখতে সুরু করেছে। হঠাৎ দেখা গেল ঘোড়াটাকে। বাদামী রং, মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। মোড়ে এসে মুহূর্তের জন্যে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে থাকে। একবার বাঁ দিকে ঘাড় ফিরিয়েই আবার শূন্যে লাফ দিল। ট্রামের পাশ থেকে ছিটকে বেরিয়ে ঘোড়াটা বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে আসে। যেন উড়ে আসছে। ট্রাফিক কন্সটেবল আর রাস্তার মাঝখানের লোকজন দৌড়ে যায়। হঠাৎ একটা ট্যাক্সি রসা রোড থেকে মোড় নিলে। এক ঝলকে বাদামী রঙের চকচকে একটা উড়ন্ত জিনিষ গোপালের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। প্রায় পার হয়ে গিয়েছিল লাফ দিয়ে। তবে হাল আমলের মস্ত বড় সিডেন গাড়ি। সংঘর্ষের ধাক্কায় জন্তুটার পেছনদিক মুহূর্তে লাল হয়ে গেল। দুটো পা-ই এমন পেছন দিকের রডে আটকে গিয়েছিল যে মনে হোল

পড়ে যাবে। কিন্তু হিচঁড়ে জন্তুটা সামনের দিক থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল।

পাশের লোকটি চেচিয়ে উঠল, "দেখলেন, দেখলেন, পাশ নিলো না, থামলো না, একেবারে লাফ মেরে বেরিয়ে গেল।"

গোপালও তাই ভাবছিল। সে চেঁচিয়ে একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়ল। হয়তো ধরা যাবে না, কিন্তু তার রোখ চেপে যায়। জানোয়ারটা কতদুর যায় সে দেখবে।

ঘোড়া সোজা দৌড়েছে টালিগঞ্জের দিকে। টালিগঞ্জের ব্রীজ অবধি লোকজন বললে, সেদিক দিয়ে চলেছে। গোপাল ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ল। ফুটপাথে বিশ তিরিশ হাত অন্তর কালো কালো রক্তের দাগ। একটা গলি ধরে হাঁটতে থাকে সে রক্তের দাগ ধরে। প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে। কটকটে রোদ্দুরে মাথা ধরে যায়। শেষকালে পাড়ার একটি ছেলে এসে জানালে ঘোড়াটা তার আস্তাবলে ফিরে গেছে।

আরো দেরী হয়ে যায় আস্তাবল পেতে। মস্ত বড় মাঠের এক কোনায় এক দালানে পাঁচ ছটা ঘোড়া বাঁধা। একেবারে শেষে দাঁড়িয়ে সেই দৌড়ের ঘোড়া। বাঁ পায়ের অর্ধেকটা ব্যাণ্ডেজে ঢাকা। আগন্তুক দেখে তার চকচকে চোখ দুটো মেলে তাকায়। কাছে এগোলে ঘাড় নাড়িয়ে প্রতিবাদ করে। গোপাল দুটো ছবি পরপর তুললে।

দুপুরে দরজা জানলা ভেজানো অন্ধকার ঘরে সেই দোকানদারের কথাগুলো মনে হয়: "এ শুয়র রেসের ঘোড়া, মরবে তাও দৌড়বে।" সঙ্গে সঙ্গে যে মানুষটার ছবি তার অবচেতন মনের মধ্যে নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছিল তা এখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একবার আহত জন্তুটার গলা বেঁকিয়ে তাকানর ভঙ্গীটা ভেসে ওঠে মনের ভেতর। আর সঙ্গে সঙ্গে ভয় হয় তার। নয়নও পাশ নেয় নি, দাঁড়ায় নি, দৌড়ে চলেছে। যেখানে সে সম্রাজ্ঞী সেই বেঁচে থাকার আনন্দে যখনই কেউ সামনে

এসে দাঁড়িয়েছে নয়ন ভ্রূক্ষেপ করে নি, কোন কায়দায় আপোষ করে নেয় নি, সে ঝুঁকি মাথায় নিয়ে শূন্যে লাফিয়েছে। আহত হয়েছে, কিন্তু দমেনি—"আমার ছেঁড়া কাঁথায় শুতে হোক, কিন্তু আমার কাছে যা দামী তা চিরকাল দামী থাকবে।"

গোপাল নিজেকে প্রশ্ন করে, তার বাঁচার অহঙ্কার কি এতই ঠুন্‌কো যে তার বর্তমান অবস্থা একটু এদিক ওদিক হলেই তাতে ঘা পড়বে? সে কি নয়নের মত বলতে পারে না: আজকেও সে যা, কালও একেবারে ভিন্ন পরিবেশের মধ্যে পড়লেও তাই থাকবে?

গোপাল গত কয়েক বছরের দিকে তাকায়। এখন সে বুঝতে পারে প্রথম দিকে যখন সে কলেজের গণ্ডী পেরিয়ে মানুষের মধ্যে নেমে দাঁড়াল তখন তার কোন স্বকীয় ব্যক্তিত্ব ছিল না, এমন কি সে ধরনের ব্যক্তিত্বের প্রতি যে তার স্বাভাবিক আকর্ষণ তাকে সে জোর করে এড়িয়ে যেতে চেয়েছে। মানুয়ের মঙ্গল করা যে কেবল মুহুরীর মত আদেশ পালনে সম্ভব নয়, তার জন্যে সক্রিয় ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন এ কথাটা মনে উঠেই মিলিয়ে গিয়েছে। যার ফলে তার চালচলনে ছিল এমন এক ধরনের ভাব যাকে তার বন্ধুরা বলেছে সন্ন্যাসীপনা। এ ঘুম থেকে সে নাড়া খেয়েছে। ধীরে ধীরে চারপাশের এই সমাজের মধ্যে নিজেকে সে বিস্তার করতে চেষ্টা করেছে। বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে বড় ধরনের জীবন গড়ার সাধনায় মাঝে মাঝে ক্ষেপে উঠেছে। ধীরে ধীরে তার দশহাজারী জগতের প্ল্যান করেচে। দাঁত চেপে সাহেবী অফিসে দু-মুখো ব্যক্তিত্বের বোঝা বয়ে নিয়ে চলেছে তার মুক্তির সন্ধানে। অবশ্য এতে যে ক্ষতিও হয় নি তা নয়। যে বিরক্তি আর ক্লান্তি তার একেবারেই ধারণার বাইরে ছিল তা ক্রমশ ধীরে ধীরে তার নখ, চুল থেকে আরম্ভ করে শরীরের প্রতিটি রক্ত-বিন্দুতে ছড়িয়ে পড়েছে।

নয়ন তার কাছে তো কোন মনোরম নারী হয়ে আসে নি। তার জীবনের আকাঙ্ক্ষার ছবি হয়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আর আশ্চর্যের বিষয়, নয়নের কাছে এলে তার অসহিষ্ণুতা সে হারিয়ে ফেলে। এমন এক ধৈর্যের কথা মনে হয় যে ধৈর্য আপোষ নয়। এক উত্তেজনাহীন শান্ত আসক্তি সে অনুভব করে তার চারপাশের এবং নিজের জীবনের প্রতি। নয়ন এলে তার প্রিয় সামাজিক থিসিস বাঙালী মধ্যবিত্তের মুমূর্ষুতা কী ভাবে যে চোট খায় সে বুঝে উঠতে পারে না। নয়নও বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। আর তা ছাড়া সব দিক থেকে খোঁড়া, বঞ্চিত। কিন্তু তার সামনে অসম্ভবও সম্ভব হয়। নয়ন তার জীবনের প্রতিটি কাজে চালচলনে প্রতি মুহূর্তে যেন মুমূর্ষুতার মাথায় পা দিয়ে দাঁড়িয়েছে।

নয়নের কাছে আসা মানে শুধু বাঙালী মধ্যবিত্তের গণ্ডীতে থাকা নয়, অনন্তকালের মানুষের পংক্তিতে দাঁড়ানো। কিন্তু তার মানে তার দশহাজারি জগতের সর্বনাশ। আর নয়নকে হারানো, তার মানে? গোপাল ভাবতে পারে না, তার যেন পায়ের নীচের মাটি দুলে ওঠে।

গোপাল প্রায় চেচিয়ে ওঠে, কেন, কেন রাজী হবে না নয়ন? তার নিজের শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে। নয়নকে নিয়ে কি সে 'এতটুকু বাসা' তৈরী করতে পারবে না? সে অত কথা বলতে পারবে না! সে শুধু বলবে, 'তোমায় ছাড়া আমার চলবে না।' কথাটা চিন্তা করেই গোপাল ঠাণ্ডা হয়ে যায়। নয়ন কী উত্তর দেবে সে স্পষ্ট ধারণা করে নিতে পারে। নয়ন বলবে, "চলে যাবে গোপাল, ঠিক চলে যাবে। ওভাবে আর সকলের মত তুইও কথা ছিটোসনে।"

নয়নও ভেবেছে। আচ্ছন্নভাবে যখন গোপালের কোলে শুয়ে থেকেছে সে তখন সেও এতটুকু বাসারই স্বপ্ন দেখেছে। স্বপ্ন দেখেছে গোপাল আর সে। কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাব কেটে গেলে তার পুরনো

প্রশ্নটাই জেগে উঠেছে, তারপর? গোপালের সমস্ত হৃদয় তার কাছে স্বচ্ছ, তার গতি সে বুঝতে পারে। ধন নয়, মান নয় নিশ্চয়, কিন্তু এতটুকু বাসাও নয়। তার জন্য সে লালায়িত না। তার আনন্দ এতটুকু বাসার মধ্যে নেই। আর নয়ন কী করে হাত বাড়াবে সেই বাসার দিকে? হাত বাড়াতে গিয়ে যদি সে আঁকড়ে ধরে তাহলে তার চেয়ে আর বড় ধিক্কার কী থাকবে? অথচ গোপালের কাছ থেকেও সে সরে দাড়াবে কী করে? গোপাল বাঁচুক, কিন্তু তাকেও তো বাঁচতে হবে।

নয়ন আর একবার চেষ্টা করলে মান্তার কাছে যেতে। কিন্তু মান্তা অচল। তার এ ধার্মিকপনায় একদিক থেকে তার সুবিধেই হয়েছে। কারণ চাকরী বাকরীর ঝামেলা ছেড়ে দিয়ে এখন থেকে সে গানবাজনার ট্যুইশনি করেই জীবন কাটাবে ঠিক করেছে। আর ট্যুইশনি করে এবং বাকি সময়টা যোগ করে তার বলতে কি ভালই কেটে যাচ্ছে। মা এলে তার বিশেষ মেজাজের সঙ্গে বনত না। আর টাকার ব্যাপারও আছে একলা থাকার মধ্যে বেশ সৈনিক জীবনের স্বাদ পায় মান্তা। কোনদিন বাড়িতে খাওয়া গেল কোনদিন রেস্তোরাঁয়। নয়নও বুঝলে অন্তর মত তার ছোট ভায়েরও ইচ্ছে কিছুটা নির্ঝঞ্ঝাটে দিনগুলো কাটিয়ে দেওয়া। এরই মধ্যে ধীরে ধীরে তারা নয়নকে বাদ দিতে সুরু করেছে।

তারিণীবাবুর বাড়ি ঢুকতেই নিখিলকে দেখে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে। নিখিল বললে, "ছোড়দি, আমি আগেই বলেছিলাম কোন ভাবনা নেই। নিখিল চাটুয্যে যখন আছে তখন একটা কিছু হয়ে যাবে।"

"সীট খালি হয়েছে?" নয়ন অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করলে।

"খালি হবে না কি? নিজে চিঠি লিখেছেন বিরাজমোহিনী দেবী আমাকে। চেনাশোনা থাকলে সীট কোন ব্যাপার না। ওসব

বুজরুকি। তুমি কালকেই রওনা হয়ে যাও। ওরা এখনই যেতে বলেছে। আবার কোথায় মত পাল্টে ফেলে। আজ গেলেই ভাল হোত। তুমি বরং কালই চলে যাও।”

সে রাত্তিরে নদিদির রান্নাবান্না সেরে তার টিনের সুটকেসটা গোছাতে থাকে নয়ন। তারিণীবাবু বলতেন, “থাকবার মধ্যে তো কতগুলো ন্যাকড়া আর কাগজ, তারই জন্যে এত।” নয়নের যাবার ব্যাপারে তারিণীদা নদিদির অনুরাগও নেই, বিরাগও নেই। নদিদি একবার সব শুনে বললেন, “যাচ্ছো ভাল, তবে আবার লোক হাসিও না।”

তারিণীবাবু খতিয়ে নিয়ে ভাবলেন, তাঁর আবার রান্নার লোক রাখতে হবে। মুখ ভার করে বললেন, “তাহলে তুই যাবিই শেষ পর্যন্ত?”

ছোটমামা রাত্তিরে এলেন। তিনি নয়নের যাবার কথা শুনে বললেন, “তোমার কাজ আলাদা, আগেই বলেছি। তা এও তো আর এক আশ্রম। আতুর অনাথ মানুষ যেখানেই মেলে সেখানেই তো ভগবান বিরাজ করেন।” নিখিলের দিকে তাকিয়ে বললেন, “তা বাবা, তুমিই শেষ পর্যন্ত কর্ণধার হলে। লজ্জা কোরনা। গীতার নিমিত্ত সেই তুমিই হলে শেষ পর্যন্ত।”

নিখিল লজ্জা পেয়ে যায়। অথচ এইটুকুন প্রশংসা সে যে মনে মনে চায় তা তার মুখ দেখেই বোঝা যায়। সে মাথা নীচু করে বললে, “না না, কী বলছেন……”

ছোটমামা তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, “সেই তো সামান্য নিমিত্ত, কথাটা ছোট, কিন্তু এর দাম অসামান্য। কজন নিমিত্ত হয়?” নয়ন আর তার নদিদিকে লক্ষ্য করে বললেন, “ছ্যাখো, একই মায়ের পেটের দুই বোন, কিন্তু কী বিচিত্র এই সৃষ্টির নিয়ম। এক-

জনের ঘুঁটে দিতে না পারলে ঘুম হয় না, আর একজনের ঘুম হয় না বিশ্বসংসার চিন্তা করে।"

নয়ন মাথা তুলে বললে, "আমার সংসার বড় এতটুকু ছোটমামা, তার মধ্যে বিশ্বকে সব সময় টানতে পারি না।"

ছোটমামা বললেন, "তা তো জানি, তা তো জানি নয়ন, সেই জন্যেই তো সাধনা, নইলে সাধনার কী প্রয়োজন? তুমি যে সাধনা করছ ভগবদ্লাভের জন্যে—"

নয়ন তার হাত দুটো হঠাৎ আদেশের ভঙ্গীতে তুললে। সেই স্পষ্ট, দর্পিত অথচ সংযত ভঙ্গীতে ছোটমামার গলায় কথা আটকে যায়। নয়ন তার উজ্জ্বল চোখ দুটি মেলে সামনের দিকে তাকিয়ে বললে, "আমার ভগবান আলাদা ছোটমামা।"

"তাই তো বলছি আমি, তাই তো বলি—"

"না আপনি তা বলছেন না। আমার ভগবানের হাত আছে, চোখ আছে, পা আছে, নাক আছে।"

ছোটমামা অবাক হয়ে থাকেন।

নয়ন বললে, "চল্লিশটা বছর ধরেই তাকে খুঁজেছি। ঘুমের মধ্যে জেগে জেগে তাকে খুঁজেছি। আজ সে আমার সামনে।"

নয়ন চুপ করে যায়। সে দাঁড়িয়ে উঠেছে। সর্বাঙ্গ কাঁপছে তার। চোখ দুটো আরও বড় দেখাচ্ছে।

ছোটমামা তাকিয়ে থাকেন সে দিকে। এভাবে নয়ন কোনদিন তাঁর সামনে কথা বলেনি। সে শুধু শুনেইছে, বড় জোর সায় দিয়েছে। কিন্তু এ আর এক নয়ন।

নয়ন দরজার পাল্লায় হেলান দিয়ে বললে, "কিন্তু আমার পা যে খোঁড়া ছোটমামা, তার কাছে যেতে পারছি না। কিন্তু যাব। কেউ আমায় সরিয়ে রাখতে পাবে না তার কাছ থেকে।"

ছোটমামা আড়ষ্ট হয়ে যান। বিচলিত হয়েছেন মনে হল ভেতরে ভেতরে। গলা পরিষ্কার করে বললেন, "তুমি কোন মানুষের কথা বলছ নয়ন?"

নয়ন হাস্‌ল। সে যেন ঠাট্টা করছে। কিন্তু এ ঠাট্টায় কোন প্রহার নেই। কাপড়ের খুঁট দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললে, "নিশ্চয়, মানুষের কথাই বলছি।"

ছোটমামা চলে গিয়েছেন কখন নয়নের খেয়াল নেই। সে অপেক্ষা করে। চেনা পায়ের আওয়াজের জন্যে তার সমস্ত মন পড়ে থাকে। আজ গোপাল এলে সে তাকে বলবে স্থির হতে। এমন এক আনন্দে তার সমস্ত হৃদয় দুলছে যে কোন আফশোষের কথাই সে আমল দেবে না। গোপালকে বলবে, "আমাকে তৈরী হতে হবে। শুধু বোঝা হয়ে থাকতে আমি পারব না।" গোপাল যে বলত রূপান্তর, সেই কথা দিয়েই সে গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো করবে। তার কোন ক্ষোভ নেই, খেদ নেই। বরং সে এক আনন্দময় ভবিষ্যৎ—যেখানে গোপাল আর সে পাশাপাশি দাঁড়াতে পারে—তার জন্যে নিজেকে তৈরী করবে। এ শুধু গান শেলাই আর আর্থিক স্বাবলম্বিতারই ব্যাপার নয়। তার সমস্ত সত্তাকে সে পাল্টাবে। যে বাঁচার অহঙ্কার গোপালের কথাবার্তায়, তার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত, সেই অহঙ্কার, সেই গৌরবের সে শরিক হতে চলেছে। আর গোপাল যাই করুক, তার কিছু বলার নেই। গোপালের মস্ত বুকের মাঝখানে সে একটা জায়গা করে নেবেই। কিন্তু তার জন্যে সে তার ঘাড়ে উঠতে পারবে না। তারও তো অহঙ্কার আছে, তার রূপ আলাদা হোক। কিন্তু সে তো তার চাওয়াকে জ্বালিয়ে রেখেছে গত চল্লিশ বছর ধরে। কিছুতেই নিভতে দেয়নি। কোন রকমে কিছু করা এতো তার দ্বারা সম্ভব না। সে যাবে গোপালের কাছে তার মর্যাদায়, তার আনন্দে। কোনও

অসহায়তা দুর্বলতা থাকবে না সেখানে। নয়ন চমকে উঠল। পায়ের আওয়াজ না! না, এবাড়ির বেড়ালটা। নয়ন চেয়ে থাকে তার দ্বিতীয় বাসর ঘরের দিকে। তার প্রথম বাসরের কথা অস্পষ্ট ভাবে মনে হয়। মফঃস্বলে এমন রোশনাই সে আমলে খুব কম হয়েছিল। তিনচারিদিন ধরে আলো আর বাজনা চলেছিল। নয়নের ঘুম পায়। মনে হোল গোপাল এসে মাথার কাছে দাঁড়িয়েছে, আর বলছে চল, আর সে ঘুমের মধ্যেই উঠে দাঁড়িয়েছে, চুলে একটু হাত দিয়েই সে যাবার জন্যে তৈরী হয়েছে। তন্দ্রা ভেঙ্গে যেতে নয়ন মনে মনে হেসে উঠল। কিসের গন্ধ আসছে? করবী ফুটেছে, না সেই কবেকার গোলাপের নিবিড় গন্ধ?

একবার মনে হোল বাবার গলার আওয়াজ পাচ্ছে সে। বাবা যাত্রামঙ্গল পাঠ করছেন। নয়ন যেন শুনতে পায় সেই পরিষ্কার নিটোল গলার আওয়াজ: ধেনুর্বৎসপ্রযুক্তা বৃষগজতুরগা দক্ষিণাবর্তবহ্নি দিব্যস্ত্রী পুর্ণকুম্ভা দ্বিজনৃপগণিকা পুষ্পমালা পতাকা······

কিন্তু এ কোন রাস্তা? এতো শ্বশুরবাড়ির চেনা রাস্তা নয়। সে চলেছে অন্য রাস্তা ধরে, সঙ্গে অন্য লোক। আর তার সমস্ত মন আনন্দে দুলছে।

অনেকদিন পর ঘুমাল নয়ন।

ছাব্বিশ

সন্ধেবেলা অফিসে পা দিয়েই গোপাল টের পায় একটা কিছু ঘটেছে। নীচের তলার বড়বাবু যিনি বড় সাহেবদের চিঠি ডেসপ্যাচ করেন, লিফট্‌ম্যান, বেয়ারা সবাই তেরছা চোখে তার দিকে তাকিয়েই আবার চোখ নামিয়ে নিল। গোপাল যেন অফিসের আর কেউ। বিজ্ঞাপন বিভাগের মিঃ চ্যাটার্জি লিফটের মুখে দাঁড়িয়ে। অন্যদিন

গোপালকে দেখলে হিউমার করার চেষ্টা করেন। আজ মুখ বেশ গম্ভীর। গোপালের দিকে চেয়ে একটু সহানুভূতির ভঙ্গীতে হাসবার চেষ্টা করে নেমে যান। গোপালের ঘরে বিশেষ কেউ নেই। এত তাড়াতাড়ি কেউ বাড়ী যায়না কাগজের অফিসে। সন্ধে সাতটা তো দিনদুপুর তাদের কাছে। ঘরে ঢুকতেই ম্যাকমোহন যখন তার ছোট টাইপরাইটারটা বন্ধ করতে স্নুরু করে তখন গোপালের কেমন অসোয়াস্তি হয়। বলে, "মেমসাহেব ডাইভোর্স করবে না কি? এত সকাল সকাল যাচ্ছ যে!" অন্যদিন ম্যাককে বেশি কিছু বলতে হয়না। অফিসই তার স্বাস্থ্যনিবাস। এখানে যতক্ষণ থাকতে পারে ততক্ষণই সে রঙীন মেজাজে থাকে, বাড়ির কোন আকর্ষণ নেই তার। কিন্তু সেও চোখ নামিয়ে বললে, "না গোপাল, আজ একটা পার্টিতে যাচ্ছি।"

গোপাল বললে, "নাচ? তোমার কেউ পার্টনার হবে না সাহেব। কোথাও আগুন লেগেছে শুনলে তুমি অর্ধেক নেচেই দৌড় দেবে।"

ম্যাক তার স্বভাববিরুদ্ধ চড়া গলায় বললে, "আমি কাজ ভালবাসি গোপাল।" তারপর টাইপরাইটারের ডালায় চাপ দিয়ে বন্ধ করে আস্তে আস্তে বললে, "আমি তো আর আইডিয়ালিষ্ট নই!"

গোপাল বললে, "কী রকম?"

তার কথায় একটা চাপা বিদ্রূপের আভাসে ম্যাক ক্ষেপে উঠে বললে, "কী রকম আবার! আমি অফিসের কাজ ভালবাসি, বউ ছেলেমেয়েদের ভালবাসি। মিছিমিছি আকাশ পাতাল চিন্তা করি না। ইনটেলেকচ্যুয়াল হবার ইচ্ছে আমার নেই।"

"আমি কি ইনটেলেকচ্যুয়াল ম্যাক?"

গোপালের গলায় এবারে বিদ্রূপ ছিল না। ম্যাকমোহন একবার কী ভাবলে। সে বিশেষ করে আজ গোপালের কাছে কোন কথা উত্থাপন করতে চায় না। আজ এ ধরনের কথা মোটেই ভাল লাগে না

তার। কিন্তু তার শক্ত হিসেবী মানুষের পুরু আস্তরণ ভেদ করে গোপাল কী ভাবে যেন তাকে স্পর্শ করেছে। সে চুপ করে থাকতে পারে না। জানে গোপালকে বলে কোন লাভ নেই, উপদেশ দিলেও শুনবে না। গোপালকে দেখে তার তাজ্জব লাগে। সে দেখেছে দুধরনের লোক : যাদের স্বার্থপর হবার মত কিছুই নেই, কোন শক্তি নেই সামর্থ্য নেই, আর এক ধরণের লোক যাদের এত আছে যে কিছুটা নিঃস্বার্থ হলেও কিছু এসে যায় না। গোপাল এধরনের কোনটাতেই পড়ে না। তার প্রশ্নটা মনে মনে নাড়াচাড়া করে ম্যাক বললে, "না গোপাল, তুমি ঠিক ইনটেলেকচ্যুয়াল নও। তারাও কোন না কোন ভাবে একটা জায়গা গুছিয়ে নিয়েছে। তুমি আসলে পাগল, আস্ত পাগল।" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, "আশা করি বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাগলামি কেটে যাবে।"

ম্যাক টেবিলের ওপর থেকে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলে। গোপাল অবাক হয়ে যায়। হঠাৎ করমর্দন কেন? টাইপিষ্ট মুখার্জির পাশে এসে দাঁড়ায় সে। মুখার্জিও আজ অস্বাভাবিক গম্ভীর। একবারও তার বৌ-এর কথা বলে না। এমনকি অফিসের কোন সাহেব কী বলেছে যা না বললে তার দম আটকে যায়, সে ধরনের কথা বলতেও মুখ খোলেনা। তার দিকে গোপালের চোখ পড়তেই সে চোখ নামিয়ে ফেললে। কী যেন একটা হয়েছে। কী একটা ঘটে গেছে, অস্পষ্ট ভাবে গোপালের মনে হতে থাকে।

রাত্তিরের খাওয়া এক পাঞ্জাবী হোটেলে সাঙ্গ করবার জন্যে সে বেরোয়। রাস্তায় নেমে সে ভাবছিল ম্যাকমোহন ও তার দাদার কথা। দুজনেই তাকে এক উপদেশ দিয়েছে : হিসেবের কথা, যা না জানলে কিছুই জানা যায় না, কিছুই করা যায় না। গোপাল ভাবলে এমন লোক কি নেই যে হিসেবের মাথায় পা দিয়েছে?

হোটেল প্রায় বন্ধ হতে চলেছে। একলা ছোট ঘরখানায় খেতে খেতে গোপাল ভাবলে তার বিরক্তির মূল কারণটা কী? তার কারণ কি এই নয় যে সে নিজেকে দাঁড় করিয়েছে এক সীমাবদ্ধ জগতে? যেখানে দাঁড়িয়ে অবশ্য নিজেকে সে চাবুক মেরেছে, অন্যকে মেরেছে কিন্তু আরো বাতাসহীন আরো আলোহীন হয়েছে জগৎ। ভবিষ্যৎ হয়েছে রুদ্ধদ্বার। তার পুরণো বন্ধু অমিয় যেন হাতছানি দিয়ে বলেছে, "এই তো বাছাধন, যাবে কোথায়? যতই বকো ঝকো, এই তো চাঁদ, আমাদেরই মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছ! পালাবে কোথায়?" তারপর অবশ্য আর এক জন এসেছে। সে তাকে বাঙালী মধ্যবিত্তের গণ্ডী থেকে টান মেরে এক বিরাট মানুষের পংক্তিতে এনে দাঁড় করিয়েছে। তার কোন আফশোষ নেই।

হোটেল থেকে বেরিয়ে গোপাল আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকে। বসন্তের হাওয়া দিচ্ছে চৌরঙ্গীতে। ময়দানের এককোণে আকাশখানা আলো হয়ে উঠল। বসন্তেও বিদ্যুৎ! ধুলোর ঝড় উঠল বোধ হয়।

ঘরে এসে গোপাল দেখলে মিঃ বসু বসে। গোপালকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন, "চলে যান মশাই, বিলেত চলে যান। এখানে কিচ্ছু হবে না।"

"হঠাৎ?" গোপাল অবাক হয়ে জিজ্ঞেসা করে।

মিঃ বসু তার দিকে অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে বললেন, "কেন, আপনি কিছু শোনেন নি?"

"কী শুনব?"

"না না আমারই ভুল হয়েছে হয় তো। অফিসের ব্যাপার, কত কথাই যে রটে, ও রকম একটা কী রটেছে।" মিঃ বসু চেয়ার থেকে উঠে পড়েন।

গোপাল দৃঢ় কণ্ঠে বলে, "কী শুনেছেন? আমার চাকরী গিয়েছে?"

মিঃ বসু দাঁড়িয়ে পড়েন। একবার মুখার্জির দিকে তাকিয়ে বললে, "না না তা নয়, ঠিক বলতে পারছি না। তবে আপনার সম্বন্ধে একটা কী ডিসিসান হয়েছে।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিরাসক্ত ভাবে বললেন, "সে আর হতে কতক্ষণ! হলেই হল, যা দিনকাল পড়েছে।"

মিঃ বসু চলে যাবার পর মুখার্জি মুখ খোলে। দুতিনবার নস্যি নিয়ে তার পাঞ্জাবীর অর্ধেকটা নস্যির গুঁড়োয় ভরিয়ে নাক ঝেড়ে ঠাণ্ডা গম্ভীর ভাবে বললে, "তুই ঘাবড়াচ্ছিস্ কেন গোপাল? "দ্য হোল্ ওয়ার্লড ইজ অ্যাট্ ইওর ফিট। আমরাই না হয় বুড়ো হয়ে গেছি।"

গোপাল রেগে বললে, "অত বড় বড় কথা বল না মুখার্জি। পৃথিবীটা আমার পায়ের নীচে না বড়সাহেবের পায়ের নীচে তা পরে দেখা যাবে। এখন বল, চাকরী গিয়েছে আমার?"

মুখার্জি এবার সাবধান হয়ে যায়। বলে, "তোমার চাকরী গিয়েছে কি না গিয়েছে তা আমি কী করে বলব? আমরা বাবা চুনোপুঁটি..."

গোপাল হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। ওপর তলায় ফ্লাটে থাকেন মিঃ চ্যাটারটন। টুঁ শব্দটি নেই চারদিকে। সিঁড়ির মুখেই ঝোলানো স্নিগ্ধ আলোর নীচে বেয়ারা বসে আছে টুলের ওপর।

সাহেব গোপালকে দেখেই ভেঙ্গে পড়লেন, "দ্যাখো, আমার কোন হাত নেই গোপাল, আই এ্যাম সো সরি, সো সরি।" তার গলা ভারী হয়ে ওঠে।

গোপাল একবার একটু খোঁচালে, "আমার কি কোন কাজের গাফিলতি......"

"আরে না না, সে রকম কিচ্ছু না। বুঝলে না, ম্যানেজমেণ্টের ব্যাপার। রি-অর্গানাইজেশান, অন্য ডিপার্টমেণ্ট থেকেও হয়েছে। তোমার অবশ্য কম বয়েস, চাকরীর জন্যে খুব ভাবতে হবে না।"

তারপর গোপালের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, "তোমায় আমি কী ভাবে সাহায্য করতে পারি বল গোপাল।"

"না ঠিক আছে, ধন্যবাদ।" গোপাল সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়ায়। পরিচিত সিঁড়িটা তার কাছে হঠাৎ অন্যরকম লাগে। সে যেন এক অচেনা বাড়িতে এসেছে আগন্তুক হয়ে।

সাহেব পেছন থেকে চেঁচিয়ে বললেন, "তোমায় একটা একসেলেণ্ট টেষ্টিমোনিয়াল দেব গোপাল।"

"ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।" গোপাল লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ডিঙোয়।

ঘরে আসতে মুখার্জি গম্ভীর ভাবে বললে, "তোমার নামের চিঠিটা বারান্দায় ডাকবাক্সে আছে।"

ছোট্ট সাদা খাম। ম্যানেজমেণ্ট জানাচ্ছে, তারা অত্যন্ত দুঃখিত।

রিঅর্গানাইজেশন অফ দ্য ম্যানেজমেণ্টএর দরুণ তারা বাধ্য হচ্ছে……সে যেন তার প্রফিডেণ্ট ফণ্ড আর এক মাসের মাইনে…… ইত্যাদি।

গোপালের মুখে উত্তেজনার আভা ছড়িয়ে পড়ে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, সে যেন বন্দীশালা থেকে ছাড়া পেয়েছে।

মুখার্জি তার দিকে চেয়ে অবাক হল। কী ভেবে বললে, "তুমি মন খারাপ কোর না গোপাল, জীবনে ওঠাপড়া তো আছেই। আমরাই না হয় বুড়ো হয়ে গেলাম।"

গোপাল বললে, "মুখার্জি প্লিজ, তুমি আর সান্ত্বনা দিও না। গুডনাইট।"

"সে কি, তোমার ডিউটি? এখনও তো মাস শেষ হয়নি।"

"এখন থেকে আমার অন্য ডিউটি মুখার্জি।"

গোপাল ঝড়ের বেগে নামতে থাকে। রাত্রি নটা বাজে। এখন কি নয়নকে পাওয়া যাবে না? এখনই যে তার নয়নকে চাই।

গোপাল দৌড়ে রাস্তায় নামলে। হাওয়ায় তার গলা ভেসে এল, "ট্যাক্সি, ট্যাক্সি!"

চৌকাঠে পা দিয়ে গোপাল চমকে যায়। নয়ন তার তোরঙ্গ জিনিষ-পত্তর নামিয়ে গোছাচ্ছে, পাশে এক পুঁটলি বাঁধা রয়েছে।

গোপাল চেঁচিয়ে উঠল, "তুমি যাচ্ছ কোথায়?"

নয়ন শান্ত গলায় বললে, "বাঃ তোমায় বলিনি, নিখিল যে আমার থাকার ব্যবস্থা করেছে।"

গোপাল চোখে অন্ধকার দেখে। নয়ন নেই, তার জীবন থেকে নয়ন সরে গিয়েছে। সকাল আসছে সন্ধে আসছে কাজ আর কথা নিয়ে,—যে কাজের কোন মানে নেই, যে কথা তার কাছে অর্থ হারিয়ে ফেলেছে। প্রত্যেক মুহূর্তকে গত এই প্রকাণ্ড কয়েকটা মাসের মত থরে থরে সাজানো, আবার নতুন করে চেনা এই পুরনো পৃথিবীকে, আবার নতুন করে বোঝা নিজেকে—নিজের অনুরাগ বিরাগের গতিপথ খুঁজে পাওয়ার এই আশ্চর্য অন্তহীন চেষ্টা—এ সমস্তর সমাপ্তি ঘটবে। গোপালের মাথা ঘুরে যায়। তার সমস্ত বিচার বিবেচনা লোপ পায়। নয়নের হাত ধরে বলে, "তোমায় আমি কোথাও যেতে দেব না মন, তুমি আমার কাছে থাকবে।"

গোপালের মুখের দিকে চেয়ে নয়ন বুঝতে পারে তার মনের আলোড়ন। হাত ছাড়িয়ে নেয় না, হাসে না, আবার ভেঙেও পড়ে না। শান্ত গলায় বলে, "তা হয়না, আমার চেয়ে তুমি নিজেই জানো, তা হয়না।"

গোপাল অবুঝের মত মাথা নাড়িয়ে বললে, "না, আমি জানি না, ওটা তোমার কথা।"

নয়ন খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর বলে, "চল, বাইরে যাই। আজ আর ঘরে ঝগড়া করতে ভাল লাগছে না।"

যে শিরীষ গাছের নীচে তারা রাত সাড়ে নটায় এসে বসে সেটা রোজকার মতই হাওয়ায় দুলছিল। শনিবারে লোকজন লেকের এ পেছনদিকটায় আছড়ে পড়েছিল, এখন অনেকটা ফাঁকা হয়ে গেছে। ঘাসের এদিকে ওদিকে চীনে বাদামের খোসা ছড়ানো।

নয়ন গোপালের পাশে বসে কাত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে বলে, "না, অতুল সেনের গান আমি পার হয়ে এসেছি। নাই বা তুমি এলে আমার 'প্রভাত বেলায়' তাতে কী? তুমি এসেছ, এতদিন পর। আমার এত খিটিমিটি এত অশান্তি সব পেরিয়ে তুমি এসেছ।"

গোপাল উৎসাহিত হয়ে বললে, "তাহলে? তাহলে আবার তুমি কেন চলে যাবে?

"চলে যাব, কে বলেছে? সে তো আমার সর্বনাশ। সেওতো আর এক পণ্ডিচেরী যাওয়া। তুমি কাছে না থাকলেও তোমায় ছেড়ে আমি থাকব না।"

গোপাল অসহিষ্ণু হয়ে বললে, "দেখ, তোমার ঐ ছোটমামার কাছে শেখা আধ্যাত্মিকতা আমার কাছে বলতে এসো না। আমার কাছে থাকবে না, আবার আমার কাছে থাকবে, এসব যা তা কথার কোন মানে হয়?"

নয়ন এবার হাসে। সে হাসিতে বিদ্রূপ নেই, আত্মস্থ, স্বপ্রতিষ্ঠিত হাসি। নয়ন যখন কোন ব্যাপার তলিয়ে ভেবে বলে তখন এ হাসির আভা তার মুখে ছড়ায়। নয়ন বলে, "দেখ, যখন আমরা রোজ বেড়িয়ে ফিরতাম তখন আমার কি সাংঘাতিক মন কেমন করত। রাত্রে ঘুমোতে পারতাম না। আর তোমায় খালি বলতাম একটা যদি ছাদ থাকতো আমাদের……।"

গোপাল চুপ করে থাকে। নয়নের বলার কী লক্ষ্য সে টের পায়

না। নয়ন বলে, "ছাদ না হয় একটা জোগাড় করা গেল। আমি তাতে খুশী থাকতে পারি। কিন্তু তুমি পারবে না। আমি জানি গোপাল, তোমার শুধু 'একটুকু বাসা'য় চলবে না। তোমার যে আরো বড় জগত, তুমি হাজার বিরক্ত হও, হাজার ক্লান্ত হও তুমি পারবে না শুধু একটুখানি নীড় বেঁধে থাকতে। তোমার দম বন্ধ হয়ে যাবে মণি।"

গোপাল ভাবে তার অন্তরের যা সব চেয়ে নিভৃত নয়ন সেখানেও হাত রেখেছে। নয়ন তার মনের কথা পড়েছে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে। একবার তার মনে হয়েছিল প্রতিবাদ করে, কিন্তু প্রতিবাদ করার কথা তো এ নয়। তবু এই কঠিন সত্যের সাধনা তার জীবনের প্রধান আকর্ষণ হলেও এ সত্যের সামনে দাঁড়াতে ভয় হয়। সে নয়নের হাত ধরে বলে ওঠে, "একি কথা বলছো মন? তোমার ভালবাসায় আমার দম বন্ধ হয়ে যাবে?"

"না তা নয়, ওভাবে কথা ধরে জবাব দিও না। তাহলে নিজেকে চিনতে পারবেনা।" এমন স্পষ্ট দৃঢ় অথচ এমন তন্ময়ভাবে নয়ন কথাগুলো বলে যে তার কথার ওপর যেন আর কোন ওজর উঠতে পারে না। যেন সে মানুষের মনের ভেতর ডুব দিয়ে দেখেছে। আর এই জ্ঞান তাকে বিঁধলেও সে ভেঙ্গে পড়বে না।

নয়ন ধীরে ধীরে ধীরে বলে, "আগে হলে হয়তো আর বাঁচতে ইচ্ছে করত না। কিন্তু তুমি ওসবের চেয়েও বড় আমার কাছে। আমার সমস্ত মন কেমন করা ছাপিয়ে তুমি আছো। এতগুলো বছরের পর তুমি এসেছো—এখন আমার কাছে সব নতুন ঠেকছে, আবার নতুন করে চিনছি নিজেকে, কেন মরতে যাব?"

গোপাল চুপ করে থাকে। নয়নের কথাগুলো সে নিজেও ভেবেছে। যে তীব্র অনুরাগের রাগিণীতে এ কয়েকটা মাস কেটেছে তাকে কী করে বয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তা ভেবে অস্থির হয়ে পড়েছে,

ছেলেমানুষী করেছে। কিন্তু নয়নের মত এত স্পষ্টভাবে কথাগুলো সে নিজের সামনে তুলে ধরতে পারে নি।

বসন্তের হাওয়া দেয়। সেই হাওয়ায় গত কয়েকটা মাসের স্মৃতি চমকে ওঠে গোপালের মনে।

নয়ন ধীরে ধীরে বললে, "কতকগুলো কেন আছে যার কোন উত্তর নেই। জোর করে একটা উত্তর খাড়া করে দেওয়া যায়। আর অনেকে তাই দেয়ও। কিন্তু সেরকম উত্তরে আমার কাজ নেই।"

গোপালের মনে পড়ে যায় সে কয়েকবার প্রস্তাব করেছে নয়নের কাছে বাইরে বেড়িয়ে আসার জন্যে। পুরী, ওয়ালটেয়ার কিংবা শিলংএ। নয়ন প্রথমটা খুব উৎসাহিত হয়ে পড়েছে তারপর জিজ্ঞেস করেছে, "কেন গোপাল, বাইরে কেন, এই কলকাতায়, এই কালীঘাটে বালিগঞ্জে, ভবানীপুরে আমরা থাকতে পারি না?" আলগোছে কথাটাকে ছুঁড়ে যেন সে গোপালকে পরীক্ষা করেছে। একমাসের ছুটিতে নয়, আজীবন সঙ্গ পাবার জন্যে সে কি রাজী আছে এই ধুলো কাদা মাখা শহরে? গোপাল যখন উৎসাহে উত্তেজনায় মাথা দুলিয়েছে তখন নয়ন হঠাৎ অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে পড়েছে। শান্ত দৃঢ় গলায় বলেছে, "তোমার মিথ্যে কথা বলা আসে না গোপাল।"

আর তাছাড়া নয়নের তো আর একটা অস্তিত্বও আছে। সে আর্থিক স্বাবলম্বিতা অর্জন করলেও, তার ছেলেরা তাকে না চাইলেও সে যে চাইবে তাদের নিয়ে থাকতে। কাউকে ছেঁটে ফেলে সে তো থাকতে পারে না। বিশেষ করে অস্তু ও মাস্তার পতন যে নয়নের জীবনের আর এক পরীক্ষা। নয়নের আনন্দ খণ্ডিত হতে বাধ্য। তার ছেলেরা যতক্ষণ তাদের হোঁচট-খাওয়া অস্তিত্ব ছেড়ে মাথা তুলে

না দাঁড়াচ্ছে ততদিন গোপালের সঙ্গই খাল তাকে ভরিয়ে রাখবে কী করে?

তারা দুজনে আবার হাঁটতে সুরু করে। হাওয়া পড়ে এসেছিল। তারিণী বাবুর বাসার কাছে আসতেই আবার হাওয়া ওঠে। গোপাল নয়নের কথাটা নিয়ে মনের মধ্যে ওলোটপালোট করে—কতকগুলো কেন আছে তার উত্তর নেই।

নয়নের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত সে ঘুরে ঘুরে দেখে। নয়ন বদলাচ্ছে, কী আশ্চর্য্যভাবে বদলাচ্ছে সে আঁচ করতে পারে। অবশ্য তার স্বকীয়তা, তার বৈশিষ্ট্য সবই আগে ছিল। রাস্তায় বসেও রাস্তা আলো করে থাকার মত তার মেজাজ। কিন্তু সে মেজাজে এতখানি আত্মপ্রতিষ্ঠিত গরিমা ছিল না। একে 'আশ্চর্য' 'অদ্ভূত' ইত্যাদি কোন বিশেষণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। তার কথার ভঙ্গীতে সমস্ত আচরণে যে গৌরব তা গোপালের জানা সব বিশেষণকে পরাজিত করে।

গোপাল শান্তভাবে বলে, "না তোমার কাছে মিথ্যে বলতে পারব না। সত্যি একটুকু বাসার জন্যে আমার মন কাঁদেনা, কী করব? আমি চাই আরো বড় জগত। নইলে বাঁচতে পারিনে, দম বন্ধ হয়ে যায়। আর সেটাই যে আমি। তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারিনে। কিন্তু তার মানে তো নিজেকে বাইরের জগতে ছুঁড়ে দেওয়া নয়। সবাইকে নিয়ে আমার সংসার। কিন্তু সে সংসারে তুমি নেই এ কথা—"

নয়ন তার কথায় বাধা দিয়ে বললে, "কে বললে আমি নেই। আমি আছি। আমার লজ্জা নেই, মান নেই তুমি ডাকলেই আমি যাব। তুমি আরো ছড়াও নিজেকে। কিন্তু আমি ছুটে যাব। যেখানেই থাক আমি যাব।"

তারিণী বাবুর বাসার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে নয়ন যখন তাকে বিদায় দেয় তখন সেদিকে তাকিয়ে আশ্চর্য লাগে গোপালের। নয়ন মাথার কাপড় খুলে চুল এলো করে দাঁড়িয়ে। রাস্তার আলো তার মুখে এসে পড়েছে। আর তার ভঙ্গীতে গোপালের মনে হোল সে এক পৌরাণিক নায়িকার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে, যার বয়স নেই, সীমা নেই, যে তার জন্যে দাঁড়িয়েছিল, দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে থাকবে। গোপাল ফিরে ফিরে তাকায়। আর তার মনে হয় নয়ন যেন এই বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের গ্লানি, অবসাদ আর বিরক্তি ছাপিয়ে সমস্ত কালের সমস্ত যুগের মানুষের যে জীবন তাকে বইয়ে দেবার জন্যে তাকে ডাকছে—কোন তত্ত্ব কথা বলে নয়, কোন সুদূর ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনা দেখিয়ে নয়, অতি সামান্য আচরণে, ব্যবহারে, দৈনন্দিন বাঁচার আকাঙ্ক্ষায়।

খই ছড়াতে ছড়াতে হরিসঙ্কীর্তন করে একদল লোক চলে যায়। রাস্তার মোড়ের গাছ থেকে নতুন গরমে ফোটা হলুদ ফুলের মৃদু গন্ধ আসে। বসন্তের হাওয়া দেয়।

গোপাল প্রায় রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তারিণীবাবুর চৌকাঠের দিকে। মোটরের হর্ন শুনে তার চমক ভাঙ্গল।

সাতাশ

সময়কে কেন শত্রু ভাবা হয় মানুষের? কেন ভাবা হয় সময়ের চাপে পড়ে যা কিছু উজ্জ্বল, তীব্র তা লেপে মুছে একাকার হয়ে যাবে? কেন ফুলের সঙ্গে মানুষের অনিত্যতার উপমা এত তাড়াতাড়ি টানা হয়?

গোপাল লক্ষ্য করে বছর যত ঘোরে নয়নের চুলে আরো পাক

ধরে। একবার সে নিজেকে জিজ্ঞেস করে, তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল শেষ পর্যন্ত ? তারপর তার মুহূর্তের অসহিষ্ণুতায় তার নিজেরই হাসি পায়। সে যেন খবরের কাগজের চাকরীতে বেরিয়ে কাউকে বলছে, তাহলে সোজা কথাটা কী দাঁড়াল ? কথা ওরকম পাইকেরী ভাবে কিছুই দাঁড়ায়নি, অথচ নয়নের সঙ্গে প্রত্যেক কথাই তার জীবনে দাগ রেখে গিয়েছে।

নিত্যগোপাল এখন এক ইস্কুলের মাষ্টার। তার দশহাজারী জগত ভেঙ্গে গেছে। তাতে তার ক্ষোভ নেই। ক্ষোভ কিংবা আফ্‌শোষ তার আচরণে, কথায় একেবারেই অনুপস্থিত। বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের যে ছবি তাকে অহরহ পীড়া দিত সে ছবি তাব মন থেকে মুছে যায় নি। কিন্তু নয়নের সাহচযে এসে সে এ সমাজেই নিঃশ্বাস নিতে শিখেছে। আরও একটা কথা শিখেছে সে। যে মানুষ নিজে পায় নি সে অন্যকেও দিতে পারে না। নিত্যগোপাল আজ মরিয়া না হয়ে তার সমস্ত অস্তিত্ব নিয়েই যেতে পারে অন্যের কাছে।

নয়ন তাকে ঠিকই চিনেছিল। আর এই চেনাব যন্ত্রণায় নয়ন প্রথমে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। প্রথমে বুঝতে পারে নি যাকে একদিন না দেখলে মন কাঁদে তাকে কাছে না পেলেও পৃথিবীর এই অন্তহীন ঘটনাপ্রবাহে আনন্দ পাওয়া যাবে কী করে ? তারপর সময়ের ব্যবধান আছে। কেন সমস্ত জগত ধূসর বিবর্ণ হয়ে যাবে না ? কিন্তু সে বুঝতে ভুল করে নি। যদি অনেকগুলো 'যদি' একসঙ্গে গাঁথাও যেত, তাহলেও সেই মুক্ত পরিবেশে গোপাল গোপালই থাকবে। তার জগতে একান্তভাবে কাউকে সম্রাজ্ঞী করতে সে নারাজ। তার প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাস ও আনন্দ রক্তে রক্তে, সমস্ত সত্তায়।

কিন্তু গোপাল যে ভাবেই তাকে নিক নয়ন তার জন্যে আসন পেতে রাখবেই। নয়ন থাকতে পারে নি বিরাজমোহিনীর আশ্রমে।

বছর না ঘুরতেই সেখান থেকে সে চলে এসেছে—ছেলেদের আশ্রয়ে নয়, তারিণীদার বাড়িতে নয়, টালিগঞ্জের এক রেফিউজি ইস্কুলে। সেখানে সে গান শেখায় আর মাঝে মাঝে গানের টিউশনি করে। বাঁশের বেড়া দেওয়া কলোনীর নতুন চালাঘরখানায় ঢুকে যখন তার প্রথম মনে হয়েছিল এবাব থেকে স্বামী, ছেলে কিংবা ভগবান বাদ দিয়েই জীবন স্থরু করতে হবে তখন তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছিল। অন্যের থালা না বেড়ে যে লোকটা মুখে কিছু দিতে পারে না সেই লোকই আবার অকম্পিত হাতে উন্থন ধরাল। টিনের তোরঙ্গ থেকে তার দুটো শাড়ী ঝুলিয়ে রাখল ঘবেব কোণে দড়িতে। সে খুব ভাব জমিয়েছে কলোনীব ছোট ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে। তারাই মশগুল করে রাখে তার বিশ্রামেব সময়।

আর গোপালের কাছে নয়ন কোন অবিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, তারই নিরবিচ্ছিন্ন জীবন। গোপাল নিজেকে তলিয়ে দেখেছে। তার সবচেয়ে প্রিয় কথা, একান্ত কথা, যে কথা ধীবে ধীরে বলতে হয়, সমস্ত কালের দিকে তাকিয়ে বলতে হয়, তাব সেই কথার সঙ্গেও এই চারপাশের মানুষের ওঠা-বসা-চলার এক নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে। মাঝে মাঝে তার মনে হয়েছে, এটা কি তার হিসেব, কিংবা বই-এ পড়া কথা? কিন্তু সেরকম তো কিছু পায় নি তার আচরণে। নয়নের সঙ্গে সাহচর্যের তীব্র মুহূর্তে একান্তভাবে নিজস্ব জগতের কথা যে মনে হয় নি তা নয়। কিন্তু সে মুহূর্ত কেটে গিয়েছে কোন আফশোষ না রেখেই। সময়ের সাহচর্য পেয়েছে নিত্যগোপাল। যে আগুন তার বুকে জ্বলে তাকে ছড়িয়ে দিতে না পারা পর্যন্ত মনে হয়েছে তার শান্তি নেই, শুধু ধোঁয়ায়, পোড়ায় তার দেহমন। তা সে ছড়াবার চেষ্টা করেছে প্রাণপণে। নয়ন যেন তাকে বুকে টেনে নিয়ে তার আপাদ-মস্তক উষ্ণতায় ভরিয়ে আবার তাকে তুলে দিয়েছে আরও এক

উষ্ণতায়, আনন্দে, বিরক্তিতে ও যন্ত্রণায়। গোপাল নয়নের বয়স গোনে না। এক একদিন সে যখন সন্ধের পর আসে তখন নয়নকে তার চুল এলো করে দিতে বলে। আর নয়ন যেন তা জেনেই তার প্রশান্তি নিয়ে গোপালের পাশে এসে দাঁড়ায়।